সূচীপত্র

ভূমিকা

১

কমলাকান্তের সূচনা—

১২৮০ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাস 'বঙ্গদর্শনে' কমলাকান্তের প্রথম আবির্ভাব ঘটে। ভীষ্মদেব খোশনবীশ ভূমিকায় লিখেছেন যে, কমলাকান্ত লেখাপড়া জানতেন না, এমন নহে।

কমলাকান্ত কিছু ইংরাজী, কিছু সংস্কৃত জানিত। কিন্তু যে বিদ্যায় অর্থোপার্জন হইল না, সে বিদ্যা কি বিদ্যা? কমলাকান্তের মত বিদ্বান্; যাহারা কেবল কতকগুলা বহি পড়িয়াছে, তাহারা আমার মতে গণ্ডমূর্খ।

এই 'গণ্ডমূর্খ' কমলাকান্তের দপ্তর থেকে যা প্রকাশিত হয়েছিল খোশনবীশ মহাশয় তা লোকহিতার্থে "অত্যুৎকৃষ্ট অনিদ্রার ঔষধ" রূপে প্রচার করেন। বঙ্গদর্শনে দপ্তরের যে রচনাগুলি প্রকাশিত হয় তাদের সংখ্যা হলো ১৪টি। এদের মধ্যে আছে (১) একা—"কে গায় ঐ?" (ভাদ্র, ১২৮০,) (২) মনুষ্য ফল (আশ্বিন, ১২৮০), (৩) ইউটিলিটি বা দর্শনত্বয় (উদর দর্শন) (কার্তিক, ১২৮০), (৪) পতঙ্গ (অগ্রহায়ণ, ১২৮০), (৫) আমার মন (মাঘ, ১২৮০), (৬) চন্দ্রালোকে (ফাল্গুন, ১২৮০), (৭) বসন্তের কোকিল (চৈত্র, ১২৮০), (৮) স্ত্রীলোকের রূপ (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮১), (৯) ফুলের বিবাহ (আষাঢ়, ১২৮১), (১০) বড়বাজার (আশ্বিন, ১২৮১), (১১) আমার দুর্গোৎসব (কার্তিক, ১২৮১), (১২) একটি গীত (ফাল্গুন, ১২৮১), (১৩) বিড়াল (চৈত্র, ১২৮১) ও (১৪) মশক (বৈশাখ, ১২৮২)।

এই রচনাসমূহের মধ্যে 'চন্দ্রালোকে' ও 'মশক' অক্ষয়চন্দ্র সরকারের এবং 'স্ত্রীলোকের রূপ' রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচনা। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে কাঁঠালপাড়া থেকে বঙ্কিমচন্দ্র ১১টি নিবন্ধ নিয়ে কমলাকান্তের দপ্তর প্রকাশ করেন। সুতরাং অক্ষয়কুমার ও রাজকৃষ্ণের রচনা বর্জিত হয়। দপ্তরের আখ্যা—পত্রে 'প্রথম খণ্ড' কথা দুটি ছিল। এতে বোঝা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তকে নিয়ে আরও কিছু রচনার অভিলাষী ছিলেন। কিন্তু ১২৮২ বঙ্গাব্দের চৈত্র পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয় এবং কমলাকান্তকেও বিদায় নিতে হয়।

১২৮৪ সালের বৈশাখ থেকে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন পুনঃপ্রকাশিত হতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "প্রয়োজন আছে বলিয়া, ইহা পুনর্জ্জীবিত হইল।" কিন্তু কমলাকান্তকে পুনর্জ্জীবনদানের কথা তাঁর মনে হয়নি। ১২৮৪ সালের বৈশাখ সংখ্যায় "বুড়া বয়সের কথা" প্রকাশিত হয়। কিন্তু তার সংগে কমলাকান্তের কোনও সংযোগ ছিল না। পৌষ মাসে সম্ভবত, সঞ্জীবচন্দ্রের তাগিদে "কমলাকান্তের পত্র" প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের জবানীতে লিখেছেন ;—

'একবার বাজ দেখি, হৃদয় ! এই জগৎ সংসারে—বধির, অর্থচিন্তায় বিব্রত, মূঢ় জগৎ সংসারে, সেইরূপ আবার মনের লুকান কথাগুলি তেমনি করিয়া বল দেখি ? বলিলে কেহ শুনিবে কি ? তখন বয়স ছিল—কতকাল হইল সে দপ্তর লিখিয়াছিলাম—এখন সে বয়স, সে রস নাই—এখন সে রস ছাড়া কথা কেহ শুনিবে কি ? আর সে বসন্ত নাই—এখন গলা-ভাঙ্গা কোকিলের কুহুরব কেহ শুনিবে কি ?'[১]

ফাল্গুনে (১২৮৪) 'পলিটিক্‌স্‌' এবং শ্রাবণ মাসে (১২৮৫) 'বাঙালির মনুষ্যত্ব' এই দুটি পত্র প্রকাশিত হবার পরে কমলাকান্তের জীবনে যবনিকা নেমে আসে। এই পত্রের শেষে লেখা ছিল "অতএব আপাততঃ ঘ্যান্‌ঘ্যানানি বন্ধ করিলাম—কিন্তু মধু সংগ্রহের আশাটা রহিল।"

কমলাকান্তের পত্র নিম্নলিখিতভাবে সাজান হয়েছে। (ক) কি লিখিব, (খ) পলিটিক্‌স্‌, (গ) বাঙালির মনুষ্যত্ব, (ঘ) বুড়া বয়সের কথা, (ঙ) কমলাকান্তের বিদায়। এর পরে ১২৮৮ সালের মাঘ পর্যন্ত কমলাকান্তের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শনের তখন দুরবস্থা। ঐ সালের ফাল্গুন মাসে (১৮৮২ খ্রীস্টাব্দ, ১৬ই ফেব্রুয়ারী) বঙ্কিমচন্দ্রের কলিকাতার বাসায় কাঁঠালপাড়ার পণ্ডিত রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও দিগম্বর বিশ্বাসের পুত্র তারকনাথ বিশ্বাস ওঁর সংগে দেখা করতে আসেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রশ্ন করেন 'বঙ্গদর্শন কেমন চলছে'। তাঁরা কমলাকান্তের অভাবের কথা উল্লেখ করে বঙ্গদর্শনের দুরবস্থার কথা বলেন।

তিনি 'বটে' বলিয়া একমনে তামাকু খাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার চিত্ত অবিচলিত, স্থির, গম্ভীর। তাহারই কিছুক্ষণ পরে তিনি পার্শ্বস্থ কক্ষে ঢুকিয়া কি একটা বস্ত্র পান করিয়া আসিলেন। আমাদিগকে বিদায় দিয়া লিখিতে বসিলেন—তারকনাথ বিশ্বাস : 'বঙ্কিমবাবুর জীবনকথা।'...

সেদিন সন্ধ্যা থেকে কলিকাতায় ভীষণ ঝড় বৃষ্টি ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে কমলাকান্তের জোবানবন্দী রচিত হয়। ১২৮৮ সালের ভাদ্র সংখ্যা বঙ্গদর্শনের (ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত) এটি বের হয়। আদালতে কমলাকান্তের সাক্ষ্যদানের অপূর্ব কাহিনী নিয়ে এটি শেষ হয়। খোশনবীশ জুনিয়রের অভিমত হল যে, কমলাকান্ত তখন "নিতান্ত ক্ষেপিয়া গিয়াছে"। কিন্তু 'শেষ হইয়াও না হইল শেষ'। দপ্তরের বাড়তি-পড়তি দুটি লেখা, কমলাকান্তের কোনও ভক্ত নাকি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকের নিকটে প্রেরণ করেন। ঢেঁকি (বৈশাখ, ১২৮৯) এবং কাকাতুয়া (কার্তিক, ১২৮৯) প্রকাশিত হয়। কমলাকান্তের ভূমিকাও শেষ হল।

'কমলাকান্তের দপ্তর' পরিবর্ধিত আকারে কমলাকান্ত নামে ১২৯২ সালে (সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫) প্রকাশিত হয়। এর তিনটি অংশ যথাক্রমে হল কমলাকান্তের দপ্তর, কমলাকান্তের পত্র এবং কমলাকান্তের জোবানবন্দী। দপ্তরে প্রথম

১। এই অংশটি 'কমলাকান্তের বিদায়' নামক পত্রে স্থান পেয়েছে।

সংস্করণে পরিত্যক্ত, অক্ষয়কুমারের 'চন্দ্রালোকে' এবং রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'স্ত্রী-লোকের রূপ' পুনঃসন্নিবিষ্ট হয়। অক্ষয়চন্দ্রের মশক বর্জিত হয় এবং এটি তাঁর 'মোতিকুমারী'তে প্রকাশিত হয়।

কমলাকান্তের দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয় ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে। এ দপ্তরের চতুর্দশ সংখ্যারূপে 'ঢেঁকি' নিবন্ধটি স্থান পায়। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিত কালে কমলাকান্তের আর সংস্করণ হয়নি। 'কাকাতুয়া' নিবন্ধটি কমলাকান্তে স্থান পায়নি। বঙ্গদর্শন থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময়ে সামান্য বর্জন ও সংশোধন ঘটেছিল। এদের মধ্যে প্রধান দুটি পরিবর্তন ও বৃহৎ পরিবর্জনের কথা বলা সঙ্গত। 'কি লিখিব ?' অংশে ছিল—

তবে আর একবার লেখ দেখি লেখান। চল দেখি, পাখীর পাখা।

এই অংশ—পরিবর্তিত হয়েছে। কমলাকান্ত বলেছেন—

সম্পাদক মহাশয়!
বিদায় হইলাম, আর লিখিব না। বনিল না। আপনার সঙ্গে বনিল না, পাঠকের সঙ্গে বনিল না, এ সংসারের সঙ্গে আমার বনিল না। আমার আপনার সঙ্গে আর বনিল না। আর কি লেখা হয়। বেসুরে কি এ বাঁশী বাজে। বাঁশী বাজি বাজি করে, তবু বাজে না। বাঁশী ফাটিয়াছে।

বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের বিদায়-পত্রের শেষে ছিল—

কি লিখিব, সম্পাদক মহাশয় আজ্ঞা করিবেন। সে রস আর নাই—কিন্তু আজিও আছি। নিতান্ত আজ্ঞানুবর্তী।

কিন্তু গ্রন্থে লিখিত হয়েছে—

তবু কাঁদি। জন্মিবামাত্র কাঁদিয়াছিলাম, কাঁদিয়া মরিব। এখন কাঁদিব, লিখিব না। অনুগত স্বগত এবং বিগত।

বঙ্গদর্শনে 'বুড়া বয়সের কথায়' গোড়ায় ছিল—"আমি বুড়া বয়সের কথা লিখি লিখি মনে করিতেছি।' কিন্তু পুস্তকে আছে.

সম্পাদক মহাশয়। আফিঙ্গ পৌছে নাই, বড় কষ্ট গিয়াছে, আজ যাহা লিখিলাম, তাহা বিস্তারিত লোচনে লেখা, নিজ বুদ্ধিতে অহিফেন প্রসাদাৎ নহে। একটা মনের দুঃখের কথা লিখিব। লিখি লিখি মনে করিতেছি, কিন্তু লিখিতে পারিতেছি না।

'কাকাতুয়া' রচনাটি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা বলে মনে হয়। রচনার বিন্যাস ও ভঙ্গী সেই সাক্ষ্য দেয়।

কমলাকান্তের জন্মকাহিনী :

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কমলাকান্ত সংস্করণে সুযোগ্য সম্পাদকদ্বয়, কমলাকান্তের সৃষ্টিকাহিনী মনোজ্ঞ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তাঁরা লিখেছেন—

তাঁহার স্বভাবতঃ রহস্যপ্রিয় মন প্রথমটা "লোক রহস্যে"র সহজ পথে একটা মুক্তির উপায় আবিষ্কার করিয়া কতবা সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু মাসের পর মাস নিছক রহস্য সৃষ্টি করিয়া তৃপ্ত থাকিবার মত পল্লবগ্রাহী মন বঙ্কিমচন্দ্রের

ছিল না। প্রবহমান সংসার-স্রোতের উপরিভাগে আপাতমনোহর তরঙ্গভঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে তীক্ষ্ণধী বঙ্কিমচন্দ্র কখনও কখনও গভীর রহস্য-গহনে তলাইয়া যাইতেন, এবং মরণশীল মানবের—এবং বিশেষ করিয়া যে সকল হতভাগ্য জীব তাঁহার আশেপাশে চিন্তাহীন নিঃশঙ্কতায় ভাসমান, তাহাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা আপন অন্তরে অনুভব করিয়া হাল্কা হাসির বুদ্‌বুদ্‌ বিলাসে তাঁহার মন সায় দিত না। অর্ধোন্মাদ নেশাখোর কমলাকান্তের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া তখন তাঁহার উপায় ছিল না। সোজাসুজি সজ্ঞানে যে সকল কথা বলিতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করিতেন কমলাকান্তের মুখ দিয়া সেই সকল কথা তিনি অসঙ্কোচে বলিতে পারিতেন; এবং এই রহস্যময় পাগলকে কেন্দ্র করিয়া মাসের পর মাস পাঠক ভুলাইতে, তাঁহাকে বেগ পাইতে হইত না। একাধারে ব্যঙ্গের শর্করামণ্ডিত কাব্য, পলিটিক্‌স্‌, সমাজ-বিজ্ঞান এবং দর্শন পরিবেশনের উপায় সৃষ্টি করিয়া সম্পাদক এবং প্রচারক বঙ্কিমচন্দ্র নিজের কাজ অনেকটা সহজ করিয়া লইলেন। ইহাই কমলাকান্ত-জন্মের ইতিহাস। কমলাকান্তের দর্শনকে অর্থসংগতি দেওয়ার জন্য ও বুদ্ধিগ্রাহ্য সমর্থনের জন্য নসীরামবাবু ও প্রসন্ন গোয়ালিনী এবং পৃথিবীতে প্রচারের জন্য ভীষ্মদেব খোশনবীশকেও সৃষ্টি করিতে হইল।

কমলাকান্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র :

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র বহু বিচিত্র নরনারীর চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তিনি যেন চরিত্রের চিত্রশালা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। কিন্তু কমলাকান্ত তাঁর অনন্যসাধারণ সৃষ্টি। বোধ করি বাংলা সাহিত্যে এই চরিত্র অদ্বিতীয়। শেক্সপীয়র সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি তিনটি অমর চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। যথাক্রমে তাঁরা হলেন হ্যামলেট, ক্লিওপেট্রা এবং ফলস্টাফ। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কেও বলা যায় যে, তাঁরও বিশিষ্ট চরিত্র সৃষ্টি হল রানা রাজসিংহ, শান্তি এবং অমরনাথ। কিন্তু কমলাকান্ত একক ও অভিনব। কমলাকান্তের তেমনি অভিনব রোহিণী। সংগে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ওত-প্রোতভাবে বিজড়িত হয়ে আছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত কমলাকান্ত গ্রন্থের ভূমিকায় যুগ্ম-সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস লিখেছেন, "ইতিপূর্বে ইউরোপে এইভাবে সৃষ্ট চরিত্রের সহিত স্রষ্টার মিলন একাধিক কবি ও ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্রে ঘটিয়াছে। কিন্তু বাংলাদেশে ও সাহিত্যে বোধ হয় আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা অভিন্ন—হৃদয়তা এই প্রথম। কল্পনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র এই নূতন পদ্ধতির আমদানি করিলেন।"

ইংরেজী সাহিত্যে শেক্সপীয়রের সঙ্গে প্রস্পেরো, ডিকেন্সের সঙ্গে পিকুইক এবং চার্লস ল্যামের সংগে ইলাইয়ার অভিন্নতা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম যে, বঙ্কিমচন্দ্র ও কমলাকান্তের মধ্যে অভিন্ন হৃদয় সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। কমলাকান্তের পূর্বে 'হুতোম' অবশ্য কালীপ্রসন্ন সিংহের অভিন্ন হৃদয়, কিন্তু "সে মাত্র বেনামীর খাতিরে, স্বতন্ত্র চরিত্র সৃষ্টি

হিসাবে নয়। উহা আলোকপ্রার্থী কালীপ্রসন্নেরই অন্ধকার দিক।" হুতোম-এর দৃষ্টি নিম্নগামী অথবা প্রত্যক্ষগোচর বাস্তবের সংগেই তার কারবার। "কমলাকান্ত আইডিয়ালিস্ট, আদর্শবাদী এবং বাস্তবের ঊর্ধ্বলোকে তাহার কল্পনা বিহার। কমলাকান্ত কবি, প্রেমিক এবং বাংলা সাহিত্যে যাহা প্রথম—স্বদেশপ্রেমিক। পাতালমুখী হুতোম আকাশমুখী কমলাকান্তের ঠিক উল্টাপিঠ।"

কৈশোরে কবি এবং যৌবনে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে (৩৪ বৎসর বয়সে) বঙ্গদর্শনের সম্পাদক হয়ে বিপন্ন হলেন। তাঁর মানদণ্ডে সফল ও জবরদস্ত লেখক বঙ্গদর্শনের সূচনার যুগে বেশী ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্ররূপ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে গ্রহরূপে যাঁরা সেই যুগে খ্যাতিলাভ করেছিলেন, যাঁদের আমরা লেখক রূপে শ্রদ্ধা জানাই, তাঁদের খ্যাতি অনেক পরিমাণে 'বঙ্গদর্শনের' ও বঙ্কিমচন্দ্রের খ্যাতির জন্য। বঙ্কিমচন্দ্রকে বাদ দিলে তাঁদের খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত নয়। স্বভাবত বঙ্কিমচন্দ্রকে বিপন্ন বোধ করতে হয়েছিল। কাব্যের জগতে ছিলেন রঙ্গলাল, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র। প্রবন্ধ লেখকরূপে ছিলেন যোগেন্দ্রচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি। তাঁদের রচনা বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় শিল্পীর হস্তস্পর্শে সাহিত্যে প্রচলিত হয়েছিল, তথাপি মাসিক পত্রিকার বিরাট উদর এত সামান্য উপদানে ভরান যায় না। তাই বঙ্কিমচন্দ্রকে পাঠকদের রুচি অনুযায়ী নানা রূপ গ্রহণ করতে হতো। কখনও সমালোচকরূপে তিনি উত্তররামচরিত বা শেক্সপীয়র ও কালিদাসের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন, 'কখনও বৈজ্ঞানিকরূপে পরমাণু ও ধূলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন, "কখনও আত্মবিস্মৃত বাঙালীকে তাহার কলঙ্ক কাহিনী শুনাইতেন। কখনও গদ্যকাব্য রচনা করিয়া পাঠকের তৃপ্তি সাধন করিতেন, আবার কখনও বা বঙ্গদেশের কৃষককে কেন্দ্র করিয়া সাম্যের নামে পলিটিক্স্ লিখিতেন।"

লোকরহস্যের ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের সহায়তায়, কাহিনীর অবতারণায় বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে সহজসাধ্য মুক্তির উপায় হয়েছিল বটে। কিন্তু নিছক রহস্য সৃষ্টি করে তৃপ্ত হবার মত মানসিকতা তাঁর ছিল না। তাঁর মন জীবনের গভীরে প্রবেশ করবার পথ অনুসন্ধান করছিল। যে চিন্তা তাঁর মনকে অধিকার করেছিল তা হল, "এই জীবন কি? লইয়া কি করিব?" এই প্রশ্ন তাঁহার মনকে উদ্বেল করে তুলেছিল। যে কথা ঔপন্যাসিকরূপে, উপন্যাসের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আলোচনার সুযোগ ছিল না, কমলাকান্তের ন্যায় সংসারবিবাগী অথচ জীবন-রসের রসিক কমলাকান্তকে দিয়ে তা অনায়াসে করা গেল। ভারত ও বাংলার ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে সত্যের সম্মুখীন হলেন, তা তাঁর নামে প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। সাম্য প্রবন্ধেও যে সমাজসমস্যা নিয়ে তিনি খোলাখুলি আলোচনা করেছেন, তা সরকারী চাকুরীজীবীর পক্ষে অসম্ভব ছিল। স্বভাবতঃ কমলাকান্তের ছদ্মবেশ তাঁর পক্ষে অপরিহার্য ছিল। এই

চরিত্রের আশ্রয়ে তিনি সকল বিষয়ে তাঁর মত ও মন্তব্য অকুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ করেছেন। অথচ কমলাকান্তের বক্তব্য পাঠ করলে বঙ্কিমচন্দ্রের উপস্থিতি বিস্মৃত হওয়া যায় না। তখন একথা মনে হয় যে, কমলাকান্তকে সম্মুখে রেখে বঙ্কিমচন্দ্র কখনও জীবন-সত্যের গভীরে প্রবেশ করতে চেয়েছেন, কখনও সরস ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সহায়তায় সংসাররূপ বড়বাজার বা বিড়ালের জবানীতে সমাজবিন্যাসকে আক্রমণ করেছেন, আবার কখনও ইতিহাস অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে দেশের পরাধীনতার জন্যে অশ্রুবর্ষণ করেছেন। গভীর দুঃখে লিখেছেন, "যাহা চাই তাহা মিলাইল কই? মনুষ্যত্ব মিলিল কই? একজাতীয়ত্ব মিলিল কই? ঐক্য কই! বিদ্যা কই? গঙ্গার অতল জলে যে দেশলক্ষ্মী নিমজ্জিতা হইয়াছেন তাঁকে উদ্ধার করবার জন্যে তিনি দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন।

কমলাকান্তের সৃষ্টি সাহিত্যের প্রয়োজনে তাই অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল এবং এই চরিত্রের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র সকল কথা, বিশেষতঃ তাঁর জীবনদর্শন অকুণ্ঠিত চিত্তে বলবার সুযোগলাভ করেছিলেন, এই হেতু কমলাকান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের সংগে অভিন্ন ও তাঁর দ্বিতীয় সত্তা। এই চরিত্র সৃষ্টি করে বঙ্কিমের শিল্পীসত্তা ও ব্যক্তিসত্তা যুগপৎ পরিতৃপ্ত হয়েছিল।

এই প্রসংগে অক্ষয়চন্দ্র দত্ত গুপ্তের সুচিন্তিত অভিমত উল্লেখ করা চলে।

কমলাকান্ত একাধারে কবি, দার্শনিক, সমাজশিক্ষক, রাজনীতিজ্ঞ ও স্বদেশ-প্রেমিক; অথচ তাহাতে কবির অভিমান, দার্শনিকের আড়ম্বর, সমাজশিক্ষকের অরসজ্ঞতা, রাজনৈতিকের কল্পনাহীনতা, স্বদেশপ্রেমের গোঁড়ামি নাই। হাসির সংগে করুণের, অদ্ভুতের সংগে সত্যের, তরলতার সহিত মর্মদাহিনী জ্বালার, নেশার সংগে তত্ত্ববোধের, ভাবুকতার সহিত বস্তুতন্ত্রতার, শ্লেষের সহিত উদারতার এমন মনোমোহন সমন্বয় কে কবে দেখিয়াছে?

অবনীন্দ্রনাথ কমলাকান্ত সম্বন্ধে বলেছেন যে, সে যদি একটি মানুষ মাত্র হতো তবে এতকাল ধরে বেঁচে থাকতেই পারতো না। কিন্তু সে নাকি একটা ধূমকেতুর মত, তাই থেকে থেকে আসে এবং চলে যায় পৃথিবীর গায়ে আলোর ঝাঁটা বুলিয়ে দিয়ে। ('ভারতী'—ফাল্গুন, ১৩৩০)

বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তকে তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে মনে করতেন। 'শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ' শিরোনামায় শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বঙ্কিম-জীবনীতে লিখেছেন যে, সানকি-ভাঙার বাটীতে তাঁর ভগিনীপতি স্বর্গীয় কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় (সাবজজ) বঙ্কিম-চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কোন্‌টি। তিনি বললেন, "তুমি বল দেখি?" কৃষ্ণধনবাবু হেসে উত্তর দিলেন যে, তিনি মুখে কিছু বলবেন না, তবে লিখে রাখছেন। তিনি দেখতে চান তাঁর সংগে বঙ্কিমচন্দ্রের মতের মিল হয় কি না। বঙ্কিমচন্দ্র হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন 'কমলাকান্তের দপ্তর'। কৃষ্ণধনবাবু কাগজ উল্টে দেখালেন; তাতে লেখা আছে "কমলাকান্তের দপ্তর"।

কমলাকান্তের দপ্তরে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংগে কোথাও কোথাও সাদৃশ্য দেখা গেলেও একথা বলা যাবে না যে, এটি অনুকরণজাত ; এবং এর মধ্যে মৌলিকতা নেই। অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত লিখেছেন, "কৈশোরে কমলাকান্ত প্রথম পাঠ করিবার পর যখন বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়াছিলাম তখন ইংরাজী সাহিত্যের জ্ঞানাভিমানী এক ব্যক্তি বড় গম্ভীরভাবে বলিয়াছেন ওটা De Quincey-র Confessions of an English opium eater -এর অনুকরণ।" অক্ষয়কুমার লিখেছেন যে, উক্তিটি পণ্ডিতের যোগ্য নয়। কমলাকান্তের দুই দশটা উক্তির অনুরূপ উক্তি বিশাল ইংরাজী সাহিত্যের কোথাও নাই, এমন কথা বলিব না, কমলাকান্তের জোবানবন্দী Pickwick papers-এর Sam-এর জোবানবন্দীর আদর্শে রচিত হইয়াছে, তাহাও বিশ্বাস করি, তবু বলিব উহাতে কমলাকান্তের মৌলিকতার কোন হানি হয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজী সাহিত্য গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছিলেন। সুতরাং তাঁর রচনায় জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বিদেশী প্রভাব এসে থাকতে পারে। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, তিনি তাঁর রচনায় মৌলিকতার পরিচয় দেননি। তাঁর কমলাকান্ত লোকরহস্যের পরিণত সাহিত্যরূপ। লোকরহস্যে যে শানিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও তীক্ষ্ণ সমালোচনা আছে তা পরিশীলিত হয়ে কমলাকান্তের আস্বাদনযোগ্য রসসৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। এই গ্রন্থে একাধারে বঙ্কিমচন্দ্রের রহস্যচেতনা, জীবনদর্শন, স্বদেশপ্রীতি ও কল্পনা-বিলাসীর পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। সকলের মূলে আছে তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসা। একে কেন্দ্র করে বঙ্কিম-চন্দ্রের তথা কমলাকান্তের মানসভাবনা নানা প্রসঙ্গ অবলম্বনে চতুর্দিকে বিস্ফুরিত হয়েছে। ডিকেন্সের রচনার প্রতি বঙ্কিমের যত অনুরাগ থাক পিকুইক পেপার্স-এর সমিতির বিচিত্র কার্যকলাপের সংগে কমলাকান্তের মানস অনুসন্ধিৎসার বিষয় এক শ্রেণীর নয়, বরং মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত নাটকের বিদূষক চরিত্র থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে থাকবেন। প্রকৃত বিদূষক হলেন বিজ্ঞ বিদগ্ধ ব্রাহ্মণ ও অন্তরঙ্গ রাজবয়স্য। কিন্তু অপর দুজন বিট ও শকার হলেন ধূর্ত ব্রাহ্মণ এবং মূর্খ রাজশ্যালক। মনে হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র দেশী ও বিদেশী নানা উত্তরাধিকারের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে তাঁর সৃজনী প্রতিভার গুণে কমলাকান্তের ন্যায় এক জীবন-রসের রসিকচরিত্র সৃষ্টি করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে সমাজ-অন্তর্ভুক্ত নরনারীর জীবনযাত্রার পরিচয় দিয়েছেন, প্রয়োজনবোধে কঠিন সমালোচনাও করেছেন। কিন্তু তিনি নিজেও সেই সমাজের একজন ; স্বভাবতঃ তাঁর সমালোচনা, সর্বক্ষেত্রে যথাযথ হওয়া সম্ভব নয়। তাই তিনি কমলাকান্তের ন্যায় একজন নির্লিপ্ত কৌতুকপ্রবণ বিশ্লেষণধর্মী রসজ্ঞ ব্যক্তিকে নিরাসক্ত দ্রষ্টারূপে দাঁড় করি-ছেন। তিনি বিদগ্ধ সমালোচকের ভূমিকা পালন করেছেন।

এছাড়া নসীরামবাবু, প্রসন্ন গোয়ালিনী বা ভীষ্মদেব খোশনবীশ চরিত্রসমূহ

জীবন থেকে উদাহৃত সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধি। নসীরামবাবু মোসাহেবে পরিবৃত জমিদার। তাঁর আশ্রয় লাভ করেছেন ব্রাহ্মণ কমলাকান্ত। অন্যদিকে প্রসন্নর দুগ্ধ ও ঘোলে তিনি পরিপুষ্ট। এই প্রসন্ন সমাজের এক বিশিষ্ট প্রতিনিধি। তার মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র গোব্রাহ্মণ সেবিকার এক ভাবমূর্তি অঙ্কিত করেছেন। প্রসন্ন মাঝে মাঝে কটু কথা বললেও কমলাকান্তের সেবার দিকটি সে অবহেলা করে নাই। খোশনবীশও সমাজের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি। আদালত বা রেজেস্টারি অফিসে তার আনাগোনা। নকলনবীশের কাজ করে সে ভদ্রভাবে জীবনযাপন করে। অতিথি সংকার বা নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দানের ন্যায় পুণ্যকার্যে তার বিমুখতা নেই। সুতরাং সমাজের এই জীবনধারার মধ্যে কমলাকান্ত এক বিশিষ্ট প্রতিনিধি রূপে স্থান পেয়েছেন। তাই মনে হয়—যে, বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের এক বাস্তব পটভূমিকা অঙ্কিত করে তার মধ্যে কমলাকান্তকে স্থাপন করেছেন। মাটির সংগে দৃঢ় সংযোগে এই চরিত্রটি তাই সার্থক হয়ে উঠেছে। জমিদারকেন্দ্রিক সমাজজীবনে কমলাকান্ত তাঁর হাস্য-পরিহাস এবং গভীর জীবনবোধ নিয়ে আমাদের নিকটে সমুজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছেন। কীটসের ভাষায় তিনি যেন 'Like a throbbing Star in the sapphire heaven's deep repose'.

'কমলাকান্তের দপ্তর' কোন্ শ্রেণীর সাহিত্য :

কমলাকান্তের দপ্তর বঙ্কিমচন্দ্রের এমন এক অসামান্য সৃষ্টি যে, সাহিত্যের কোন বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা বড় কঠিন। আপাতদৃষ্টিতে একে প্রবন্ধ বলে মনে হবে, কেননা যুক্তিসিদ্ধ বক্তব্য, মননের দীপ্তি এবং শিল্পসংগত পরিণতির জন্য একে প্রবন্ধগ্রন্থ মনে করা স্বাভাবিক। প্রবন্ধ যদি বস্তুনিষ্ঠ হয় তবে তার মধ্যে থাকবে বিষয়ের রূপকে ব্যাখ্যা করবার প্রয়াস। এইহেতু যুক্তি-তর্ক, বিচার ও সিদ্ধান্তের অবতারণা প্রবন্ধ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু কমলাকান্তের দপ্তর পাঠ করলে আমাদের স্বীকার করে নিতে হয় যে, এটি প্রবন্ধ পুস্তক নয়। বস্তুনিষ্ঠ অথবা ভাবনিষ্ঠ কোনো প্রবন্ধের রীতি অনুযায়ী এটি আগাগোড়া রচিত হয়নি। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধে থাকে বক্তব্যকে প্রকৃষ্ট যুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস। স্বভাবতঃ তা তথ্য-সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু এ গ্রন্থ যে তা নয় তার প্রমাণ আমরা সহজেই পেয়ে থাকি। 'বড়বাজার' প্রবন্ধে আমরা দেখি বিবাহযোগ্যা রূপসী, বিদ্যা-সাহিত্য-যশ-বিচার প্রভৃতির বিচিত্র বাজার। বাস্তবিকপক্ষে বিশ্বসংসার একটি বৃহৎ বাজার। সেখানে সকলে আপন আপন দোকান সাজিয়ে বসে আছে। সকলের উদ্দেশ্য মূল্যপ্রাপ্তি। কমলাকান্তরূপ গোয়ালাও সেখানে দপ্তররূপ পচা ঘোলের হাঁড়ি নিয়ে বসে আছেন। তিনি আপনি ঘোল খাচ্ছেন ও পরকে খাওয়াচ্ছেন। বড়বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার ভিড়। কিন্তু আমাদের সচকিত হয়ে উঠতে হয় যে, সাধারণ অর্থে একে বাজার বলা চলে না। কেননা, বিক্রেতাগণ এমন সব পসরা সাজিয়ে নিয়ে বসে আছেন, যা দৈনন্দিন

বাজারে ক্রয়বিক্রয় করা হয় না।' বিড়াল' প্রবন্ধ যদি তথ্যনিষ্ঠ হতো তবে বিড়ালের চতুষ্পদ জন্তুরূপে বিবরণের দিক্ প্রধান হয়ে উঠতো। কিন্তু তা না হয়ে সমাজে দারিদ্র্য ও ধনবণ্টনের বৈষম্য নিয়ে প্রাজ্ঞ মার্জারের সংগে কমলাকান্তের বক্তব্যের সংঘাত ঘটেছে। আবার 'পতঙ্গ' প্রবন্ধে পতঙ্গের পরিচয় নিষ্প্রভ হয়ে সংসারে জ্ঞান-বহ্নি, ধনবহ্নি, মানবহ্নি প্রভৃতির কথা বর্ণিত হয়েছে। কমলাকান্ত বলেছেন যে, সংসার বহ্নি। তিনি পরে বলেছেন যে, ঈশ্বর, ধর্ম, জ্ঞান, প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ। অথচ পতঙ্গের ন্যায় আমরা অলৌকিক, অপরিজ্ঞাত পদার্থ কেন্দ্র করে আবর্তিত হই। 'ঢেঁকি' প্রবন্ধে কোনও মূল্যবান তথ্যের কথা অবতারণা না করে কমলাকান্ত বর্ণনা করেছেন যে, এই সংসার ঢেঁকিশাল। জমিদার, আইন-কারক, বিচারক, গৃহিণী এবং সর্বাপেক্ষা ভয়ানক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের লেখক যথাক্রমে প্রজাবৃন্দ, মিনিট. রিপোর্ট, বিচারপ্রার্থী, একাদশীর গড়ে বাজার খরচ অনুমোদন করে অনাহারব্যবস্থা এবং মা সরস্বতীকে নির্মমভাবে নিপীড়ন করে চলেছেন। সুতরাং এখানেও ঢেঁকির বস্তুগত তত্ত্ব সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে। প্রচলিত প্রবন্ধের সংজ্ঞায় একে ব্যাখ্যা করা যায় না।

ভাবনিষ্ঠ প্রবন্ধে লেখক একটি মূল ভাবকে কেন্দ্র করে বক্তব্যের মাধ্যমে তাকে বিন্যস্ত করেন। লেখকের লক্ষ্য হলো ভাবটিকে পরিস্ফুট করা। কিন্তু এই দিক থেকেও কমলাকান্তের দপ্তরের রচনাসমূহকে ভাবনিষ্ঠ বলা কঠিন। কোনও একটি মূলভাব প্রকাশের শর্ত না মেনে কমলাকান্ত তাঁর রচনায় বহু বিচিত্র প্রসঙ্গ ও সেই সম্পর্কে মনোজ্ঞ বক্তব্যের এবং মন্তব্যের অবতারণা করেছেন। 'আমার মন' প্রবন্ধে কমলাকান্ত তাঁর অপহৃত মনের সন্ধানে বেড়িয়েছেন। রন্ধনশালায় বা প্রসন্নের নিকটে অথবা লাবণ্যময়ী যুবতীর নিকটে তিনি তার মনের সন্ধান পেলেন না। এই প্রসঙ্গ থেকে অত্যন্ত সহজে তিনি ইংরেজ জাতি আনীত আধুনিক সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য বাহ্য সম্পদের সমালোচনা করেছেন। বর্তমান কালে অর্থ হয়ে উঠেছে প্রধান দেবতা। কিন্তু মানুষ তার মানসিক সুখ হারিয়েছে। কমলা-কান্তের বক্তব্য হলো যে, ধন, যশ, প্রভৃতিতে সুখ আছে বটে কিন্তু তা স্থায়ী নয়। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে তিনি পরিক্রমা করেছেন। প্রবন্ধ-লেখকের ন্যায় কোন বিশেষ ভাবকেন্দ্রে নিজেকে আবন্ধ রাখেননি।

"পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোনো মূল নাই, এটি দাঁড়িয়েছে মূল বক্তব্যরূপে আবার 'বসন্তের কোকিল' প্রবন্ধে কোকিলের পঞ্চম স্বরের প্রশংসা করে তিনি সাহিত্যে প্রবেশ করেছেন। কমলাকান্ত বলেছেন যে, ভারতচন্দ্র আদিরস পঞ্চমে ধরে জিতে গিয়েছেন, কবিকঙ্কণের ঋষভ-স্বর কে শুনতে চায়। এর পরে কমলাকান্ত খেদের সংগে জানিয়েছেন যদি তিনি কোকিলের কণ্ঠ পান তবে মনের কথা বলতে পারেন। "ঐ নীলাম্বর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ঐ নক্ষত্রমণ্ডলী মধ্যে উড়িয়া কখনো কি কুহু বলিয়া ডাকিতে পাইব না"? 'বিবিধ

প্রবন্ধে' বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রবন্ধসমূহ রচনা করেছেন তা যেমন যুক্তিনিষ্ঠ তেমনিই বক্তব্যের গুরুত্বে তাৎপর্যবহ। এই সকল প্রবন্ধে ভাবের বিচিত্র বিলাস নেই, নেই কাল্পনিকতার আড়ম্বর। কিন্তু বাংলা ভাষা, গীতিকাব্য, মনুষ্যত্ব কি, প্রভৃতি প্রবন্ধসমূহ আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্যের অবতারণাকে কেন্দ্রীভূত করে উপসংহারে এসে পেঁাছেছেন। কিন্তু 'কমলাকান্তের দপ্তরে' তিনি বস্তু থেকে ভাবে, ভাব থেকে কল্পনায়, কল্পনা থেকে হৃদয়বৃত্তির উচ্ছ্বাসে স্বচ্ছন্দভাবে পরিক্রমা করেছেন। মনন ও কল্পনা তাঁর আশ্রয়। কীটস কল্পনাকে প্রাধান্য দিয়ে বলেছেন :

> She will bring in spite of frost
> Beauties that the earth hath lost,
> She will bring thee, all together.

কমলাকান্তের দপ্তরের পরিকল্পনা স্বতন্ত্র রীতির। এখানে তিনি নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর মূল লক্ষ্য মনুষ্য জীবনের প্রতি। সমাজ, স্বদেশ, সাহিত্য প্রভৃতি প্রসঙ্গের সমস্যাবলী তাঁর আলোচনার বিষয় হলেও তাঁর মূল দৃষ্টি হলো যে, মানুষ কি করে সুখী হতে পারে। সকল ক্ষেত্রে আমরা তাঁর বক্তব্যের বহুধা ব্যাপ্তির সঙ্গে পরিচিত হলেও তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বকে অনুভব করি। ভীষ্মদেব খোশনবীশ দপ্তরের রচনাসমূহের অসংলগ্ন উক্তির সমাবেশ ও অনিদ্রার মহৌষধ রূপে বর্ণনা করলেও সন্দর্ভসমূহের গভীর তাৎপর্য আছে। এ সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণীয়। তিনি লিখেছেন যে, এই প্রবন্ধসমূহে শুধু রচয়িতার ব্যক্তিমানস নয়, তাঁর আবেগ-অনুভূতি, কল্পনা, স্বপ্ন ও জীবনবোধ প্রভৃতি সূক্ষ্ম তন্তুজালে রচিত হয়েছে। এগুলি এক বিশিষ্ট আবেদন নিয়ে পাঠকের হৃদয়দ্বারে দেখা দিয়েছে। "মনের একটি আকৃতি, বেদনার একটি স্পন্দন, কল্পনার একটু উচ্ছ্বাস, জীবনানুভূতির একটু তরঙ্গলীলা" যেন সুগঠিত অবয়বে সংহত হয়েছে। একটি অলক্ষ্য যোগসূত্রের আকর্ষণে চিন্তা-ভাবনাসমূহ নানা তন্ত্রী সমন্বিত সুর সংগীতে (Harmony) পরিণত হয়ে পাঠকের অন্তরে সংগীতের অনুরণন সৃষ্টি করে"। কমলাকান্তের দপ্তরে আমরা যে প্রসঙ্গ পরিবর্তন লক্ষ্য করি তা "কোনও বহিরঙ্গমূলক যুক্তি পারম্পর্যের দ্বারা নহে, এক নিগূঢ় মর্মানুভূতির অনুসরণে উহার অন্তর্নিহিত প্রাণলীলার স্বতঃস্ফূর্ত আত্মসম্প্রসারণ"। কমলাকান্তের যুক্তিসমূহ, রাজপথ দিয়ে চলাফেরা করেনি, তারা এসেছে বিশেষ মনোভঙ্গীর তির্যক পথ দিয়ে। এই মনোভঙ্গী ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়েছে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ধাবিত হয়েছে। প্রবন্ধসমূহ যেভাবে শুরু হয় তাদের পরিণতি ঘটে রসসিন্ধিতে। কিন্তু এই আপাত অসামঞ্জস্য প্রবন্ধসমূহের বক্তব্য খণ্ডিত না করে অভাবনীয়রূপে ব্যক্তিত্বের প্রভাব হেতু ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয়েছে। "একটি গীত" নামক প্রবন্ধ শুরু হয়েছে, বৈষ্ণব পদাবলী প্রসংগে। কমলাকান্ত

একটি মহাজন পদ গান করেছেন। পদটি প্রেমভাবনামূলক। কিন্তু পরে দেখা যায় যে, পদের ব্যাখ্যা রসতন্ময়তা ত্যাগ করে বঙ্গভূমির পরাধীনতার বেদনায় সমাপ্তি লাভ করেছে। সূচনায় যা বর্ণিত হয়েছে তা প্রবন্ধের মূল কথা নয়, মূল কথা হলো বঙ্গদেশে সুখের স্মৃতি আছে, কিন্তু নিদর্শন নেই। "সুখ গিয়াছে সুখচিহ্নও গিয়াছে, বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে—চাহিব কোন্ দিকে!" বৃন্দাবন ও বঁধুর প্রসংগ উত্থাপন করে কমলাকান্ত দৃষ্টি নিবন্ধ করেছেন, বঙ্গদেশের শ্মশানভূমি নবদ্বীপের প্রতি। কলধৌত বাহিনী গঙ্গার দিকে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, সেই রাজলক্ষ্মী কোথায়! কবির ভাবগম্ভীর দৃষ্টি নিয়ে কমলাকান্ত যেন প্রত্যক্ষ করেছেন, "আকাশ মেঘে ঢাকিতেছে। ঐ সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রাজলক্ষ্মী জলে নামিতেছে। অন্ধকারে নির্বাণোন্মুখ আলোক বিন্দুবৎ জলে ক্রমে ক্রমে সেই তেজোরাশি বিলীন হইতেছে। যদি গঙ্গার অতল জলে না ডুবিলেন তবে আমার সেই দেশলক্ষ্মী কোথায় গেলেন'। 'একা', 'কে গায় ঐ' নামক প্রবন্ধে বহুকাল বিস্মৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় মধুর গীতি তাঁর হৃদয়কে আলোড়িত করে তুলেছে। এই প্রসংগ থেকে তিনি এসেছেন, নিঃসঙ্গ জীবনের একাকীত্বে। তিনি একা, কিন্তু কেউ প্রণয়ভাগী নাহলে তবে মনুষ্য জন্ম বৃথা। 'পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয় কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।' মানবপ্রীতি কমলাকান্তের মূল উদ্দেশ্য ও ধর্ম হওয়ায় তিনি লিখেছেন, প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী। ঈশ্বরই প্রীতি'। তাই দেখা যায় কমলাকান্তের দপ্তরকে শ্রেণী-চিহ্নিত করা কঠিন। এই গ্রন্থের প্রবন্ধসমূহ একাধারে বস্তুনিষ্ঠ ও ভাবনিষ্ঠ। রচনা রসসম্ভোগ 'দপ্তরে'র লক্ষ্য। তাই যুক্তি, সিদ্ধান্ত, ভাব, কল্পনা সকলই মিশ্রিত হয়ে এই গ্রন্থকে এক বিশিষ্ট মর্যাদা দান করেছে। গ্রন্থটি এক অভিনব সৃষ্টি।

'কমলাকান্তের দপ্তরে' উপন্যাসের লক্ষণসমূহ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উপন্যাসের তিনটি বিশিষ্ট লক্ষণ হলো কাহিনীর বিন্যাস বা আখ্যান, চরিত্রসৃষ্টি ও লেখকের জীবন-দর্শন। আখ্যানের পরিচয় দপ্তরের বিভিন্ন রচনায় আমরা পাই। মনুষ্যফল, আমার মন, বিড়াল প্রভৃতি প্রবন্ধে কাহিনী বর্ণনার একটি সুবিন্যস্ত রূপ আছে। 'ফুলের বিবাহ' রচনায় একটি নিটোল গল্পের আয়োজন করা হয়েছে। মল্লিকার সংগে সুপাত্র গোলাপের বিবাহ স্থির হয়েছে। গোলাপ বংশ কুলীন, এরা 'ফুলে' মেল। বিবাহ সভায় বকুল, রজনীগন্ধা, যূথি, মালতী প্রভৃতি এয়োগণ স্ত্রী আচার করে পাত্রকে বরণ করলো। কন্যাসম্প্রদান শেষে পুরোহিত মহাশয় দু'জনকে এক সুতোয় গেঁথে গাঁটছড়া বেঁধে দিলেন। কুসুমলতার আহ্বানে কমলাকান্তের স্বপ্নভঙ্গ হলো। সেই রম্যবাসর, শুভ্রস্মিত সুধাময়ী পুষ্প সুন্দরীগণ স্মৃতির দর্পণতলে, স্মৃতিসাগরগর্ভে বিলীন হয়েছে কুসুমকুমারীর মালায় বর-বধূ গাঁথা পড়েছে। নসীরামবাবুর বাগানে বসে অহিফেন

প্রসাদে যে ফুলের বিবাহ কমলাকান্ত দেখেছেন তা বাস্তব জীবনের চিত্র। সংসারে কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে ভেদ নেই, একে অন্যের পরিপূরক। সুনিপুণ গল্প-লেখকদের ন্যায় কমলাকান্ত একটি চমৎকার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। 'বিড়াল' প্রবন্ধে কাহিনী সুবিন্যস্তরূপে বর্ণিত হয়েছে। বিড়ালের দুগ্ধ-ভক্ষণ রূপ তস্করবৃত্তিকে কেন্দ্র করে দুইটি চরিত্রের কথোপকথন, উভয়ের মতবাদের সংঘাত, নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপনার দক্ষ চাতুর্য কাহিনীর প্রবাহে আবর্ত সৃষ্টি করেছে। নিঃসন্দেহে এগুলি উপন্যাসের লক্ষণরূপে গৃহীত হবে। 'আমার মন' রচনাটি সূচনায় চিত্তাকর্ষক কাহিনী বর্ণনার ভূমিকা রচনা করে অকস্মাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে লেখকের সুগভীর জীবন-দর্শনকে পথ ছেড়ে দিয়েছে। মানুষের জীবনে স্থায়ী সুখের উৎস কোথায় এই হলো জীবন-জিজ্ঞাসা। এইটি রচনার প্রধান সুররূপে দেখা দিয়েছে। এটি 'একা' ও পরোক্ষভাবে 'বিড়াল' প্রবন্ধেরও মূল কথা। 'মনুষ্যফল' আর একটি বিশিষ্ট রচনা। এর মধ্যে উপন্যাসের লক্ষণ আছে। এখানে কাহিনী-বিন্যাসের কোন আয়োজন নেই, তবে অনেকগুলি শ্রেণী-চরিত্র এসেছে। এরা কমলাকান্তের দিব্যদৃষ্টির প্রসাদে আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়েছে। তবে তারা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে অংশ গ্রহণ না করায় ক্রিয়াশীল নয়, লেখকের বর্ণনায় এদের ভাবরূপ সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। আফিমের মাত্রা একটু বেশী চড়ানর ফলে কমলাকান্ত দেখলেন মনুষ্যসকল ফল বিশেষ—মায়াবৃন্তে সংসার ডালে ঝুলিয়া রহিয়াছে, পাকিলেই পড়িয়া যাইবে। কমলাকান্ত বর্ণনা করেছেন যে, দেশের বড় মানুষগণ কাঁটাল জাতীয়। শৃগালজাতীয় দেওয়ান, কারকুন, নায়েব, গোমস্তা, মোসাহেব প্রভৃতি পাকা কাঁটালের লোভে গাছতলায় ভিড় করে। মাছিরা একটু রসের প্রত্যাশী। কারও মাতৃদায়, কারও কন্যাদায়, কেউ সংবাদ-পত্র বের করেছে, কেউ-বা পিসীর ভাশুর-পুত্রের শ্যালীপুত্র, খেতে পায় না, কেউ-বা টোলের দরিদ্র অধ্যাপক। 'রমণীমণ্ডলী এ সংসারের নারিকেল'—এই উপমা প্রথমে অসার্থক ও প্রগলভ মনে হলেও এর তাৎপর্য আমাদের বিস্মিত করে। নারিকেলের শস্য হলো স্ত্রীলোকের বুদ্ধি। ঝুনোর বেলায় বড় কঠিন, দন্তস্ফুট করা যায় না। তখন তাকে বলে গৃহিণীপণা। কন্যা অলঙ্কার-প্রত্যাশী, ঝুনো তাকে একটি মাকড়ি দিল, পুত্র চায় নগদ পুঁজির উপরে দাঁত বসাতে, ঝুনো তাকে নগদ সাত সিকা দিল, স্বামী প্রাচীন বয়সে ব্যবসা করতে চান, হাতে টাকা নেই, ঝুনোর পুঁজির উপরে দৃষ্টি। যদি কোনক্রমে দাঁত বসলো তবে নারিকেল জীর্ণ করা অসাধ্য। টাকা ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত, অজীর্ণ রোগে নিদ্রা হয় না। এই যে নানা চরিত্রের সমাবেশ, শ্রেণীরূপের প্রতিনিধিরূপে তাদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য, এদের উপন্যাসের উপাদানরূপে স্বীকৃতি দিতে হয়।

'বড়বাজার' প্রবন্ধে আছে কাহিনীর চমৎকার বিন্যাস ও একে আশ্রয় করে কমলা-

কান্তের প্রকাশিত হয়েছে ভূয়োদর্শনজাত জীবন দৃষ্টিভঙ্গী। 'অতএব এই বিশ্বসংসার একটি বৃহৎ বাজার'—এই সত্য প্রকাশের জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতার ভিড় ঘটেছে। তন্মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে মাছের বাজার যেখানে দর 'জীবন-সর্বস্ব' ও দালাল পুরোহিত। ঝুনো নারিকেলের দোকান, বিক্রেতা ভট্টাচার্য মহাশয়গণ, তাঁদের পরামর্শ হলো নারিকেলের ছোবড়া ভক্ষণ, কেননা পদার্থতত্ত্ব তাই শিক্ষা দিয়ে থাকে। বাংলা সাহিত্যের দোকানে বিক্রয় করা হচ্ছে অপক্ক কদলী, ক্রেতা শিশু ও অবলাগণ। দইহাটায় স্বয়ং কমলাকান্ত দপ্তররূপ পচা ঘোলের হাঁড়ি নিয়ে বসে আছেন। নিজে খাচ্ছেন ও অপরকে খাওয়াচ্ছেন।

'কমলাকান্তের দপ্তর' উপন্যাসের ভূমিকা রচনা করেছে। এই গ্রন্থের প্রবন্ধ-সমূহের মধ্যে যে ভাবগত ঐক্য আছে তাতে প্রবক্তা অর্থাৎ কমলাকান্তের চরিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কমলাকান্ত তাঁর রসাশ্রয়ী মত ও মন্তব্য, লঘু ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ ও জীবন-দর্শনের উপস্থাপনার দ্বারা আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ডিকেনসের পিকউইকের ন্যায় তিনিও আমাদের চির-পরিচিত সুহৃদ। এই অকৃত-দার, সহাস্য, নির্লোভ ব্রাহ্মণকে বাদ দিলে সংসারযাত্রা অসার্থক মনে হয়। কমলা-কান্ত তাঁর চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত মন্তব্যসমূহের দ্বারা তাঁর নিজের চরিত্র পরিচয় দান করেছেন। তাঁর অহিফেন প্রীতি ও ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণের আসক্তি, সাংসারিক নির্লিপ্ততা, নসীবাবুর গৃহে প্রতিপাল্যের ন্যায় আশ্রয় গ্রহণ, প্রসন্নর সঙ্গে তাঁর 'গব্যরস ও কাব্যরসে মিশ্রিত অর্ধ প্রণয়ীর সরস মনোভাব,' জীবন থেকে তাঁর দার্শনিক তত্ত্ব সংগ্রহ ও আদালতের বিরুদ্ধ পরিবেশে—তাঁর দার্শনিক ও নৈয়ায়িক শক্তির প্রকাশ—এই সকল গুণাবলী কমলাকান্তকে সজীব, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন চরিত্ররূপে আমাদের নিকটে উপস্থিত করেছে। তাঁর সংস্পর্শে এসে নসীরামবাবু, প্রসন্ন, ভীষ্মদেব তাঁর জীবনীশক্তির কিছুটা অংশ লাভ করে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

'কমলাকান্তের দপ্তরকে' কালীপ্রসন্নের হুতোমের ন্যায় নকশা বলা চলে না। নকশায় থাকে চিত্রধর্মিতা। কতকগুলি খণ্ড খণ্ড চিত্রের সহায়তায় লেখক তাঁর বক্তব্য প্রকাশিত করেন। মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' নকশাধর্মী রচনা, কেননা এখানে কোন ধারাবাহিক কাহিনীর আশ্রয় না নিয়ে নাট্যকার চিত্র-সমষ্টির মাধ্যমে নাট্যরূপ সৃষ্টি করেছেন, চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন ও সমাজ-জীবনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু কমলাকান্তের দপ্তর চিত্রধর্মী রচনা নয়। এখানে দেখি একটি চরিত্রের প্রবল ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। এই চারিত্রশক্তি প্রবন্ধসমূহে প্রকৃষ্ট বন্ধন রচনা করেছে ও রূপে অভিব্যক্ত হয়েছে।

কোন একটি বিশেষ নামে 'দপ্তরকে' চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। যেহেতু গ্রন্থটি আমাদের রসবোধকে তৃপ্ত করে, তাই ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একে

বলেছেন রস-সন্দর্ভ। রচনার রস-সম্ভোগে এর তাৎপর্য প্রমাণিত হয়।

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত 'দপ্তরের' সাহিত্য-প্রকৃতি ব্যাখ্যা-কল্পে যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে ছিল 'একটি পরিহাসপটু গম্ভীর, রসিক, অন্যদিকে ছিল একটি কঠোর শাসক,—একটি সংস্কর্তা'। দুটি দিক ছিল সদাজাগ্রত। একটি অপরটিকে সংযত রেখেছে। তবুও সংস্কারক —সত্তাটি প্রধান না হয়ে তাঁর রস-চেতনাকে পথ ছেড়ে দিয়েছে। সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি বা রাজনীতি নিয়ে তিনি মত ও মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আসলে মূল প্রেরণা হলো রস সাহিত্যের। অষ্টাদশ শতকের প্রধান রচনাকার এডিসন ও স্টীলের ও ঊনবিংশ শতাব্দীর চার্লস ল্যামের প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় পরিলক্ষিত হয় ও সেইহেতু 'দপ্তরকে'ও 'ফ্যামিলিয়ার এসেস' রূপে অভিহিত করা চলে।

এই জাতীয় রচনায় লক্ষ্য করা যায় অতি সাধারণ বা তুচ্ছ কথা নিয়ে বা হাস্যকর কোন ঘটনা অবলম্বনে লেখক বক্তব্য শুরু করেন এবং তা ক্রমে ক্রমে গভীরতর তাৎপর্যে পরিণতি লাভ করে। 'আমার মন' শুরু হয়েছে কমলাকান্তের মন চুরি বলায় অবিশ্বাস্য প্রসঙ্গ নিয়ে, আবার বড়বাজার আরম্ভ হয়েছে প্রসন্ন গোয়ালিনীর সংগে বিচ্ছেদের সম্ভাবনায়। কেননা পরলোকের সদগতি-কামনা বিস্মৃত হয়ে সে কমলাকান্তের নিকটে ক্ষীর-সর, দধি, দুগ্ধ ও নবনীতের জন্য দাম চেয়েছে। সুতরাং পৃথিবীতে ভক্তি, প্রীতি, স্নেহ, প্রণয়াদির কোন মূল্য নেই। এই লঘু সুরের অবতারণা করে কমলাকান্ত সহজে যেন বক্তব্যের গভীরে প্রবেশ করেছেন। অত্যন্ত হার্দ্য সুরে তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বাতাবরণে জীবন-জিজ্ঞাসার সুরটি ব্যক্ত করেছেন। রস-রচনার প্রধান দিকটি হলো বিষয় নিরপেক্ষতা। যে-কোন বিষয় অবলম্বন করে লেখক তাঁর মনোগত ভাব ব্যক্ত করে থাকেন। এখানে তাঁর জীবন-রস রসিকতা তাঁকে সহায়তা করে। হয়ত কোন সাধারণ জিনিস তাঁর মনে ভাবের তরঙ্গ সৃষ্টি করে। সফল কিছুর পশ্চাতে থাকে তাঁর ব্যক্তিত্ব। ফরাসী দেশের মঁতেন (Montaigne) থেকে আরম্ভ করে রাস্কিন পর্যন্ত এই ধারা প্রসারিত।

ডঃ দাশগুপ্ত রাস্কিনের 'A blade of grass' রচনাটি উল্লেখ করে তার মধ্যে কবিচিত্তের সম্পূর্ণ প্রকাশের কথা বলেছেন। একে তিনি বলেছেন 'a lyric in prose' অর্থাৎ গদ্য গীতি-কবিতা। একটি ঘাসের শীষের ভিতরে লেখক তাঁর মনের মাধুরী সঞ্চারিত করেছেন। 'ইহার ভিতরে কত নিগূঢ় সত্য, সৌন্দর্য, মাধুর্য এবং অপূর্ব মাহাত্ম্যের সৃষ্টি করিয়া তাহাকে যেন নূতন করিয়া গড়িয়া লইয়াছেন'।

পাশ্চাত্যের দার্শনিক তত্ত্বের প্রভাব, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আলোচ্য গ্রন্থে থাকতে পারে। কোঁতের ধ্রুবদর্শন বা মিলের হিতবাদের প্রভাব 'দপ্তরে'

পরিলক্ষিত হলেও দার্শনিক তত্ত্ব এখানে বড় কথা নয়। বড় হলো সাহিত্য-রস ও রুচি।

তুচ্ছ প্রসঙ্গ বা লঘু ও সরস মন্তব্যের অবতারণা করে কমলাকান্ত স্বচ্ছন্দভাবে গভীরে এসে উপনীত হন, এ-কথা যেমন সত্য, তেমনি কোন কোন প্রবন্ধে যথা 'বিড়াল' বা 'পতঙ্গে' তিনি আবার তত্ত্বে উত্তীর্ণ হবার জন্য একটি বিশেষ মানসিক ভাব বা চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করেন। একে অবলম্বন করে তাঁর মন বিশেষ থেকে নির্বিশেষের দিকে যাত্রা করে।

'বিচিত্র প্রবন্ধের' ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে, রচনা-রস সম্ভোগে উক্ত গ্রন্থের সার্থকতা। এই সম্ভোগে যেন কোন বাধা না ঘটে এ-জন্য প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের উপরে তিনি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। কমলাকান্তের মন বৈচিত্র্যধর্মী বলে তিনি নানা প্রসঙ্গের অবতারণার মাধ্যমে মূল বক্তব্যে উপনীত হয়েছেন।

ইংরাজী সাহিত্য ও কমলাকান্তের দপ্তর :—

ঊনবিংশ শতকে আমাদের দেশের সাহিত্য সমালোচনায় একটি বিশেষ রীতি গড়ে উঠেছিল। এখানে রচিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণকে ইংরেজী সাহিত্য ও সাহিত্য স্রষ্টার আলোকে বিচার করা হতো। যতক্ষণ না কোনো একজন লেখককে ইংরেজ লেখকের নামে চিহ্নিত করা যেতো ততক্ষণ যেন সমালোচনায় তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হতো না। তাই বঙ্কিমচন্দ্রকে ওয়ালটার স্কট, মধুসূদনকে মিলটন, নবীনচন্দ্রকে বায়রণ এমনকি রবীন্দ্রনাথকে শেলীর সংগে তুলনা করা হয়েছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকৃতির ক্ষমতাকে প্রসংশা করা হতো। অনুকরণের মধ্যে যে মৌলিকতা নেই, সৃষ্টির মধ্যে মৌলিকতার প্রকাশ এই সত্য বিস্মৃত হয়ে— অসংগতভাবে ইংরেজী লেখকগণকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে এদেশের লেখকগণকে তাঁদের ছায়ার মধ্যে যেন অস্পষ্ট আলোকে প্রত্যক্ষ করা হতো।

সাহিত্যের ভাবধারা কদাপি দেশে কালে আবদ্ধ থাকে না। একদেশের সাহিত্য ও তার ভাবনা অন্য দেশের রচনাকে প্রভাবিত করে থাকে, এটি স্বাভাবিক। সজীব মন ভাবধারাকে স্বীকৃতি দেয়; কিন্তু এটি প্রকাশিত হয় অনুকরণে নয়, সাঙ্গীকরণে। কমলাকান্তের দপ্তরে ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে যদি এসে থাকে তাতে বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নেই। তবে সেই প্রভাব এই জাতীয় নয় যে, তার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বকীয়তা লুপ্ত হয়েছে।

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন, বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব নির্ণয়কল্পে কমলাকান্তের দপ্তরে প্রভাব প্রসঙ্গে ডিকুইনসি রচিত 'Confessions of an Opium-Eater'-এর উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ভীষ্মদেব খোশনবীস্-এর চরিত্র স্কটের 'Tales of my landlord.' উপন্যাসের জেডেভিয়া ক্লেইম্‌বোথাম্ চরিত্রের আদর্শে গঠিত হয়েছে। কমলাকান্তের জোবানবন্দীর পরিকল্পনায় ডিকেন্সের

'সাম ওয়েলার'-এর প্রভাব এসেছে। স্বয়ং কমলাকান্ত এডিসন্ সৃষ্ট 'রোজার ডি কভলি''র সংগে তুলনীয়। 'বিড়াল' প্রবন্ধে লী হাণ্ট রচিত 'The Cat by the fire' রচনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এতে একথা বলা যাবে না যে, কমলাকান্তের মৌলিকতা নষ্ট হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের পরিকল্পনায় ইংরেজী সাহিত্যের নিকটে গভীরভাবে ঋণী একথা বলাও অসঙ্গত হবে না।

কমলাকান্ত জীবন-রসের রসিক। তাঁর চরিত্রে সরসতার অন্ত নেই, কিন্তু তারই আলোকে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তিনি জীবনের নানা দিক ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মধ্যে আমরা যে কৌতুক বোধের (Humour) উজ্জ্বল পরিচয় পাই সেই ক্ষেত্রে তিনি হয়ত কয়েকজন ইংরেজ লেখকের নিকটে ঋণী। এই ঋণ তাঁর সর্বোপরি চার্লস ল্যামের নিকটে। যে প্রসন্ন ও সরস অথচ নির্লিপ্ত মনোভাব নিয়ে ল্যাম তাঁর পারিপার্শ্বিক জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করেছেন, তা তাঁর রচনার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি যেন সকৌতুকে বিভিন্ন মানুষের এমনকি তাঁর নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। কমলাকান্ত হয়ত স্টার্ণ এবং ঊনবিংশ শতকের ডিকেন্সের নিকটে ঋণী। স্টার্ণের 'Uncle Toby' উচ্চাঙ্গের সূক্ষ্ম রসিকতার প্রতীক। তাঁর ব্যবহারের উৎকেন্দ্রিকতা এবং মন্তব্যের অযৌক্তিক একদেশদর্শিতার মধ্যে গভীর সত্যদৃষ্টি প্রচ্ছন্ন আছে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার অবিচারে বঞ্চিত হতভাগ্যদের প্রতি তিনি করুণা ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। ডিকেন্সের অসাধারণ সৃষ্টি পিকুইক চরিত্রে ব্যঙ্গের অতিরঞ্জন ও সমবেদনার আন্তরিকতা প্রকাশিত হয়েছে। কমলাকান্ত চরিত্রের এই দিকটি বিশেষরূপে লক্ষ্যণীয়। তিনি যেমন সমাজের, সাহিত্যের, রাজনীতির অসংগতি ও নিষ্ফলতা নিয়ে কৌতুকরসে মণ্ডিত, ব্যঙ্গের পরিচয় দিয়েছেন তেমনই আবার হতভাগ্যদের উপরে করুণার অশ্রুবর্ষণ করেছেন।

যে ইংরেজী প্রভাবের কথা কমলাকান্তের দপ্তর প্রসংগে বলা হয়ে থাকে তা কমলাকান্ত অথবা অপর কোন চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করে নি। ডিকুইন্সির মত কমলাকান্ত আফিমের নেশা করেন; সাদৃশ্য এই পর্যন্ত। কিন্তু এই নেশার ফলে দিব্যদৃষ্টি লাভ তা কমলাকান্তের নিজস্ব। আফিমের মাত্রা একটু বেশী হলে তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে, সংসার বৃক্ষের মায়াবৃন্তে মনুষ্যসকল ফল বিশেষ। তিনি দেখতে পান পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের মনুষ্য যেন পৃথক জাতীয় ফল। তন্মধ্যে নারিকেলের সংগে স্ত্রীলোকের সাদৃশ্য গভীর। তিনি নারিকেলের মালাকে স্ত্রীলোকের বিদ্যার সংগে তুলনা করে বলেছেন যে, তাদের বিদ্যা কখনও অর্ধ ব্যতীত পুরা দেখা যায় না। নারিকেলের মালা বড় কাজের না, স্ত্রীলোকের বিদ্যাও বড় নয়। ছোবড়া হল স্ত্রীলোকের রূপ, দুটিই অসার, পরিত্যাগ করা ভাল। এই আফিমের নেশার ঘোরে কমলাকান্ত ফুলের বিবাহ প্রত্যক্ষ করেন, এবং সংসারকে দেখেন ক্রয়-বিক্রয়ের কেন্দ্রস্থল বড়বাজার রূপে। আবার কমলাকান্ত

সপ্তমী পূজোর দিনে আফিম চড়িয়ে কাল সমুদ্রে দেশ-লক্ষ্মীরূপে প্রতিমা বিসর্জন প্রত্যক্ষ করে বেদনায় বিহ্বল হয়েছেন। কমলাকান্তের যে জীবনদর্শন সেটি তাঁর নিজস্ব। এটি হল তাঁর মনুষ্যত্ব, মানবধর্ম, সৌন্দর্যপ্রীতি ও দেশপ্রেম। ইংরেজী সাহিত্যের কোন প্রভাব এখানে প্রত্যক্ষ করা যায় না।

অপর যে সকল চরিত্র যথা নসীরামবাবু, প্রসন্ন গোয়ালিনী, বা ভীষ্মদেব খোশনবীস্ দপ্তরে দেখা দিয়েছেন, তাঁদের পরিকল্পনা মৌলিক। তাঁরা কমলাকান্তকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছেন। ভীষ্মদেবের চরিত্রে স্কটের প্রভাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সাদৃশ্য যদি কিছু থাকে, তা নিতান্ত বাহ্যিক। ভীষ্মদেব তাঁর পেশায় আদালতের দলিল লেখক। কিন্তু সংসারে তিনি ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ। ধর্ম জীবনের রীতি পালনে তাঁর মধ্যে কোন শৈথিল্য নেই। অতিথি সৎকার ও নিরাশ্রয়ের আশ্রয় দানের সৎকর্মে তিনি উদাসীন নন। নসীরামবাবু বাংলার ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশের প্রতিনিধি, তাঁকে মনুষ্যজাতিমধ্যে কাঁঠাল রূপে কল্পনা করা হয়েছে। শৃগালেরা দেওয়ান, নায়েব, মোসাহেব প্রভৃতি ছদ্মবেশে কাঁঠাল ভক্ষণের জন্য অতিমাত্রায় লোলুপ। আবার অপর মানুষেরা রসের প্রত্যাশী। এক জমিদারকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ প্রতিপালিত হয়ে থাকে। কমলাকান্ত নসীরামবাবুর উদার আতিথেয়তার আশ্রয় পেয়েছেন। সাংসারিক চিন্তা-ভাবনা, তাঁর কিছু নেই। কেননা, নসীরামবাবু তাঁর দায়দায়িত্ব নিয়েছেন। প্রসন্ন গ্রাম বাংলার অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক, তবে ব্রাহ্মণ সেবায় তার বিশেষ ভক্তি আছে। কমলাকান্তকে সে বিনামূল্যে দধি-দুগ্ধ সরবরাহ করে পুণ্যার্জন করে থাকে। প্রসন্নর সঙ্গে তাঁর গব্যরসাত্মক সম্পর্ক। গোসেবা ও ব্রাহ্মণ সেবা আমাদের দেশে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য রূপে চিরকাল স্বীকৃত। প্রসন্ন ও তার মঙ্গলা গাভীকে বাদ দিয়ে কমলাকান্তের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সে যদিও কখনও কখনও অপ্রসন্ন হয়ে কমলাকান্তের ন্যায় সংসার উদাসীন, পেশাবিহীন পরাশ্রয়-নির্ভর ব্যক্তির নিকট থেকে দধি-দুগ্ধের মূল্য দাবী করে, সেটি তার অভিমানপ্রসূত আচরণ মাত্র। সে ধর্মভীরু ও কর্মহীন ব্রাহ্মণ কমলাকান্তকে ভাল করে চেনে, এবং জানে বলেই তার সেবায় এই ঔদার্য বোধ এসেছে ধর্ম সংস্কার থেকে।

সুতরাং দেখা যায় যে, কমলাকান্তের সামগ্রিক পরিকল্পনার উপকরণ বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের পরিচিত জীবন থেকে গ্রহণ করেছেন। এখানকার জমিদারকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা, জমিদার গৃহের নানা শ্রেণীর মানুষের আশ্রয় গ্রহণ, ভীষ্মদেবের ন্যায় আদালতের পেশায় নিযুক্ত চরিত্র, কমলাকান্তের পাণ্ডিত্য ও চরিত্রের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, প্রসন্ন গোয়ালিনীর ব্রাহ্মণ সেবা প্রভৃতি মানুষদের নিয়ে কমলাকান্তের জগৎ গড়ে উঠেছে। এই জগৎ অভ্রান্তরূপে আমাদের বিশিষ্ট পল্লীজীবনের পরিচয় দান করে থাকে। স্বভাবত বিদেশী প্রভাবের অনুসন্ধান করতে

গেলে আমাদের কমলাকান্তের জগতের সংগে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হবে। বঙ্কিমচন্দ্র তাকে আমাদের পরিচিত জীবনের মধ্যে স্থাপন করেছেন। যদি কিছু প্রভাব এসে থাকে তা নিতান্ত বাহ্যিক।

কমলাকান্তের জীবন-দর্শন :—

বাইরের দিক থেকে মনে হবে যে কমলাকান্তের দপ্তর কয়েকটি হালকা ও গম্ভীর ব্যঙ্গ-হাস্য-দুঃখ-বেদনামূলক প্রবন্ধের সমষ্টি মাত্র। কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে যে তত্ত্বটি প্রকাশিত হয়ে বিচ্ছিন্নতাকে সংহতি দান করেছে তা হল কমলাকান্তের জীবনদর্শন।

'যৌবনের উদ্দীপনায় ডেপুটি বঙ্কিমচন্দ্র চাকুরী এবং সাহিত্য জীবনে সার্থকতা অর্জন করিয়া যশ-মান-অর্থ-প্রভাব-প্রতিপত্তি-মণ্ডিত হইয়া নির্বিঘ্নে চলিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরের অন্তঃস্তরে একটা ক্ষোভ ছিল, পরিণত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহা আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। বাঁচিয়া থাকার অর্থাৎ জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহার মনে মাঝে মাঝে প্রশ্ন উঠিত, নিজেকে নিঃসঙ্গ একক মনে হইত। হালকা হাসির ঢেউ তুলিয়া চাকুরী ও সংসারের স্রোতে আর পাঁচজনের মত ভাসিয়া চলিবার মধ্যবিত্ত মনোভাব কোনও দিনই তিনি আয়ত্ত করিতে পারেন নাই'। তাঁর মনের মধ্যে ভাবনা জেগে উঠতো। 'একা' প্রবন্ধে কমলাকান্ত বলেছেন :

> এই বহুজনাকীর্ণ নগরীমধ্যে, এই আনন্দময়, অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে, আমি একা। আমিও কেন ঐ অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে মিশিয়া, এই বিশাল আনন্দতরঙ্গ-তাড়িত জলবুদ্বুদসমূহের মধ্যে আর একটি বুদ্বুদ না হই? বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র; আমি বারিবিন্দু এ সমুদ্রে মিশাই না কেন?

যৌবনে যখন পৃথিবী সুন্দর ছিল তখন প্রতি পুষ্পে ছিল সৌরভ, পত্রমর্মরে মধুর শব্দ, প্রতি নক্ষত্রে চিত্রা, রোহিনীর শোভা, প্রতি মনুষ্যমুখে সরলতা। পৃথিবী আজও তাই আছে, সংসারও অপরিবর্তিত আছে। মনুষ্য চরিত্রও তাই আছে। কিন্তু হৃদয় আর তা নেই। তখন সঙ্গীত শুনে আনন্দ হতো। আবার পরিণত বয়সে সঙ্গীত শুনে অতীতের আনন্দ মনে পড়লো। যে অবস্থায়, যে সুখে সেই আনন্দ অনুভূত হতো, তা মনে পড়লো। মুহূর্তকালের জন্য তিনি যেন যৌবন ফিরে পেলেন।

> যৌবনে অর্জিত সুখ অল্প, সুখের আশা অপরিমিতা। এখন অর্জিত সুখ অধিক, কিন্তু সেই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী আশা কোথায়? তখন জানিতাম না, কিসে কি হয়, অনেক আশা করিতাম। এখন জানিয়াছি, এই সংসারচক্রে আরোহণ করিয়া, যেখানকার আবার সেইখানে ফিরিয়া আসিতে হইবে; যখন মনে ভাবিতেছি, এই অগ্রসর হইলাম, তখন কেবল আবর্তন করিতেছি মাত্র। এখন বুঝিয়াছি যে, সংসার-সমুদ্রে সন্তরণ আরম্ভ করিলে, তরঙ্গে তরঙ্গে আমাকে প্রহত করিয়া আবার আমাকে কূলে, ফেলিয়া যাইবে। এখন জানিয়াছি যে, এ অরণ্যে পথ নাই; এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই।

কমলাকান্ত জেনেছেন যে কুসুমে কীট আছে। কোমল পল্লবে কণ্টক আছে, আকাশে মেঘ আছে, নির্মলা নদীতে আবর্ত আছে, ফলে বিষ আছে, উদ্যানে সর্প

আছে ও মনুষ্য-হৃদয়ে আত্মাদর আছে।

এই প্রগাঢ় অন্ধকারে, দিশাহীন ভবার্ণবে কমলাকান্ত উপলব্ধি করেছেন যে সংসারে আত্মপর ভেদাভেদশূন্য হয়ে সর্বব্যাপিনী প্রীতি একমাত্র অবলম্বন। এই কথা তিনি পুনর্বার 'আমার মন' প্রবন্ধে বলেছেন, 'আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি, পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই'। 'একা' প্রবন্ধে কমলাকান্ত তাঁর জীবন-দর্শন ব্যাখ্যা করে বলেছেন :

প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসার-সঙ্গীত। অনন্ত কাল সেই মহাসঙ্গীত সহিত মনুষ্য-হৃদয়-তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।

'আমার মন' সন্দর্ভে কমলকান্ত বলেছেন যে, তিনি কিছুতে মন বাঁধেন নি, এজন্য কিছুতেই তাঁর মন নেই। এ সংসারে আমরা মন বাঁধা দিতে আসি। তিনি যেহেতু নিজের রয়ে গেলেন, পরের হলেন না, সেই হেতু পৃথিবীতে তাঁর সুখ নেই। যারা স্বভাবতঃ আত্মপ্রিয়, তারা বিবাহ করে, সংসারী হয়ে স্ত্রী-পুত্রের নিকটে আত্মসমর্পণ করে, এজন্য তারা সুখী। সুখের মূল হলো পরের জন্য আত্মবিসর্জন। তিনি বলেছেন :

আমি মরিয়া ছাই হইব। আমার নাম পর্যন্ত লুপ্ত হইবে, কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, এক দিন মনুষ্যমাত্রে আমার এই কথা বুঝিবে যে, মনুষ্যের স্থায়ী সুখের অন্য মূল নাই। এখন যেমন লোকে উন্মত্ত হইয়া ধন মান ভোগাদির প্রতি ধাবিত হয়, এক দিন মনুষ্যজাতি সেইরূপ উন্মত্ত হইয়া পরের সুখের প্রতি ধাবমান হইবে।

বর্তমান কালে বাহ্য সম্পদের পূজা আরম্ভ হয়েছে এবং আমরা জীবনের নিত্য মূল্যবোধের কথা বিস্মৃত হয়েছি, দেবমূর্তিসমূহ মন্দিরচ্যুত হয়েছে। কিন্তু তার ফলে আমরা মনের সুখ হারিয়েছি। হারান মনকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি পরের বোঝা ঘাড়ে নেবেন না বলে, সংসারী হন নি। এর ফলে সংসারে তাঁর মন নেই, তিনি সুখী নন। 'আমি পরের জন্য দায়ী হই নাই, সুখে আমার অধিকার কি'?

'বিড়াল' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন 'ধর্ম কি? পরোপকারই পরম ধর্ম'।

'একটি গীত' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন :

কিন্তু ইহা বুঝিতে পারি যে মনুষ্য মনুষ্যের জন্য হইয়াছিল—এক হৃদয় অন্য হৃদয়ের জন্য হইয়াছিল—সেই হৃদয়ে হৃদয়ে সংঘাত, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন, ইহা মনুষ্য-জীবনের সুখ। ইহজন্মে মনুষ্যহৃদয়ে একমাত্র তৃষা, অন্যহৃদয়কামনা। মনুষ্যহৃদয় অনবরত হৃদয়ান্তরে ডাকিতেছে 'এসো এসো বঁধু এসো'।

কমলাকান্তের মতে প্রাচীন বয়স বিষয় সেবার সময়। যৌবন অতীতে মানুষ বহুদর্শী, স্থিরবুদ্ধি, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও ভোগাসক্তির অনধীন হয়। সুতরাং তখন কার্য করিবার সময়। তিনি বলেছেন : তাঁর 'বুড়া বয়সের কথা' সন্দর্ভে :

যৌবনে যে কাজ করিয়াছ সে আপনার জন্য, তারপর যৌবন গেলে যত কাজ করিবে, পরের জন্য। ইহাই আমার পরামর্শ। ভাবিও না যে, আজিও আপনার কাজ করিয়া উঠিতে পারিলাম না—পরের কাজ করিব কি? আপনার কাজ ফুরায় না—যদি মনুষ্যজীবন লক্ষ বর্ষ পরিমিত হইত, তবু

আপনার কাজ ফুরাইত না—মনুষ্যের স্বার্থপরতার সীমা নাই—অন্ত নাই। তাই বলি, বার্দ্ধক্যে আপনার কাজ ফুর'ইয়াছে, বিবেচনা করিয়া পরহিতে রত হও। এই মুনিবৃত্তি যথার্থ মুনিবৃত্তি। এই মুনিবৃত্তি অবলম্বন কর।

কমলাকান্তের ন্যায় সংসার-আসক্তিশূন্য, গৃহহীন, আশ্রয়হীন, সর্ববংনমস্ত প্রাচীনের মুখ দিয়ে মনুষ্য-প্রীতির জয়গান উচ্চারণ করে, প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র আত্মপ্রকাশ করেছেন। 'ধর্মতত্ত্বে' গুরু বলেছেন, 'জীবন কি? লইয়া কি করিতে হয়'। এর উত্তর কমলাকান্তের মাধ্যমে তিনি ব্যক্ত করেছেন। 'কৃষ্ণ-চরিত্রে'ও এই তত্ত্ব পরিস্ফুট হয়েছে। কমলাকান্তের জীবন-দর্শন তত্ত্ব রূপে 'দপ্তরে' প্রকাশিত হয়েছে, আবার তা তাঁর উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। কপালকুণ্ডলার নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা, চন্দ্রশেখরের প্রতাপ ও রমানন্দ স্বামী, রজনীর অমরনাথ, দেবী চৌধুরাণীর ভবানী পাঠক ও প্রফুল্ল, রাজসিংহের চঞ্চলকুমারী, নির্মলকুমারী ও স্বয়ং রাণা রাজসিংহ প্রভৃতি চরিত্র-সমূহের কার্যকলাপে উক্ত পরহিতব্রতের পরিচয় আমরা লাভ করি। তাঁদের জীবন সমগ্র বা আংশিকভাবে যেন অপরের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গীকৃত।

কমলাকান্তের স্বদেশ-চিন্তা :—

কমলাকান্তের দপ্তরে মাতৃমন্ত্র সার্থক রূপে উদ্গীত হয়েছিল। মৃণালিনীতে স্বদেশভাবনার সূত্রপাত এবং আনন্দমঠে স্বদেশপ্রীতি—বন্দে মাতরম্ সংগীতে পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মনে বাঙালী জাতির পরাধীনতা নিয়ে যে গভীর বেদনাবোধ জেগে উঠেছিল, কমলাকান্তের মাধ্যমে তা কখনও ধিক্কারে, কখনও, বা সুগভীর হৃদয়ের আর্তিতে পরিস্ফুট হয়েছে। 'আমার দুর্গোৎসব' প্রবন্ধে কমলাকান্ত তাঁর এই অন্তরের বেদনাকে প্রকাশ করেছেন। প্রতিমা দর্শন করবার বেদনা প্রকাশ করে তিনি বলেছেন, "যাহা কখনও দেখিব না, তাহা কেন দেখিলাম! এ কুহক কে দেখাইল!" তরঙ্গসংকুল বাত্যাবিক্ষুব্ধ অন্ধকারে স্রোতোরাশির মধ্যে নক্ষত্রসমূহ উদিত হচ্ছে, আবার নির্বাপিত হচ্ছে। তিনি এক কালসমুদ্রে মাতৃসন্ধানে এসেছেন।—

> কোথা মা! কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি···সেই তরঙ্গসংকুল জলরাশির উপরে দূর-প্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর, শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এই কি মা? হাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকা-রূপিনী—অনন্তরত্ন ভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা।···এসো মা, গৃহে এসো—ছয় কোটি সন্তানে একত্রে, এক কালে, দ্বাদশ কোটি কর যোড় করিয়া, তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব।···উঠ মা, দেবী দেবানুগৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব, অধর্ম আলস্য,

ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব।
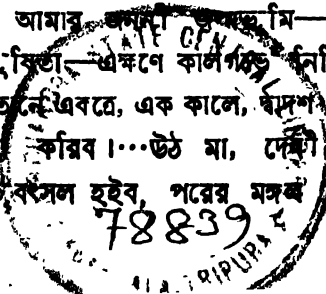
কমলাকান্ত অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিয়ে দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা ছয় কোটি মাথায় বহন করে অনবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন "ভয় কি? না হয় ডুবিব; মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?" দেশমাতৃকার শৃঙ্খল ও লাঞ্ছনা তাঁর মনকে বেদনায় বিদীর্ণ করেছিল। তাই তিনি শুধু মাতৃ সন্ধান নয়, কাল-সমুদ্র থেকে হিরণ্ময়ী বঙ্গভূমিকে উদ্ধার করে দেশবাসীর হৃদয় মন্দিরে স্থাপন করতে চেয়েছেন। কখনও তাঁর মনে নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে। তাই তিনি 'একটি গীত' প্রবন্ধে বলেছেন 'সুখের কথায় বাঙালির অধিকার নেই'। পরক্ষণে গভীর বেদনার সুরে মন্তব্য করেছেন যে, বঙ্গমাতাকে মনে পড়লে তাঁর শ্মশানভূমি নবদ্বীপের কথা মনে পড়ে। কলধৌতবাহিনী গঙ্গা আজও প্রবাহিত হয়ে চলেছে, কিন্তু তিনি যাঁর পদদ্বয় প্রক্ষালন করতেন, সেই রাজলক্ষ্মী আজ কোথায়। কোথায় সেই আনন্দরূপিনী, অনন্ত-সৌন্দর্যশালিনী ও সেই ধনেশ্বরী। কালপূর্ণ দেখে নবদ্বীপ থেকে বাংলার সেই লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হলেন।

> দিবসে নিশীথ উপস্থিত হইল, পণ্যবীথিকার দীপমালা নিভিয়া গেল, পূজাগৃহে বাজাইবার সময়ে শঙ্খ বাজিল না; পণ্ডিতে অশুদ্ধ মন্ত্র পড়িল; সিংহাসন হইতে শালগ্রাম শিলা গড়াইয়া পড়িল।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলো, সোপানাবলী অবতরণ করে রাজলক্ষ্মী জলে নামলেন। "যদি গঙ্গার অতল জলে না ডুবিলেন, তবে আমার সেই দেশলক্ষ্মী কোথা গেলেন?" কখনও কমলাকান্ত বঙ্গ দেশবাসীর পলিটিক্স্ প্রিয়তাকে ধিক্কার দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

> তোমাদিগের হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াদার শ্বশুরবাড়ী আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্স্ নাই। "জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো"! ইহাই তাহাদের পলিটিক্স্! তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিক্স্ যে গাছে ফলে তাহার বীজ এদেশের মাটীতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।

কমলাকান্ত দুরকমের পালিটিক্সের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন—এক কুক্কুর জাতীয়, আর এক বৃষজাতীয়। প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হলেন, বিসমার্ক এবং গর্শাকফ এবং দ্বিতীয় স্তরে আছেন উল্সি থেকে রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর পর্যন্ত। কমলাকান্তের ইঙ্গিত হলো যে বাঙালীরা কুক্কুর জাতীয় পলিটিক্সে পারদর্শিতা লাভ করেছে। আবেদন-নিবেদন ছাড়া বাঙালীর অন্য পলিটিক্স্ নেই।

পুনর্বার 'বাঙালির মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে তিনি তাদের পলিটিক্সের আবেদন-নিবেদনের ভিক্ষাবৃত্তিমূলক রাজনীতির কথা উল্লেখ করে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। ভৃঙ্গরাজ বলেছে যে, বাঙালীর ঘ্যানঘ্যানানি ছাড়া আর কিছু নেই।

> বাঙালী হইয়া কে ঘ্যানঘ্যানানি ছাড়া? কোন্ বাঙালীর ঘ্যানঘ্যানানি

ছাড়া অন্য ব্যবসা আছে ।

কেউ চাকরীর উমেদার রূপে ঘ্যান ঘ্যান করে, কেউ করে উকিল রূপে, কেউ বা দেশোদ্ধারের ছলনায়—শোক সভাতেও মৃত ব্যক্তিকে স্মরণ করে ঘ্যান ঘ্যান করা হয় । কমলাকান্ত স্বয়ং আফিমের জন্য বঙ্গদর্শনের সম্পাদকের নিকটে ঘ্যান ঘ্যান করে । তাই বাঙালীর ঘ্যানঘ্যানানী ভ্রমরের নিকটেও পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে ।

মাতৃপূজার মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে—বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ, জাগ্রত করেছেন । কমলাকান্ত এই জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তুলেছেন । সুতরাং বাঙালী রাষ্ট্রীয় সাধনার ইতিহাস কমলাকান্ত থেকে শুরু হয়েছে । বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য রচনা থেকেও স্বদেশভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় । সেযুগে দেশহিতৈষিগণের দেশসেবার অন্তঃসারশূন্যতাকে নিয়ে কমলাকান্ত ব্যঙ্গ করেছেন । তিনি লিখেছেন—

> তাঁহাদের আমি শিমূল ফুল ভাবি । যখন ফুল ফুটে, তখন দেখিতে শুনিতে বড় শোভা—বড় বড় রাঙ্গা রাঙ্গা গাছ আলো করিয়া থাকে ।···ফুলে গন্ধ মাত্র নাই—কোমলতা মাত্র নাই, কিন্তু তবু ফুল বড় রাঙ্গা রাঙ্গা,···কালক্রমে চৈত্রমাস আসিলে রৌদ্রের তাপে অন্তর্লঘু ফল ফট করিয়া ফাটিয়া উঠে ; তাহার ভিতর হইতে খানিক তুলা বাহির হইয়া বঙ্গদেশময় ছড়াইয়া পড়ে ।

স্বদেশভাবনার আর একটি দিক 'আমার মন' প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে । ইংরাজী সভ্যতা ও শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 'মেটিরিয়েল প্রস্‌পেরিটি'র উপরে অনুরাগ জন্মে আমাদের দেশকে উৎসন্ন দিতে আরম্ভ করেছে । ইংরেজী সভ্যতার প্রধান চিহ্ন হল বাহ্য সম্পদ । আমরাও এই আকর্ষণে আজ আত্মবিস্মৃত । "ভারতবর্ষের অন্যান্য দেবমূর্ত্তি-সকল মন্দিরচ্যুত হইয়াছে সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত কেবল বাহ্য সম্পদের পূজা আরম্ভ হইয়াছে ।" কমলাকান্ত প্রশ্ন তুলেছেন যে, বাহ্য সম্পদের পূজায় মনের সুখ কতটুকু বাড়ে ?

> ঐ যে কৃপণ ধনতৃষায় মরিতেছে উহার তৃষা নিবারণ করিবে ? অপমানিতের অপমান ফিরাইতে পারিবে ? রূপোন্মত্তের ক্রোড়ে রূপসীকে তুলিয়া বসাইতে পারিবে ? না পার, তবে তোমার রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি উপাড়িয়া জলে ফেলিয়া দাও—কমলাকান্ত শর্ম্মা তাতে ক্ষতি বিবেচনা করিবেন না ।

বাহ্য সম্পদ যদি মানুষকে শিষ্ট, ধার্মিক ও পবিত্র করতে না পারে তবে তার কোন সার্থকতা নেই ।

সুতরাং দেখা যায় যে, কমলাকান্ত স্বদেশপ্রীতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে শুধু স্বদেশের কল্যাণ চিন্তা করেছেন । বাঙালীর স্বদেশ সাধনার ত্রুটি ও মানসিক অসম্পূর্ণতাকে তিনি যেমন ব্যঙ্গ করেছেন, অন্যদিকে আবার, পরাধীনতার বেদনা তাঁর মনকে বেদনাতুর করে তুলেছে । এই স্বদেশপ্রীতি কমলাকান্তের মনে যেন এক নূতন গীতি রচনা করেছে । সকল কিছু বিস্মৃত হয়ে তিনি বঙ্গদেশ ও তার

কল্যাণের কথা চিন্তা করেছেন। দেশের পরাধীনতা তাঁর মনকে স্বদেশের হিত-চিন্তায় প্রবুদ্ধ করেছে। সেখানে আমরা আমাদের চিরপরিচিত পরিহাসপ্রবণ কমলাকান্তের পরিচয় পাইনে, দেখি এক নূতন সাধকের মূর্তি। এই তাপস মূর্তি আমাদের মুগ্ধ ও প্রসন্ন করে।

কমলাকান্ত "দেশ ও কালের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া অনাগত ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করিয়া এবং বহিঃপ্রকৃতির প্রচন্ড সংঘাত আশংকা করিয়া বাঙালীকে স্বদেশের স্বল্প পরিসর মৃত্তিকায় সচেতন ও আত্মস্থ হইয়া দাঁড়াইবার ইঙ্গিত দিয়াছেন।"

কমলাকান্তের বাংলা সাহিত্য বিষয়ক চিন্তা :—

বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তের দপ্তরে' বাংলা সাহিত্যের অকিঞ্চিৎকরত্ব সম্পর্কে যে তীক্ষ্ম ব্যঙ্গ করেছেন তার মূল্য ও যাথার্থ্য আজও পর্যন্ত সত্য হয়ে আছে। যে কথা 'ইউটিলিটি বা উদর দর্শন' প্রবন্ধে বলা হয়েছে তার সত্যতা আজও অস্বীকার করা যায় না। কমলাকান্ত বলেছেন যদিও বিদ্যা অর্জনের জন্য লেখা-পড়া শেখা প্রয়োজন, কিন্তু—

> বিদ্যার জন্য বিশেষ লিখিতে বা পড়িতে শিখার প্রয়োজন নাই, গ্রন্থ লিখিতে, সম্বাদ পত্রাদিতে লিখিতে জানিলেই হইল। কেহ কেহ তাহাতে আপত্তি করেন যে, যে লিখিতে জানে না, সে পত্রাদিতে লিখিবে কি প্রকারে ? আমার বিবেচনায় এরূপ তর্ক নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কুম্ভীরশাবক ডিম্ব ভেদ করিবামাত্র জলে গিয়া সাঁতার দিয়া থাকে, শিখিতে হয় না। সেইরূপ বিদ্যা বাঙালীর স্বতঃসিদ্ধ, তজ্জন্য লেখাপড়া শিখিবার প্রয়োজন নাই।

কমলাকান্ত এখানে যশোপ্রার্থী স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন লেখকদের বিদ্রূপ করেছেন। তাঁদের আকাঙ্ক্ষা উচ্চ কিন্তু তজ্জন্য সাধনার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় না।

কমলাকান্ত 'বড় বাজার' নামক প্রবন্ধে সাহিত্য বাজারের সংবাদ দিয়েছেন। সেখানে বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণ অমৃত ফল বিক্রয় করছেন। এটি সংস্কৃত সাহিত্য। কমলাকান্ত আরও দেখলেন যে, কতকগুলি মনুষ্য নিচু, পীচ, পেয়ারা, আনারস, আঙ্গুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফল বিক্রয় করছেন। এ হলো পাশ্চাত্য সাহিত্য। আর একটি দোকানে দেখা গেল যে, অসংখ্য শিশু এবং অবলাগণ ক্রয়-বিক্রয় করছেন, সেখানে ভীড়ের জন্য প্রবেশ করা গেল না। জানা গেল দোকানটি বাংলা সাহিত্যের। জিজ্ঞাসা করলে বালকেরা উত্তর দিল যে তারাই বিক্রয় করে।

দুই একজন বড় মহাজনও আছেন। তন্নিভন্ন বাজে দোকানদারের পরিচয় পদ্যাবলী নামক গ্রন্থে পাইবেন।

"কিনিতেছে কে ?"

"আমরাই।"

বিক্রেয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল। দেখিলাম—খবরের কাগজ জড়ান কতকগুলি অপক্ক কদলী।

এই অপক্ক কদলীরূপ বাংলা সাহিত্যের দোকানে শিশু ও অবলাগণের ভীড়। 'লোকরহস্যের' এড়ুকেটেড স্বামীর ভাষায় 'polished society'তে এগুলির ক্রয়-বিক্রয় চলে না।

কমলাকান্ত তাঁর কমলাশ্রমের চারপাই এর উপরে বসে আফিম সেবন করবার পরে জ্ঞানপত্রে প্রত্যক্ষ করলেন যে, এই সংসার কেবল ঢেঁকিশাল। এখানে ঢেঁকিরূপ জমিদার, আইনকারক, বিচারক, বাবু, যথাক্রমে প্রজা, মিনিট রিপোর্ট আইন প্রভৃতি পিষে শোষন অথবা দারিদ্র্য, কারাবাস প্রভৃতির আয়োজন করে চলেছেন। কমলাকান্ত মন্তব্য করেছেন—

বাবু ঢেঁকি, বোতল গড়ে পিতৃধন পিষিয়া বাহির করিতেছেন পিলে যকৃৎ। তাঁর গৃহিণী ঢেঁকি একাদশীর গড়ে বাজার খরচ পিষিয়া বাহির করিতেছেন—অনাহার। সর্বাপেক্ষা ভয়ানক দেখিলাম—লেখক ঢেঁকি, সাক্ষাৎ মা সরস্বতীর মুণ্ড ছাপার গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন স্কুলবুক।

'কি লিখিব' নামক প্রবন্ধে কমলাকান্ত সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে কৌতুক-পূর্ণ আলোচনা করেছেন। তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদক মহাশয়কে প্রশ্ন করেছেন যে, তিনি ফরমায়েস মত সকল রকমের রচনা দিতে পারেন,—নাটক, নবেল বা পলিটিকস্। প্রয়োজন হলে ঐতিহাসিক গবেষণায়, সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় বিজ্ঞান শাস্ত্র বা ভৌগোলিক তত্ত্বের পরিচয় দিতে পারেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন যে, তাঁর রচনার মূল্য সম্পাদক মহাশয় গজ দরে দেবেন না—মন দরে দেবেন।

> আর যদি গুরু বিষয়েই আপনার অভিরুচি হয়—তবে বলিবেন, তাহার কি প্রকার অলংকার-সমাবেশ করিব। আপনি কোটেশান ভালবাসেন, না ফুটনোটে আপনার অনুরাগ। যদি কোটেশ্যান বা ফুটনোটের প্রয়োজন হয় তবে কোন্ ভাষা হইতে তাহাও লিখিবেন দিব। ইউরোপ ও আশিয়া সকল ভাষা হইতেই আমার কোটেশ্যান সংগ্রহ করা হইয়াছে—আফ্রিকা ও আমেরিকার কতকগুলি ভাষার সন্ধান পাই নাই। কিন্তু সেই সকল ভাষায় কোটেশ্যান, আমি অচিরাৎ প্রস্তুত করিব, আপনি চিন্তিত হইবেন না।

কমলাকান্ত এখানে বাঙালী লেখকদের পাণ্ডিত্য প্রকাশের নিরর্থক আড়ম্বরের প্রতি তীক্ষ্ন কটাক্ষ করেছেন। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের প্রবন্ধ সাহিত্যের বিষয়-বস্তু, তর্ক ও সিদ্ধান্ত দুর্বল হলেও কোটেশ্যান ও ফুটনোটের সহায়তায় তাকে স্ফীত করা হয়। লঙ্গিনুস একে রচনার দুর্বলতা রূপে বিচার করেছেন। কমলাকান্তের ব্যঙ্গ এখানে অত্যন্ত উপযোগী ও উপভোগ্য হয়েছে। তিনি 'ভীষ্ম-দেব খোশনবীস'-এর এম, এ, পাশ পুত্রের কৃতিত্বের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বর্ণ-

পরিচয় থেকে রোম দেশের ইতিহাস রচনা পর্যন্ত ব্যাপক পাণ্ডিত্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর ঐতিহাসিক কীর্তি বহু বিশ্রুত। তিনি—

চিতোরের রাজা আলফ্রেড দি গ্রেটের একখানি জীবন চরিত দশ পনের পৃষ্ঠা লিখিয়া রাখিয়াছেন. এবং বাঙ্গলা সাহিত্য-সমালোচন-বিষয়ক একখানি গ্রন্থ মহাভারত হইতে সংকলিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে কোমত ও হরবর্ট স্পেনসরের মত খণ্ডন আছে; এবং ডারউইন যে বলেন, মাধ্যাকর্ষণের বলে পৃথিবী স্থির হইয়া আছে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে মালতীমাধব হইতে চারি পাঁচটা শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সুতরাং একখানি মোটের উপর ভারি রকমের গুরু বিষয়ক গ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে। ভরসা করি সমালোচনা কালে আপনারা বলিবেন, বাংলা ভাষায় ইহা অদ্বিতীয়।

কমলাকান্ত, খোশনবীস মহাশয়ের পুত্রের পাণ্ডিত্য নিয়ে বিদ্রূপ করেছেন। এই বিদ্রূপ তথাকথিত শিক্ষিতগণের প্রাপ্য। ইতিহাস বিজ্ঞান সংস্কৃত কাব্য প্রভৃতি বিষয়ে যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা সত্যই ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের ঈর্ষার বিষয় হতে পারে। আমাদের দেশে নাটকের বিষয় হলো রোমাঞ্চকর। নাটক রচনার জন্য যে সমাজজ্ঞতা নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গী ও সহানুভূতি থাকা দরকার তা আমাদের নেই। সুতরাং খোশনবীস পুত্র নাটকের যে সরঞ্জাম প্রস্তুত করেছেন তাতে নায়িকা, তাঁর পিতা ও নায়কের নাম পূর্বে স্থির করে নায়িকা কর্তৃক নায়কের বুকে ছুরি মেরে অগ্নিতে আত্মহনন করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নাটকে কুড়িটি রচিত ছত্রের মধ্যে আটটা 'হা সখি'! এবং তেরটা 'কি হল, কি হল' সমাবেশ করা হয়েছে। নায়িকা ছুরিকাহস্তে গান করছেন। নাটকের অন্যান্য অংশ বসিয়ে দেওয়ার অপেক্ষা মাত্র। কমলাকান্ত লিখেছেন—

আমরা উত্তম নবেল লিখিতে পারি, তবে কিনা ইচ্ছা ছিল যে, বাজে নবেল না লিখিয়া ডন কুইকসোট বা জিলব্লার পরিশিষ্ট লিখিব। দুর্ভাগ্যবশতঃ দুইখানি পুস্তকের একখানিও এ পর্যন্ত আমাদের পড়া হয় নাই। সম্প্রতি মেকলের এসের পরিশিষ্ট লিখিয়া দিলে আপনার কার্য্য হইতে পারে কি? সেও নবেল বটে।

যদি মিত্রাক্ষর বা অমিত্রাক্ষরে কাব্য লিখতে হয়, তবে, সম্পাদক মহাশয় যেন জানান।' মিত্রাক্ষর পয়ার মিলের জন্য লেখা কঠিন, তবে অমিত্রাক্ষর লিখতে কোন অসুবিধা নেই। খোশনবীস মেঘনাদবধের তুল্য জীমূতনাদ বধের তুল্য কাব্যের প্রথম খণ্ড লিখেছেন। দু-চারটে নামের প্রভেদ ছাড়া শেষোক্ত কাব্যের সংগে প্রথমটির বিশেষ অমিল নেই। বোঝা যায় যে জীমূতনাদ বধ কাব্যটি মেঘনাদবধের সমতুল্য, কেন না উভয় কাব্যের মধ্যে পার্থক্য যৎসামান্য। অনুকরণমূলক সাহিত্য রচনার প্রয়াসকে এখানে কষাঘাত করা হয়েছে।

'বাঙালীর মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে কমলাকান্তকে ভৃঙ্গরাজ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে,

বাঙালীরা সর্বত্র ঘ্যানঘ্যান করে। তারা কাগজ-কলম লইয়া, হপ্তায় হপ্তায়, মাসে মাসে, দিন দিন ঘ্যানঘ্যান করে। বাস্তবিক বাঙালীর ঘ্যানঘ্যানানি সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করে রসনা কণ্ডুয়ন রোগ সৃষ্টি করেছে। তাদের মৌলিক প্রতিভা নেই, আছে অক্ষম অনুকরণের প্রয়াস, এবং ভাবালুতার পরিচয়।

কমলাকান্তের সমাজ-চিন্তা :—

কমলাকান্তের মধ্যে সমাজচেতনা বিশেষরূপে পরিদৃষ্ট হয়। কখনও তিনি নিপুণভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, কখনও সমালোচনার ছলে তীক্ষ্ম কটাক্ষ ও মন্তব্য করেছেন, কখনও বা আদর্শের ইঙ্গিত দিয়েছেন, আবার কখনও সমাজের বিন্যাসকে বুদ্ধিদীপ্ত মন নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। মনুষ্যফল নামক প্রবন্ধে তিনি সমাজের বড়লোকদের এবং স্ত্রীজাতির কথা বর্ণনা করেছেন। আফিমের মাত্রা বেশী হলে তাঁর মনে হয় যে মনুষ্য সকল ফল বিশেষ—মায়াবৃন্তে সংসার বৃক্ষে ঝুলে আছে। সব ফল পাকতে পারে না—কতক অকালে ঝরে পড়ে যায়। দেশের বড় মানুষ-গণ তাঁর দৃষ্টিতে কাঁঠাল সদৃশ। কাঁঠাল যদি পাকে তবে শৃগালের দৌরাত্ম্য শুরু হয়। এরা কেউ দেওয়ান, কেউ কারকুন, কেউ নায়েব, কেউ গোমস্তা, কেউ মোসাহেব, আবার কেউ আশীর্বাদক। পাকা কাঁঠাল যদি ঘরে যায় তবে মাছি ভন্ ভন্ করতে থাকে ; কোন মাছি কন্যাদায়গ্রস্ত, কারও মাতৃদায় কেউ পুস্তক লিখেছে কেউ পেটের দায়ে সংবাদপত্র বের করেছে। কোনও মাছি অতি দূর আত্মীয়, আবার কোনটি জরাজীর্ণ টোলের অধ্যাপক। এরা সকলেই রসের প্রত্যাশী। কমলাকান্ত সিভিল সার্ভিসের সাহেবদের আম্র ফল মনে করেন। তাঁর মতে গাছ থেকে পেড়ে এই ফল খেতে নেই, একে সেলাম-জলে ঠাণ্ডা করে খোসা-মোদ বরফে আরও শীতল করে ছুরি চালিয়ে খেতে হয়। তিনি স্ত্রীলোকদের নারিকেলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ডাব ও ঝুনোর মধ্যে পার্থক্য করে তিনি বলেছেন যে, ডাবের জল বড় স্নিগ্ধ। স্ত্রীলোকের স্নেহের সঙ্গে এর মিল আছে। "মাতার আদর, স্ত্রীর প্রেম, কন্যার ভক্তি, ইহার অপেক্ষা জীবনের সন্তাপে আর কি সুখের আছে ? গ্রীষ্মের তাপে ডাবের জলের মত আর কি আছে ?" তবে ঝুনো হলে জল ঝাল হয়ে যায়। রামার বাপ গৃহিণীর ঝালের চোটে বাড়ী ছেড়েছিল। কমলাকান্ত নারকেলের শস্যকে স্ত্রীলোকের বুদ্ধির সঙ্গে তুলনা করেছেন। ডাবের অবস্থায় এটি মিষ্ট ও কোমল কিন্তু ঝুনোর বেলায় বড় কঠিন, দন্তস্ফুট করা চলে না। এর নাম গৃহিণীপনা। তাঁর কাছে বিশেষ প্রত্যাশা করবার সুযোগ নেই। স্বামী প্রাচীন বয়সে ব্যবসা করবেন বলে টাকা নিয়েছিলেন। কিন্তু যতদিন না ফিরিয়ে দিতে পেরেছেন, ততদিন অজীর্ণ রোগে তাঁর রাত্রে নিদ্রা হয়নি। নারকেলের মালা হল স্ত্রীলোকের বিদ্যা। কমলাকান্ত মন্তব্য করেছেন "কখনও আধখানা বই পুরো দেখিতে পাইলাম না।" এখানে রঙ্গের পরিচয় থাকলেও গুপ্ত-কবির প্রভাব অজ্ঞাতসারে এসেছে। এখানে ব্যঙ্গ পরিমিতিবোধকে অতিক্রম করেছে। ছোবড়া হল

স্ত্রীলোকের রূপ। উভয়ই বাহ্যিক অংশ এবং অসার। তবে স্ত্রীলোকর রূপের কাছিতে ভারি ভারি মনোরথ টানে। আমাদের দেশের লেখকগণকে তেঁতুলের সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে। এঁদের গুণের মধ্যে আছে শুধু অম্লগুণ, তাও নিকৃষ্ট অম্ল। দেশী হাকিমেরা হল কুষ্মাণ্ড। চালে তুলে দিলে এঁরা উঁচুতে ফলেন, তা না হলে মাটিতে গড়াগড়ি যান। মনে হতে পারে যে কমলাকান্ত কিশোরীদের বাদ দিয়ে নারী জাতির সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু 'স্ত্রীলোকের রূপ' প্রবন্ধে তিনি তাঁদের প্রশংসা করেছেন। রূপ তাঁদের সম্পদ নয়, বরং রূপ অপেক্ষা মহৎ গুণ তাঁদের মধ্যে আছে। তাঁরা মূর্তিমতী সহিষ্ণুতা, ভক্তি ও প্রীতি। কমলাকান্ত বলেছেন, "হে বঙ্গ পৌরাঙ্গনাগণ—তোমরা এ বঙ্গদেশের সাররত্ন! তোমাদের মিছা রূপের বড়াই"-এ কাজ কি? যে ভাবে তাঁরা পতি পুত্রের জন্য, ধর্মের জন্য জীবন ও সুখ বিসর্জন দেন, তাতে বোঝা যায় যে, তাঁদের হৃদয়ে প্রীতি ও ভক্তি বিরাজ করে।

'আমার মন' প্রবন্ধে কমলাকান্ত তাঁর সমাজচিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, বাহ্য সম্পদে মানুষের সুখ নেই। "পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই।" নরনারীর বিবাহ প্রসঙ্গে তাঁর মনে সামাজিক হিত সাধনের আদর্শ প্রকাশিত হয়েছে। বিবাহ কদাপি আত্মসুখের জন্য নয়—। কমলাকান্ত বলেছেন :

> যদি পারিবারিক স্নেহের গুণে তোমাদের আত্মপ্রিয়তা লুপ্ত না হইয়া থাকে, যদি বিবাহনিবন্ধন তোমাদের চিত্ত মার্জিত না হইয়া থাকে, যদি আত্মপরিবারকে ভালবাসিয়া, তাবং মনুষ্যজাতিকে ভালবাসিতে না শিখিয়া থাক, তবে মিথ্যা বিবাহ করিয়াছ; কেবল ভূতের বোঝা বহিতেছ। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বা পুত্রমুখ নিরীক্ষণের জন্য বিবাহ নহে। যদি বিবাহবন্ধে মনুষ্য-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয়াদি অভ্যাসের বশ; অভ্যাসে এ সকল একেবারে শান্ত থাকিতে পারে। বরং মনুষ্য জাতি ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া পৃথিবী হইতে লুপ্ত হউক, তথাপি যে বিবাহে প্রীতি শিক্ষা না হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই।

আধুনিক সমাজে মানুষ ভোগবাসনায় উন্মত্ত। ভোগের অগ্নিতে দগ্ধ হওয়ার জন্য তারা উন্মত্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কমলাকান্তের বিচারে ভোগাকাঙ্ক্ষার প্রাধান্য হেতু পতঙ্গ বড় বা ছোট হয়ে থাকে। তাই জমিদার নশীরামবাবুকে তাঁর মনে হল, একটা বৃহৎ পতঙ্গ বালিশ ঠেসান দিয়া, তামাকু টানিতেছে। এই সংসারে জ্ঞান, ধন, মান, ধর্ম, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি নানাবিধ বহ্নিতে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য একদল মানুষ পতঙ্গের ন্যায় আচরণ করে। নিত্য সহস্র পতঙ্গ অগ্নিদগ্ধ হয়ে পুড়ে মরছে। এই বহ্নির দাহ যাতে বর্ণিত হয় তার নাম কাব্য। ঈশ্বর কি, ধর্ম কি, জ্ঞান কি, স্নেহ কি তা জানা যায় না, তথাপি পতঙ্গের ন্যায় সেই অলৌকিক অপরিজ্ঞাত পদার্থকে

আমরা "বেড়িয়া বেড়িয়া ফিরি। আমরা পতঙ্গ না ত কি ?"

সমাজচিন্তার দৃষ্টান্তরূপে বিড়াল প্রবন্ধটি অসাধারণ। বর্তমান কালে সমাজ-তন্ত্রবাদের আদর্শে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ ব্যবধান প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু উনবিংশ শতকে কমলাকান্ত ও বিড়াল ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। মার্জারীর মতে ধনীর দোষেই দরিদ্র চোর হয়। বিত্তশালী ব্যক্তিগণের প্রয়োজনাতীত ধন থাকতেও তাঁরা দরিদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। তারাই সমাজের চৌর্য-বৃত্তি সৃষ্টি করে থাকেন। মার্জারীর মতে, "চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শতগুণে দোষী"। তাদের দণ্ডবিধান কর্তব্য। খেতে না পেলে দরিদ্র চুরি করতে বাধ্য হয়, কেননা অনাহারে মৃত্যু বরণ করাবার জন্য এই পৃথিবীতে কেউ আসে নি। ধনতন্ত্রবাদের সমর্থক কমলাকান্তের মতে সমাজ বিশৃঙ্খলার মূল হল সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ। তিনি এই আদর্শ মানতে রাজী নন। তাঁর মতে যাঁর যত ক্ষমতা তিনি তত সঞ্চয় যদি না করতে পারেন, তবে সমাজের ধন বৃদ্ধি হবে না। কিন্তু মার্জারার মতে এই সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ হল ধনীর ধনবৃদ্ধি। এতে দরিদ্র সমাজের কোন লাভ হয় না। সামাজিক ধনবৃদ্ধি যে সমাজের উন্নতির কারণ, এ কথা মার্জারী স্বীকার করে না। তার বক্তব্য হল 'আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব'। উপবাসে থাকলে মানুষ চুরি করতে বাধ্য হয়। কমলাকান্ত তিনদিন উপবাস করতে বাধ্য হলে চৌর্য কার্যে রত অবস্থায় নসীরামবাবুর ভাণ্ডার ঘরে ধরা পড়বেন। ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিগণ ধন বৃদ্ধির অর্থে সমাজের উন্নতিকে বোঝেন, এবং তাঁরা চান নির্বিবাদে তা ভোগ করতে। এই জাতীয় ব্যবস্থায় সুস্থ ও স্বাভাবিক সমাজ জীবন গড়ে উঠতে পারে না। যে কথা আমরা বিড়ালের মুখে শুনি তারই বিশদ পরিচয় আমরা 'বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধে' পাই। সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র সাম্যবাদতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন।

কমলাকান্তের মনোলোকের গভীর আকুতি :—

শিল্প সাধনার ক্ষেত্রে দেশ ও কাল নিরপেক্ষ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার যুগে একক ছিলেন। তাঁর দেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধকে ছাপিয়ে তাঁর নিঃসঙ্গ মনের বেদনা প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মাধ্যমে আমরা কমলাকান্তের মনের গভীর আকুতি শুনে বিষণ্ণ বোধ করি। মনে হয় যে, এই বিরাট সংসারে তিনি সত্যই একা ; তাঁর একাকিত্বের অংশ গ্রহণ করবার জন্য কেউ নেই। 'বুড়া বয়সের কথায়' তিনি উপসংহারে লিখেছেন—

> আজিকার বর্ষার দুর্দিনে—আজিও কালরাত্রির শেষ কুলগ্নে—এ নক্ষত্রহীন অমাবস্যার নিশির মেঘাগমে, আমায় আর কে রাখিবে ? এ ভবনদীর তপ্ত সৈকত পথবাহিনী বৈতরণীর আবর্ত্তভীষণ উপকূলে—এ দুস্তর পারাবারের

প্রথম তরঙ্গমালার প্রঘাতে, আর আমায় কে রক্ষা করিবে? অতি বেগে প্রবল বাতাস বহিতেছে—অন্ধকার, প্রভো! চারি দিকেই অন্ধকার! আমার এ ক্ষুদ্র ভেলা দুষ্কৃতের ভারে বড় ভারি হইয়াছে। আমায় কে রক্ষা করিবে?

সংসার জীবন কমলাকান্ত একা শুরু করেছিলেন, একাই তিনি শেষ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনেও সার্থক শিল্পীর এই নিঃসঙ্গ জীবন বাংলা সাহিত্যের এক পরম বিস্ময়। বঙ্কিমচন্দ্র ও কমলাকান্ত এখানে অভেদাত্মা, কমলাকান্তের দপ্তরের প্রথম প্রবন্ধ হল 'একা'। এখানেও কমলাকান্তের জীবনের সুগভীর আকূতি এক অখণ্ড সংগীতের ন্যায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি নিরানন্দ, তাই ঐ সংগীতে তাঁর হৃদয়তন্ত্র অনুরণিত হয়েছে। কমলাকান্ত লিখেছেন—

আমি একা—তাই এই সংগীতে আমার শরীর কণ্টকিত হইল। এই বহু জনাকীর্ণ নগরীর মধ্যে এই আনন্দময়, অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে আমি একা।

তিনি আরও লিখেছেন—

কেবল ইহাই জানি যে আমি একা। কেহ একা থাকিও না। যদি অন্য কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল তবে তোমার মনুষ্যজন্ম বৃথা।

কমলাকান্ত অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে আপনার সত্তাকে মিশিয়ে দিতে চেয়েছেন। আনন্দ-তরঙ্গ-তাড়িত জলবুদ্‌বুদ্‌সমূহের মধ্যে তিনি একটি বুদ্‌বুদ্‌ হতে চান। বিন্দু বিন্দু বারি নিয়ে সমুদ্র। তিনি তাঁর ক্ষুদ্র বারিবিন্দুকে সমুদ্রে মেশাতে চান, তাঁর মতে পুষ্প কদাপি আপনার জন্য ফুটে না। "পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও। তাঁর এই আকুতি হৃদয়ের গভীর অন্তঃস্থল থেকে বেজে উঠেছে। তিনি বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, যে মনুষ্যকণ্ঠের সংগীত প্রীতিপ্রদ। কিন্তু তিনি সংসারের অপর এক সংগীত শুনতে চান। তিনি উপলব্ধি করেছেন "প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতি আমার কর্ণে, এক্ষণকার সংসার-সঙ্গীত অনন্তকাল সেই মহাসংগীত-সহিত মনুষ-হৃদয়-তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্য জাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য-সুখ চাই না"।

'আমার মন' প্রবন্ধে তিনি পুনর্বার হারান মনের প্রসঙ্গে একাকীত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মন চুরি গিয়েছে, এবং কোথাও সেই হারান মন তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। "কিছুতে আমার মন নাই—আমার মন কোথা গেল?" তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, লঘুচেতাদের মনের বন্ধন প্রয়োজন। সংসারে আমরা মন বাঁধা দিতে আসি। তিনি দুঃখ করে বলেছেন—"আমি চিরকাল আপনার রহিলাম—পরের হইলাম না, এই জন্যই পৃথিবীতে—আমার সুখ নাই।" তিনি অনেক অনুসন্ধানের পরে উপলব্ধি করেছেন যে, পরের জন্য আত্মবিসর্জন ব্যতীত স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নেই। তাঁর বিশ্বাস মানুষ যেমন এখন উন্মত্ত হয়ে

ধন মান ভোগাদির প্রতি ধাবিত হয়, একদিন মনুষ্যজাতি সেইরূপ উন্মত্ত হয়ে পরের সুখের প্রতি ধারমান হবে। কমলাকান্ত আদর্শবাদী। তাই তাঁর বক্তব্য হলো "আমি মরিয়া ছাই হইব, কিন্তু আমার এ আশা একদিন ফলিবে। ফলিবে, কিন্তু কতদিনে।" বর্তমানকালে মানুষ ইংরেজী সভ্যতা ও ইংরেজী শিক্ষার সংগে বাহ্য সম্পদের পূজারী হয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা মানসিক সুখ ও শান্তি লাভ করা যাবে না। তিনি আত্মসমীক্ষার সুরে মন্তব্য করেছেন, "আমি পরের জন্য দায়ী হই নাই, সুখে আমার অধিকার কি ?"

'বসন্তের কোকিল' নামক প্রবন্ধে কমলাকান্তের নিভৃত হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা গভীর সুরে ব্যক্ত হয়েছে। কোকিলকে কেন্দ্র করে তিনি তাঁর অন্তরের বেদনাকে প্রকাশ করেছেন।

> এখন আয় পাখী! তোতে আমাতে একবার পঞ্চম গাই। তুইও যে, আমিও সে—সমান দুঃখের দুঃখী, সমান সুখে সুখী—তুই এই পুষ্প-কাননে, বৃক্ষে বৃক্ষে আপনার আনন্দে গাইয়া বেড়াস—আমিও এই সংসার-কাননে, গৃহে গৃহে, আপনার আনন্দে এই দপ্তর লিখিয়া বেড়াই—আয়, ভাই, তোতে আমাতে মিলে মিশে পঞ্চম গাই।

তাঁরা উভয়ে এই অনন্ত সুন্দর জগতের যিনি আত্মা তাঁকে ডাকেন। যদি তিনি কোকিলের ন্যায় ভুবন ভুলানো কণ্ঠস্বর পেতেন তবে তিনি মনের কথা ব্যক্ত করতে পারতেন। ঐ নীলাম্বর মধ্যে প্রবেশ করে ঐ নক্ষত্রমণ্ডলী মধ্যে উড়ে তিনি কুহু রবে ডাকতে চান। এই গীতধ্বনির মধ্যে তিনি তাঁর মনের কথা সকলকে জানাতে চান।

কবি শেলী তাঁর বিখ্যাত To A Skylark কবিতায় বলেছেন যে, পাখী অনন্ত সত্যের পরিচয় পেয়েছে বলে তার সংগীত স্বতস্ফূর্ত ধারায় প্রবাহিত। তিনি তাঁর কাছে পেতে চান তার চিরন্তন আনন্দের বার্তা।

> Such harmonious madness
> From my lips would flow
> The world should listen then, as I am listening now !

যৌবনকালে তিনি একা ছিলেন বটে; কিন্তু সেই একাকীত্ব ছিল এক সহস্রের মত। কিন্তু বার্ধ্যক্যে তিনি নিঃসঙ্গ। তিনি অন্তরে অন্তরে সন্ন্যাসী, তবে তাঁর এত বন্ধন কেন! "এ দেহ পচিয়া উঠিল—ছাই ভষ্ম মনের বাঁধনগুলো পচে না কেন ? ঘর পুড়িয়া গেল—আগুন নিভে না কেন ?'

কমলাকান্তের দপ্তরে হাস্যরসের প্রকৃতি :—

সাহিত্যে হাস্যরসের প্রকৃতি নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। বিশেষতঃ wit ও humour নিয়ে—নানা আলোচনা হয়েছে। উইট হল বুদ্ধির খেলা। এর

মধ্যে মনের দীপ্তি ঝলসে ওঠে। অসঙ্গতির দিকসমূহ প্রকাশ করা তার কাজ। বুদ্ধির এই বপ্রক্রীড়া আমাদের মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করে। এর সংগে হৃদয়ের গভীর আবেগের বা অনুভূতির কোন সংযোগ নেই। এ নিছক বাগ্-বৈদগ্ধ্য। আর humour হল গভীর সহানুভূতি হেতু স্নিগ্ধ মানসিক রূপের প্রকাশ; এর মধ্যে থাকে স্নেহ-মিশ্রিত কোমল অনুভূতি। 'ইহার সমালোচনা হৃদয়ের গোপন অশ্রুপ্রবাহের শীকড় সিক্ত হইয়া সমস্ত উগ্র ঝাঁজ হারাইয়া ফেলে ও এক প্রকার স্নেহমণ্ডিত অনুযোগে রূপান্তরিত হয়।" Humour-এর আবেদন গভীর। যিনি এই হাস্যরসের স্রষ্টা তিনি একাধারে জীবনরসের রসিক এবং দার্শনিক। তাঁর সহৃদয়তা আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে। দার্শনিক যেমন জীবনের অসারতা প্রমাণিত করে জীবনসত্যকে উদ্‌ঘাটিত করেন, হাস্যরসিকও তেমন মানব-জীবনে অসংগতি ও বৈসাদৃশ্যের দিকটি উদ্ঘাটিত করে জীবনের স্বাভাবিক পরিচয়কে ব্যক্ত করে থাকেন। তাঁর হাসির মধ্যে ভ্রান্তিনিরসনকারী আলোর প্রাচুর্য আছে বলে তা আমাদের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। তিনি বুঝিয়ে দেন যে, আমরা আমাদের জীবনযাত্রায় প্রতিনিয়ত অসংগতির বোঝা বাড়িয়ে চলি; তিনি একে আঘাত না করে তার হাস্যকর দিকসমূহ প্রকাশিত করেন। কিন্তু সেই ব্যক্তির প্রতি আমাদের সমবেদনাও আকর্ষণ করেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'হাস্যরসিক একটি মাত্র বক্রোক্তি, একটি মাত্র অনায়াসোচ্চারিত হাস্যতরল মন্তব্যের দ্বারা আমাদের মনের উপর হইতে বদ্ধমূল সংশয়ের যবনিকা অপসারিত করেন।"

"'Irony ও Satire' এর মধ্যে হাস্যরসের অবকাশ রচিত হয়। কিন্তু ও হাসি প্রাণখোলা নয়। Irony হল ব্যঙ্গমিশ্রিত উপভোগ্য হাস্যরস। আর Satire হল শ্লেষমিশ্রিত তীক্ষ্ন ব্যঙ্গ। এটি নির্মম ও কঠোর, এবং এর উদ্দেশ্য হলো সংশোধন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্যে' Irony ও Satire'এর পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীকান্ত উপন্যাসে দর্জিপাড়ার হারমোনিয়ম্ বাদ্যবিশারদ নতুনদাকে নিয়ে প্রথমে ব্যঙ্গ করা হয়েছে; কিন্তু পরে কুকুরের হাত থেকে আক্রমণের ভয়ে শীতের রাত্রে গঙ্গায় তার আকণ্ঠ নিমজ্জন এবং জল থেকে উঠে বহুমূল্য একপাটি পাম্প সু'র-অনুসন্ধান তীক্ষ্ন Satire লক্ষণাক্রান্ত। 'লোক-রহস্যে' 'হনুম্বাবু সংবাদে' আছে Satire'এর পরিচয়। কিন্তু মহতী ব্যাঘ্র সভার বর্ণনায় Irony'র ব্যঙ্গ উপভোগ্য দীপ্তি বিচ্ছুরিত করেছে।

Wit'এর মধ্যে জীবন সম্পর্কে লেখকের বুদ্ধিকেন্দ্রিক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় না। এখানে থাকে অপর মনের অসংগতিকে কেন্দ্র করে বক্তা বা লেখকের বুদ্ধির চাতুর্য। কিন্তু Humour'এর লেখক স্নিগ্ধ দৃষ্টি ও উদার মন নিয়ে জীবনের গভীরে অবতারণা করেন; হাস্যপরিহাসের মাধ্যমে তিনি জীবনের ভুল ভ্রান্তি, বিকৃতি ও কৃত্রিমতাকে প্রকাশ করে উতরোল হাস্যরস সৃষ্টি করে থাকেন

আবার সহানুভূতিও আকর্ষণ করেন।

ইংরেজী সাহিত্যে চার্লস ল্যামের প্রবন্ধাবলী এবং শেক্সপীয়রের পরিণত বয়সের নাটকসমূহে হাস্যরস সৃষ্টির (Humour) উচ্চ আদর্শ পরিলক্ষিত হয়। চার্লস্ ল্যাম্ শুধু জীবনের অসংগতি নয়, নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়েও হাস্যরসের পরিচয় দিয়েছেন। শেক্সপীয়র 'As you like it' নাটকে এবং ফলস্টাফ্ চরিত্রের মাধ্যমে খাঁটি হাস্যরসের (Humour) পরিচয় দিয়েছেন। অষ্টাদশ শতকে ঔপন্যাসিক ফিল্ডিং (Fielding) ও স্টার্ণ (Sterne) এবং উনিশ শতকে ডিকেন্স (Dickens) তাঁদের রচনায় হিউমারের প্রবর্তন করেছেন। স্টার্ণের অসাধারণ সৃষ্ট চরিত্র হলো 'Uncle Toby'। তিনি বিশুদ্ধ ও সূক্ষ্ম রসিকতার প্রতীক ও প্রবক্তা। তাঁর অযৌক্তিক কথাবার্তা এবং ব্যবহারের উৎকেন্দ্রিকতার মধ্যে একটা স্বচ্ছ, গভীর সত্য দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তার হাসি করুণায় মিশ্রিত। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার অবিচারে যারা নিপীড়িত তাদের প্রতি অকৃত্রিম করুণা ও সহানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। ডিকেন্সের হাস্যরসের মধ্যে সমবেদনা ও অশ্রুসিক্ত করুণার পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তিনি অধিকাংশ স্থলে ব্যঙ্গমিশ্রিত অতিরঞ্জনের দ্বারা হাস্যরস সৃষ্টি করেন। তবে তাঁর পিকুইক সার্থক সৃষ্টি। সে একদিকে যেমন জীবনে লোকোব্যবহার ও কর্মক্ষেত্রে অসংগতি ও ত্রুটির পরিচয় দিয়ে নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তুলেছে, অন্যদিকে আবার তার শিশুসুলভ সারল্য ও আন্তরিকতা, গাম্ভীর্যের সঙ্গে কৌতুকপ্রিয়তা তার চরিত্রকে জনপ্রিয় করে তুলেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে দীনবন্ধু মিত্র নিমচাঁদ চরিত্র সৃষ্টি করে উচ্চাঙ্গের হাস্য-রসের পরিচয় দিয়েছেন। নিমচাঁদের বক্তব্য, উক্তির উত্তরে প্রত্যুক্তির দ্বারা বুদ্ধির তরবারি খেলা মাত্র নয়, সেই হাস্যরস তার চরিত্রের গভীর প্রদেশ থেকে উৎসারিত হয়েছে। তার রসিকতা ইংরেজী কাব্য সাহিত্যের উগ্র সৌরভে পরিব্যাপ্ত। ফলস্টাফের ন্যায় নিমচাঁদও জীবনরসের রসিক, এবং তাদের রসিকতা ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বিজড়িত। উভয়কে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

কমলাকান্তের দপ্তরে জীবনের তীক্ষ্ন বিশ্লেষণে ও সমালোচনার বিশিষ্ট ভঙ্গিতে বিশুদ্ধ হাস্যরস সৃষ্ট হয়েছে। এখানে হাস্যরসের সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণ ঘটেছে। তাই হাস্যরস কোথাও অতি সংযত, কোথাও বা বক্রকটাক্ষ এবং ওষ্ঠাধরের ঈষৎ বঙ্কিম আন্দোলনে প্রকাশিত। কোথাও লক্ষ্য করা যায় প্রহসনের উচ্চকণ্ঠে উতরোল হাসি, কোথাও কমেডির প্রাণখোলা উচ্ছ্বাস, কোথাও বা ট্রাজেডির স্নিগ্ধ সজল বিষণ্ণ আভাস। "কমলাকান্তের দপ্তর একটি তান-লয়-শুদ্ধ সংগীতের মত আমাদের রসবোধকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দান করে।"

"অনেকগুলি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র জীবনকে একটা প্রবল সর্বব্যাপী, হাস্যকর অথচ গভীর অর্থপূর্ণ কল্পনার ভিতর দিয়া দেখিয়াছেন ; সেই কল্পনার দ্বারা বিকৃত

ও রূপান্তরিত হইয়া জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা ও উদ্দেশ্য এক ব্যর্থ উদ্ভট খেয়ালের সূত্রে গ্রথিত বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে।" 'মনুষ্য ফল', 'পতঙ্গ', 'বড়বাজার', 'বিড়াল', 'ঢেঁকি', 'পলিটিকস্', 'বাঙালীর মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধসমূহ কল্পনাশক্তির প্রয়োগে স্বাভাবিক রূপে প্রকাশিত হয়েছে। কোথাও কোথাও সমালোচনা একটু অতিরিক্ত কল্পনাবিলাসী মনে হলেও লেখকের অনুভূতির প্রগাঢ়তা ও কল্পনা-স্রোতের প্রবাহে সমস্ত সংশয় অপসারিত হয়। উক্ত প্রবন্ধসমূহে প্রসংগের পরিবর্তন স্বচ্ছন্দভাবে ঘটেছে। লেখক ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও রঙ্গরসের স্তর থেকে সহসা দার্শনিকের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর বক্তব্যসমূহের মধ্যে কোথাও ক্রমভঙ্গ লক্ষ্য করা যায় না।

কতকগুলি প্রবন্ধে "প্রৌঢ়ত্বের মোহভঙ্গ, যৌবনের রঙিন নেশার অবসানে তীব্র অনুভূতিময় বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে। এখানে আমরা ভাষার ঐশ্বর্য, উপমার প্রাচুর্য ও ভাবের গভীরতার পরিচয় পাই। 'একা', 'আমার মন' ও 'বুড়ো বয়সের কথা' এই জাতীয় রচনা। বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য থাকা সত্ত্বেও বক্তব্যের সরসতা হ্রাস পায় নি। কমলাকান্ত যেন অত্যন্ত সহজে জীবনের অভিজ্ঞতাকে কাব্যলোকের সৌন্দর্যের স্তরে উন্নীত করেছেন। এই সকল প্রবন্ধে মূল বক্তব্য হলো মানবপ্রীতি, পরোপকার ও ঈশ্বরে ভক্তি। এ সকলই নীতিবিদের সনাতন বাণী। কিন্তু কমলা-কান্ত নীতিগর্ভ উক্তিসমূহকে রসিকতার দ্বারা আবৃত করায় তা আমাদের নিকটে অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছে।

'ইউটিলিটি বা উদর দর্শন' প্রবন্ধে বেনথামের দার্শনিক তত্ত্ব, সূত্র ও ভাষ্যের ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। বঙ্কিম গুরুগম্ভীরভাবে সূত্রসমূহ ভাষ্য যোগে উপাদেয় করে তুলেছেন। 'বসন্তের কোকিল' এবং 'ফুলের বিবাহ' এ দুটি প্রবন্ধে কল্পনার ক্রীড়াশীল উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হয়। এদুটি প্রবন্ধ Fantasy। প্রথম প্রবন্ধে কোকিলের প্রতিকূল সমালোচনা করে অকস্মাৎ তার সঙ্গে মর্মগত নৈকট্যের প্রীতি বন্ধন স্থাপন করা হয়েছে। 'ফুলের বিবাহ' আগাগোড়া একটি গল্পের ন্যায় সরসতায় পূর্ণ। মানুষের বিবাহ শূন্যে মিলিয়ে যায়, কিন্তু অন্তরে জেগে থাকে সুখ-দুঃখের আনন্দ-বেদনাময় স্মৃতি।

'আমার দুর্গোৎসব' ও 'একটি গীত' প্রবন্ধদ্বয়ের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও হাস্যরস চর্চা স্তব্ধ করে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি এক তীব্র হৃদয়ের আর্তিতে, গভীর ক্রন্দনের সুরে প্রকাশিত হয়েছে। 'একটি গীতে' বৈষ্ণব পদাবলীতে ব্যক্ত ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা স্বদেশপ্রীতির বেদনাকে আলোড়িত করে তুলেছে। মুসলমানগণ কর্তৃক নবদ্বীপ জয়ের চিত্র যেন গদ্য লিরিকে রচিত। আনন্দমঠের স্বদেশপ্রেম মাতৃমূর্তি কল্পনায় প্রকাশিত হয়েছে। এখানে সেই সুর উচ্ছ্বসিত হয়ে ভবিষ্যতের দিকে স্বপ্নময় দৃষ্টি প্রসারিত করেছে।

কমলাকান্তের রসিকতা তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রকাশক। তাই যে-কোন বিষয়বস্তুকে

তিনি হাস্যরস সহযোগে উপভোগ্য করে তুলতে পারেন। দপ্তরের প্রবন্ধসমূহ এত আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে তার কারণ হল যে, কমলাকান্তের হাস্যরস শিক্ষালব্ধ বস্তু নয়, এ হল তাঁর অন্তরের মৌলিক উপাদান। একে রবীন্দ্রনাথ নির্মল শুভ্র হাস্যরসরূপে বর্ণনা করেছেন। যে বঙ্কিম ছিলেন চিন্তাশীল দার্শনিক স্বদেশ-প্রেমিক তাঁর মধ্যেই ছিল হাস্যরসিক-এর এক শুভ্র উজ্জ্বল সত্তা। কমলাকান্ত তাই তাঁর বর্ণিত বিষয়বস্তুকে এত সরস ও উপাদেয় করে তুলতে পেরেছেন। ভারতচন্দ্রের ন্যায় বাগ্‌বৈদগ্ধ্য তাঁর একমাত্র অবলম্বন নয়, তাঁর হাস্যরস জীবনের অন্তর্লোক থেকে উৎসারিত ও ব্যক্তিত্বের স্পর্শে সঞ্জীবিত।

বাংলা সাহিত্যে কমলাকান্তের দপ্তরের প্রভাব :—

কাব্যসৌরভ, কৌতুকরস, নাটকীয়তা এবং দার্শনিক তত্ত্বের সমন্বয়ে কমলা-কান্তের দপ্তর বাংলা সাহিত্যে এক অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সাহিত্যরসিক সমাজে এর জনপ্রিয়তা ও প্রভাব অসাধারণ, বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব কমলাকান্তের চিন্তাধারাকে ঐক্য দান করেছে। এই জাতীয় রচনা অত্যন্ত বিরল বলে অবনীন্দ্রনাথ একে ধূমকেতু নামে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ এই জাতীয় রচনা আকস্মিকভাবে দেখা যায়, সচরাচর লিখিত হয় না। কমলাকান্তের প্রকাশকাল থেকে বহু গদ্য লেখক এর অনুকরণে প্রবন্ধ রচনার প্রয়াস করেছেন। তাঁদের মানসলোক এই গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সুহৃদদ্বয়—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিত কালে কমলাকান্তের রীতিতে যথাক্রমে রচনা করেন, 'স্ত্রীলোকের রূপ' এবং 'চন্দ্রালোকে'। তাঁরা উভয়ে কমলাকান্তের রীতিকে এমনভাবে আত্মসাৎ করেছিলেন, যে উক্ত দুটি প্রবন্ধে কমলাকান্তের ভাবনা ও রচনা-রীতির সংগে গভীর সাদৃশ্য দেখা যায়। এই কারণে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের দুটি রচনাকে কমলাকান্তের দপ্তরে সানন্দে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পরে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় এবং দেবেন্দ্রনাথ সেন কমলাকান্তের রীতির পুনঃপ্রবর্তন করেন। তার পরে চন্দননগরের চারুচন্দ্র রায়ও কমলাকান্তের ঢঙে লিখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ কমলাকান্তের "কি লিখিব" রচনার আদর্শে তাঁর ব্যঙ্গকৌতুক রচনা করেন। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় 'একা' প্রবন্ধের অনুসরণে তাঁর 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম, রচনা করেন। তিনি কমলাকান্তের রীতি অনুগতভাবে ব্যবহার করেছেন। "এত-দ্ব্যতীত বাংলাদেশে যাঁহারাই ব্যঙ্গ ও রসিকতার বেসাতি করিতে চাহিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেককেই কমলাকান্তের নিকট অল্পবিস্তর ঋণ স্বীকার করিতে হইয়াছে।"

হাস্যপরিহাসের সুরে হালকা বা গভীর কথা বলা এবং কমলাকান্তের রীতিতে সাহিত্য রচনা করা এক প্রকারের নয়। বঙ্কিমচন্দ্র যে রীতিতে 'লোকরহস্য' বা

'মুচিরাম গুড়' রচনা করেছেন, কমলাকান্তের দপ্তরে সেই রীতির উন্নততর উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে যাঁরা হাস্যরসাত্মক রীতিতে রচনা করেছেন তাঁদের উপরে কমলাকান্তের দপ্তরের প্রভাব থাকলেও 'লোকরহস্যের' প্রভাব যেন অধিকতর রূপে অনুভূত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর প্রবন্ধাবলীর কোনও কোনও স্থানে, বিশেষতঃ তাঁর প্রহসনে কৌতুক রস সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু সেখানে কমলাকান্তের সংগে রচনারীতির সাদৃশ্য কম। বরং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় কমলাকান্তের আদর্শে পরিহাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছেন। প্রমথ চৌধুরী এবং ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'লোকরহস্যের' রচনারীতি অনুসরণ করেছেন। প্রমথ চৌধুরী মূলত অনুসরণ করেছেন হুতোমী রচনারীতি এবং ইন্দ্রনাথ লোকরহস্যের রচনা ভঙ্গী। কিন্তু বীরবল যে কমলাকান্তের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। লেখকদ্বয় পরিহাস সৃষ্টিতে বুদ্ধিদীপ্ত চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য তাঁদের অসাধারণ। কিন্তু উভয়ে কমলাকান্তের পরিবেশে পরিবর্ধিত হয়েছিলেন। তাঁদের মূল উৎসকেন্দ্র হল বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তর। এই স্থান থেকে তাঁরা জীবনরস আহরণ করেছেন।

কমলাকান্তকে অনেকে অনুসরণ করবার প্রয়াস করেছেন। চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'জটাধারীর রোজনামচায়", অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর 'রূপক ও রহস্য' ও 'মহাপূজা' প্রভৃতি গ্রন্থে এবং আধুনিক কালে বনফুল, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর) প্রভৃতি লেখকগণ কমলাকান্তের দপ্তর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। পরশুরামের রচনারীতিও কমলাকান্তের বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত। তবুও রাজকৃষ্ণ বা অক্ষয়চন্দ্র কিংবা অপর লেখকগণ তাঁদের রচনায় যতই কমলাকান্তের রীতির পরিচয় দিয়ে থাকুন, মূলে কমলাকান্ত অনতিক্রমনীয়। হাল আমলে কমলাকান্ত শর্মা (প্রমথনাথ বিশী) ও 'এক-কলমী'র (পরিমল গোস্বামী) নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের রচনায় কমলাকান্তের বক্তব্য ও উপস্থাপনা রীতি অনুসৃত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরীতির উত্তরসাধক হলেন রবীন্দ্রনাথ। কমলাকান্তের দপ্তরের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি, যুক্তিতর্ক ও গভীর অনুভূতির সমন্বয়। দপ্তরের রচনা কোন নির্দিষ্ট পন্থায় অগ্রসর না হয়ে বস্তু ও ভাবকে নব নব রূপে আত্মসাৎ করেছে। যুক্তি থেকে ভাবাবেগ, বা লঘু কৌতুক থেকে গভীর সত্যে স্বচ্ছন্দে উত্তরণ কমলাকান্তের বৈশিষ্ট্য। তাই তাঁর রচনার বিচার কোন তত্ত্বের আলোক অথবা প্রচলিত ধারায় না করে রসসৃষ্টির দিক থেকে করতে হবে। বিচিত্র প্রবন্ধের রসাস্বাদনের নির্দেশ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন "ইহার যদি কোনো মূল্য থাকে তাহা বিষয়বস্তুর গৌরবে নহে—রচনা রস-সম্ভোগে।" এই আস্বাদন হল বড় কথা। বিষয়বস্তু এখানে গৌরবান্বিত না হলেও তা উপেক্ষণীয়

নয়। বিষয়বস্তু অপেক্ষা তার উপস্থাপনার কৌশলটি প্রাধান্য লাভ করায় রসাস্বাদনের ক্ষেত্রটি প্রশস্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রবন্ধের ন্যায় দপ্তরের প্রবন্ধসমূহের শ্রেণীবিভাগ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই হেতু রবীন্দ্রনাথ হয়তো প্রবন্ধের বিচিত্রতার কথা উল্লেখ করেছেন, এবং বঙ্কিমচন্দ্র নাম দিয়েছেন দপ্তর। ভীষ্মদেব ছেঁড়া কাগজের প্রসঙ্গ এনে আমাদের মনোযোগ কমলাকান্তের রচনারীতির দিকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন। এক কথায় বিষয় অপেক্ষা বিষয়ীর আত্মতা এখানে প্রধান। শেষ পর্যন্ত তাই আমাদের রচনারস আস্বাদন করতে গিয়ে লেখকের ব্যক্তিত্বের দিকে চোখ ফেরাতে হয়। লেখক কি বলেছেন, তদপেক্ষা কেমন করে বলেছেন, অর্থাৎ রীতির দিক, তাই হল রসসম্ভোগের নির্দশন। কমলাকান্ত তাঁর ছেঁড়া কাগজে খেয়ালখুশী অনুযায়ী কত বিচিত্র বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। সাহিত্য, সমাজ, স্বদেশ, ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে দপ্তরে ভীড় করে এসেছে। আবার কমলাকান্ত তাঁর পত্রে পত্ররচনার রীতির উপভোগ্য দিকটিও প্রদর্শন করেছেন।

'বীরবলের হালখাতা' কমলাকান্তের দপ্তরের দ্বারা অনুপ্রাণিত। বীরবল তাঁর বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির জন্য হুতোমের নিকটে বোধহয় বেশী ঋণী; তবুও পরিহাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি কমলাকান্তের প্রভাব অস্বীকার করতে পারেন নি। পরশুরামও ছদ্মনাম গ্রহণ করে কমলাকান্তের জীবনরস রসিকতার দিকটি গ্রহণ করেছেন। তাঁর রচনায় বুদ্ধির দীপ্ত বক্রোক্তি ও শাণিত ভাষণের যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তার মূল উৎস কমলাকান্তের দপ্তর।

বর্তমানকালে—বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের জন্য সৈয়দ মুজতবা আলী, যাযাবর ও রঞ্জন প্রভৃতি খ্যাতিলাভ করেছেন। তাঁদের রচনায় পরিবেশের পরিবর্তন ঘটেছে, প্রসঙ্গেরও পরিবর্তন ঘটেছে; কিন্তু রচনারীতি কমলাকান্তের দ্বারা কমবেশী প্রভাবিত। তাই কমলাকান্তের প্রভাব সেকাল ও একালের রস-রচনায় বিশেষ ভাবে দেখা যায়। সুতরাং কমলাকান্তের দপ্তরের প্রধান পরিচয় তাঁর বিশেষ রীতির মধ্যেও একমাত্র নিহিত নয়, তা আছে কমলাকান্তের ব্যক্তিত্বের মধ্যে। এই ব্যক্তিত্বের প্রভাবের ফলে কমলাকান্ত অনন্যতায় উত্তরসূরীদের মনোলোকে প্রতিষ্ঠিত।

কমলাকান্তের দপ্তরের শ্রেণীবিভাগ :—

বিভিন্ন সমালোচক কমলাকান্তের দপ্তরের রচনাসমূহের বিভিন্ন দৃষ্টিতে শ্রেণী বিন্যাস করেছেন। কবিশেখর কালিদাস রায় এই গ্রন্থের তিনটি শ্রেণী প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁর দৃষ্টিতে তিন জাতীয় পরম্পরা প্রকাশিত হয়েছে।

(ক) আমার দুর্গোৎসব, কে গায় ওই প্রভৃতি প্রবন্ধের পরম্পরা হল আবেগাত্মক। একটি গীত প্রবন্ধটিতে কমলাকান্ত ব্যাখ্যাতা। কিন্তু এই ব্যাখ্যার পারম্পর্যও আবেগাত্মক ভঙ্গিতে বিন্যস্ত।

(খ) স্ত্রীলোকের রূপ, চন্দ্রালোকে প্রভৃতি রচনায় যুক্তিমূলক ধারা অনুসরণ করা হয়েছে।

(গ) বড় বাজার, ঢেঁকি ইত্যাদি আলঙ্কারিক ভঙ্গিতে বিন্যস্ত।

এই শ্রেণীবিন্যাস সাহিত্য বিচারের রসবোধ ও জাগ্রত দৃষ্টির পরিচয় দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র যে অসাধারণ প্রতিভা ও সমন্বয়ের অধিকারী ছিলেন, এই কথা কবিশেখর বলতে চেয়েছেন।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ভিন্ন দৃষ্টিতে প্রবন্ধসমূহের শ্রেণীবিন্যাস করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণে প্রবন্ধসমূহ পঞ্চ-বিভাগের অন্তর্গত।

(ক) বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কতিপয় প্রবন্ধে জীবনকে একটা প্রবল, সর্বব্যাপী হাস্যকর অথচ গভীর অর্থপূর্ণ কল্পনার আলোকে দেখেছেন, এবং তার ফলে "জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা ও উদ্দেশ্য এক ব্যর্থ উদ্ভট খেয়ালের সূত্রে গ্রথিত" বলে মন হয়। মনুষ্য ফল, পতঙ্গ, বড় বাজার, বিড়াল, ঢেঁকি প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তভুর্ক্ত।

(খ) কতকগুলি প্রবন্ধে প্রৌঢ় বয়সের মোহভঙ্গ, যৌবনের নেশার অবসানে তীব্র অনুভূতিময় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একা, আমার মন ও বুড়া বয়সের কথা এই জাতীয় রচনা।

(গ) তৃতীয় বিভাগে স্থান পেয়েছে ইউটিলিটি বা উদর দর্শন। সূত্র ও ভাষ্যের ছাঁচে বক্তব্যের কাঠামো রচনা করা হয়েছে, তবে তা ব্যঙ্গমূলক। সংস্কৃত শাস্ত্র অনুযায়ী সাতটি সূত্র ও তাদের ভাষ্য পরিহাস মার্জিত ভঙ্গিতে বিন্যস্ত হয়েছে।

(ঘ) চতুর্থ শ্রেণীর প্রবন্ধসমূহকে বলা চলে Fantasy অথবা কল্পনার ক্রীড়াশীল উচ্ছ্বাস। বসন্তে কোকিল এবং ফুলের বিবাহ এই শ্রেণীর অন্তভুর্ক্ত। সমালোচক বলেছেন, "কোকিলের প্রতিকুল সমালোচনা হঠাৎ সহানুভূতির ও সমব্যবসায়ীর প্রীতি বন্ধনে রূপান্তরিত হইয়াছে।"

(ঙ) পঞ্চম শ্রেণীর অন্তভুর্ক্ত দুটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য, 'আমার দুর্গোৎসব' 'একটি গীত'। এই দুই রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি নির্ঝরিণীর ন্যায় প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে উৎসারিত হয়েছে। একটি গীত প্রবন্ধটি যেন গদ্যে রচিত আবেগপূর্ণ গীতিকবিতা।

অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলা চলে যে, এই প্রবন্ধসমূহ হাস্যরসাশ্রিত, হাস্যপরিহাসবর্জিত ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপূর্ণ হাস্যরসে পূর্ণ, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হতে পারে। 'ফুলের বিবাহ' ও 'ইউটিলিটি' হাস্যরসাশ্রিত রচনা। 'ফুলের বিবাহ' কাহিনীভিত্তিক রচনা। এখানে হাস্যরস স্বচ্ছন্দ ধারায় প্রবাহিত। কিন্তু ব্যঙ্গের তির্যক রূপ কোথাও নেই। 'ইউটিলিটি' প্রবন্ধটি সূত্র ও ভাষ্যে রচিত এবং এখানে হাস্যরসের ধারা অনর্গল প্রবাহে

উৎসারিত হয়েছে।

'একা', 'আমার দুর্গোৎসব, 'একটি গীত,' এবং 'বসন্তের কোকিল' ও 'স্ত্রীলোকের রূপের' শেষাংশ হাস্যবর্জিত গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ভঙ্গিতে রচিত। বিষয়গত গাম্ভীর্য এত প্রবল যে এখানে হাস্যরসের কোন অবকাশ নেই। অপর দিকে বসন্তের কোকিল ও স্ত্রীলোকের রূপ লঘু পরিহাসমূলক ভঙ্গিতে রচিত হলেও শেষাংশে ঘটেছে ভাবের পরিবর্তন। সেখানে বক্তব্য লঘু ও তরল ভঙ্গি পরিহার করে গাম্ভীর্যের সুর গ্রহণ করেছে।

তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে স্থান পেয়েছে ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক হাস্যাশ্রয়ী প্রবন্ধসমূহ। 'বড় বাজার', 'মনুষ্য ফল', 'ঢেঁকি', 'স্ত্রীলোকের রূপ', 'আমার মন', প্রভৃতি প্রবন্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সুর তীক্ষ্ন। 'চন্দ্রালোকে' নিবন্ধটিতে পাণ্ডিত্য ও কল্পনার আতিশয্য নির্মল হাস্যরস সৃষ্টিতে বিঘ্ন রচনা করেছে।

দপ্তরের প্রবন্ধসমূহকে বিষয়গত আবেদন, এবং রচনারীতির ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। মূলত এই শ্রেণীবিভাগ বিষয় ও তার উপস্থাপনার রীতির উপরে নির্ভরশীল।

(১) স্বদেশভাবনা প্রীতিমূলক রচনা—আমার দুর্গোৎসবব একটি গীত।

(২) দার্শনিক তত্ত্ব এবং জীবনদর্শনমূলক রচনা—একা, আমার মন এবং একটি গীত প্রবন্ধের শেষাংশ।

(৩) সমাজ, বিশ্লেষণমূলক রচনা—বিড়াল, মনুষ্য ফল, আমার মন, (অংশ বিশেষ) বড় বাজার, পতঙ্গ, স্ত্রীলোকের রূপ, ঢেঁকি।

(৪) কবিত্বপূর্ণ কল্পনাপ্রধান রচনা—বসন্তের কোকিল, ফুলের বিবাহ, একা, একটি গীত।

(৫) মননধর্মী ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা—চন্দ্রালোকে, মনুষ্য ফল, বিড়াল, ঢেঁকি, পতঙ্গ, স্ত্রীলোকের রূপ, আমার মন, বড় বাজার।

'ইউটিলিটি বা উদর দর্শন' প্রবন্ধটিকে কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। একে ব্যঙ্গমূলক হাস্যরসাত্মক রচনা রূপে অভিহিত করা যায়। সূত্র ভাষ্যের সহায়তা এই প্রবন্ধের বক্তব্য ও ব্যাখ্যা হাস্যরসকে অবারিত করে দিয়েছে। আবার ফুলের বিবাহ প্রবন্ধে নিসর্গপ্রীতির পরিচয় আছে ও সমগ্র বক্তব্যটি কল্পনার আলোকে গীতিমূর্ছনায় প্রকাশিত হয়েছে।

কমলাকান্তের দপ্তরের বস্তুসংক্ষেপ :—

একা—হঠাৎ পথচারী পথিকের সঙ্গীতে কমলাকান্ত মুগ্ধ হয়ে পড়লেন। সঙ্গীতটি এমন সুন্দর নয়, গায়কও তেমন সুকণ্ঠ নয়, কিন্তু জ্যোৎস্নাপুলকিত রাত্রিতে কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে আপন মনের মাধুরি ছড়িয়ে পথিকের গান কমলাকান্তের হৃদয়কে আলোড়িত করল। চারদিকের আনন্দের মধ্যে কমলাকান্ত একা।

রাজপথে জনস্রোত চলেছে, কিন্তু কমলাকান্ত নিঃসঙ্গ। আনন্দের এই উচ্ছ্বসিত ধারার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে কমলাকান্ত সকলের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করতে পারেন না কেন? পারেন না কেবল তিনি নিঃসঙ্গ বলে। তাই তাঁর কথা হল এ সংসারে কেউ যেন একা না থাকে।

কিন্তু কমলাকান্ত চিরকালই এমন ছিলেন না। তিনিও একদিন আনন্দ অনুভব করতেন, সংসারের সব কিছুই সুন্দর দেখতেন, গান শুনে আনন্দ পেতেন। বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে মিশে গিয়ে অকারণে কত হাসি হাসতেন। এই গান শুনেই মুহূর্তের জন্য বিগত যৌবনের সুখস্মৃতির দিনসমূহের কথা মনে পড়ল। হারানো দিনের সুখস্মৃতি মনে পড়ায় তাঁর মনে আনন্দের সঞ্চার হল।

কিন্তু এখন জীবনে সে সুখ, সে আনন্দ নেই কেন? সুখের সামগ্রী ত কমেনি। দীর্ঘজীবনের সঞ্চয় অনেক বেড়েছে তবে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ কমল কেন? পৃথিবী আর তেমন ভাল লাগে না। প্রকৃতির রূপ-রাশিও যেন অনেকটা ম্লান হয়ে গেছে। যা এক সময়ে সরস ও মধুর বোধ হ'ত তা এখন শুষ্ক অসুন্দর বলে মনে হয় কেন? কোন্ জিনিসের অভাব ঘটল? অভাব শুধু আশার। যে আশা নয়ন-মন মুগ্ধ করে কল্পনায় কত সুন্দর ছবি দেখাত সেই আশা আর নেই। সংসারের তিক্ত অভিজ্ঞতায় কমলাকান্ত অনেক জ্ঞানলাভ করেছেন। জীবনের সায়াহ্নে উপনীত হয়ে তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন সংসার একটি পথচিহ্নহীন গভীর অরণ্য : এর থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার কোন উপায় নেই। যাকে কেবল সৌন্দর্য-মাধুর্যের আকর বলে মনে হয়েছিল তার বীভৎস রূপ নিরীক্ষণ করে এখন তিনি শিউরে উঠেছেন। মিথ্যা মায়া মানুষকে কতখানি ভ্রান্ত করে তা তিনি এখন অনুভব করেছেন। যে গান শুনে তিনি এই-মাত্র আনন্দ অনুভব করেছিলেন, সেই গানও তিনি আর শুনতে চান না। সংসারের রস তাঁর ফুরিয়ে গেছে। সুতরাং সংসার-সঙ্গীত আর তাঁকে আনন্দ দিতে পারে না। তার পরিবর্তে তিনি আর একটি সংগীত শুনতে চান। প্রীতি ও প্রেমের সংগীত শোনবার জন্য এখন তিনি উৎসুক। মনুষ্য জাতির উপর—
—সকল জীবের উপরে—সর্বভূতে যদি তাঁর প্রীতি ও প্রেম থাকে তবে তিনি আর কিছু কামনা করেন না, কেননা ঈশ্বরই প্রীতি।

মনুষ্যফল—আফিঙের মাত্রা একটু বেশি চড়ালেই কমলাকান্তের মনে হয় যে, মানুষগুলি যেন সব ফল। তাদের আকৃতি ও প্রকৃতি এবং প্রয়োজনীয়তা যেন ফলের মতোই। কমলাকান্তের প্রথমেই মনে হলো ধনী ব্যক্তিমাত্রেই যেন কাঁটাল। আঠা, ভুতুড়ি প্রভৃতি অসার পদার্থ প্রচুর থাকলেও কয়েকটি রসাল কোয়া যা আছে তাদের লোভে দেওয়ান, গোমস্তা, মোসাহেবের বেশধারী শৃগালের দল সতৃষ্ণনয়নে তাকিয়ে থাকে। এই শৃগালের আক্রমণ থেকে হয়ত বা কাঁটালটিকে রক্ষা করা গেলেও মাছির উৎপাত থেকে বাঁচানই শক্ত। বড়ো মানুষরূপী পাকা কাঁটালকে

ঘিরে মাছি রূপে যারা ভন্ ভন্ করে তাদের মধ্যে আছে কন্যাদায়গ্রস্ত, মাতৃদায়-গ্রস্ত ব্যক্তি, গ্রন্থকার, সংবাদপত্রের মালিক, দুঃস্থ আত্মীয়, জীর্ণদশা-টোলের পণ্ডিত প্রভৃতি নানাশ্রেণীর সাহায্যপ্রার্থী।

সিভিল সার্ভিসের সাহেবরা ফলের মধ্যে আম্র-সদৃশ। অনেকগুলি টক, কিছু কিছু মিষ্টি আমও আছে। অনেকগুলির স্বাদ ভাল নয়, কিন্তু বাহিরে এমন রঙের চটক আছে যে, সেগুলি বেশিদরে বিক্রী হয়। এই আম খাওয়ার একটা বিশেষ পদ্ধতি কমলাকান্ত আবিষ্কার করেছেন। সেলামের জলে আম-গুলোকে ভিজিয়ে খোসামোদরূপ বরফ লাগিয়ে ঠাণ্ডা করে এগুলোকে খাওয়া যায়। তখন তা ভালই লাগে।

অনেকে স্ত্রীজাতিকে কলাগাছের সঙ্গে তুলনা করছেন। কেউ কেউ স্ত্রীলোককে মাকাল ফলের সঙ্গে তুলনা করেছেন, কিন্তু কমলাকান্তের এ সব তুলনা ভাল লাগে না। তাঁর মতে সংসার-বৃক্ষে স্ত্রীজাতি হলো নারিকেল। নারিকেল কাঁদি কাঁদি ফলে। নারিকেল-ব্যবসাদার কাঁদি কাঁদি কেনে। বিবাহব্যবসায়ী কুলীন ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেউ কাঁদি কাঁদি পাড়ে না। নারিকেলের মধ্যে যেমন করকচি, ডাব আর ঝুনো, স্ত্রীজাতির মধ্যে তেমনি কিশোরী, যুবতী ও বর্ষীয়সী গৃহিণী। কমলাকান্তের নির্বাচনে উভয়ক্ষেত্রেই মধ্যমটি সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে কাম্য। সৌন্দর্যে ও পরিতৃপ্তিতে ডাব এবং যুবতীর তুলনা নেই। তবে আমের মতো ডাবকে বরফজলে অর্থাৎ মিষ্ট কথায় শীতল রাখতে হয়। নারিকেলের চারিটি জিনিস—জল, শস্য, মালা আর ছোবড়া, কমলাকান্তের কল্পনায় যথাক্রমে স্ত্রীলোকের স্নেহ, বুদ্ধি, বিদ্যা ও রূপ। গ্রীষ্মের তাপে ডাবের জলের মতো যেমন আর কিছু নেই, তেমনি এই সংসার-তাপে তপ্ত পুরুষের কাছে মাতার আদর, স্ত্রীর প্রেম বা কন্যার ভক্তির মতো আর কী আছে? স্ত্রীলোকের বুদ্ধিরূপ শাঁস ডাবের অবস্থায় বেশ সুমিষ্ট ও কোমল, তবে ঝুনো-বেলায় তাতে দন্তস্ফুট করা শক্ত। এরই নাম গিন্নীপনা। স্ত্রীলোকের বিদ্যাকে নারিকেলের মালা মনে করার কারণ, কমলাকান্ত লক্ষ্য করেছেন, স্ত্রীলোকের ঐ বস্তুটি সর্বদাই অর্ধেক, অর্থাৎ অসম্পূর্ণ। মালা বড় কাজে লাগে না, স্ত্রীলোকের বুদ্ধিও তাই। স্ত্রীলোকের রূপকে ছোবড়ার সঙ্গে উপমিত করে কমলাকান্ত বাহ্যসৌন্দর্যের অসারতা ও রূপোন্মত্ততার পরিণাম যে রজ্জু-যোগে উদ্বন্ধনের মতো তারই প্রতি ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন। যাই হোক, গাছে নারিকেলের ছড়াছড়ি, কিন্তু কমলাকান্তের দুর্ভাগ্য যে তাঁর ভাগ্যে একটিও জুটলো না।

যাদের আমরা দেশহিতৈষী বলে মনে করি কমলাকান্তের কাছে তারা শিমুল ফুল। বাইরে তাদের রঙের চটক নেড়া গাছের পক্ষে খুবই বেমানান! শিমুল ফুল যেমন হঠাৎ ফেটে যায় আর সব তুলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি দেশ-হিতৈষিগণও কেবল বাক্যের তুবড়ী সৃষ্টি করেন, আসল কাজ কিছুই হয় না।

ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে কমলাকান্ত ধুতুরা বলে মনে করেন। সংস্কৃত বচনের উদ্ধৃত রচনার মধ্যে একটা নেশা জমিয়ে দেয়। বাঙলার লেখকগণ তেঁতুল। নিজস্ব বলতে কিছুই নেই, খালি খোলা আর সিটে; গুণের মধ্যে আছে শুধু অম্লতা। অর্থাৎ বাঙালী লেখকের রচনা প্রায়ই অসার ও পাঠকের অরুচিকর। তবে তেঁতুল কাঠ যেমন জ্বালানি হিসাবে ভালো আগুনের সৃষ্টি করে, যেমনি বাংলা সাহিত্য এদিকে শুষ্ক কাষ্ঠের মতো হলে কি হবে, সমালোচনার আগুনে পোড়ে ভালো। দেশী হাকিমগণ যেন কুমড়া। তাদের নিজেদের কোনো গৌরব নেই। কেউ যদি উপরে তুলে দেয় তবে উপরেই থেকে যায়, আবার কেউ কেউ মাটিতে গড়াগড়ি দিতেও অভ্যস্ত। তবে বিলাতী কুমড়ার গৌরব অধিক। তবে সংসারোদ্যানে আরও যত ফল আছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অকর্মণ্য, কদর্য, টক হলো একটি মানুষ, স্বয়ং কমলাকান্ত।

Utility বা উদরদর্শন—উদরদর্শনের ছয়টি সূত্র।

(১) জীবশরীরস্থ বিশাল গহ্বরবিশিষ্ট স্থানকে উদর বলে। কমলাকান্ত এই সূত্রের ভাষ্যে প্রত্যেকটি শব্দের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। জীবশরীরস্থ বলবার তাৎপর্য এই যে, পর্বতগুহা প্রভৃতিকে উদর বলা হয় না। আবার নাক, কান প্রভৃতি ক্ষুদ্র গহ্বরগুলিকে যাতে কেউ উদর মনে না করে সেইজন্য সূত্র 'বৃহৎ' কথাটি যোগ করেছেন। অবস্থা বিশেষে অঞ্জলিও উদর মধ্যে গণ্য। কোন কোন স্থানে উদর পূর্ণ করতে হয়। কোন স্থানে অঞ্জলি ভরে দিতে হয়।

(২) উদরের ত্রিবিধ পূর্তিই পরম পুরুষার্থ। ত্রিবিধ বলতে কমলাকান্ত আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই তিন প্রকারের কথা বলেছেন। অন্ন-ব্যঞ্জন প্রভৃতি খাদ্য-সামগ্রী দ্বারা যে উদর পূরণ তা আধিভৌতিক। বড়লোকের বাক্যে প্রলুব্ধ হয়ে আশায় আশায় যে কালক্ষেপণ তা আধ্যাত্মিক, আর দৈবকৃপায় প্লীহাযকৃৎ পীড়ায় যে উদর-পূরণ তা আধিদৈবিক।

(৩) এদের মধ্যে আধিভৌতিক পূর্তিই বিধেয়। আধিভৌতিক পূর্তি অর্থাৎ লুচি, সন্দেশ প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থের দ্বারা উদর পূরণই পুরুষার্থ। সুতরাং উদরের মধ্যে কোন্ কোন্ উপায়ে লুচি সন্দেশ প্রভৃতি প্রেরণ করা যায় তা অতঃপর বিবৃত হচ্ছে।

(৪) বিদ্যা, বুদ্ধি পরিশ্রম, উপাসনা, বল ও প্রতারণা পুরুষার্থ সাধনের এই ছয়টি উপায়। বিদ্যা বাংলাদেশের স্বতঃসিদ্ধ। এর জন্য কোন বাঙালীর পরিশ্রম করতে হয় না। বুদ্ধি সকলেরই আছে। কেউ কখনও বলে না যে, তার বুদ্ধি নেই। সময়মত অন্নব্যঞ্জন ভোজন বিভ্রাট ও পরিভ্রমণ, ধূমপান, গৃহিণীর সঙ্গে বাক্যালাপ এইসব গুরুতর কার্যসম্পাদনের নাম পরিশ্রম। ক্ষমতা-শালী ব্যক্তির গুণকীর্তনের নাম উপাসনা। ক্রুদ্ধ হয়ে হাঁকডাক, মুখে অনর্গল

বকা, হিন্দী, ইংরাজী ও নিষ্ঠীবনের বৃষ্টি, দূর থেকে কিল চড় ইত্যাদি প্রদর্শন ও বিপক্ষের শক্তি দর্শনে পলায়ন এইগুলোর নাম বল, এবং দোকানদার, চিকিৎসক ও ধর্মোপদেষ্টার যে বৃত্তি তারই নাম প্রতারণা। দোকানদার জিনিস বিক্রয় করে মূল্য চায়, রোগী রোগমুক্ত হলে চিকিৎসক অর্থ চায়, ও ধর্মোপদেষ্টা অর্থ কামনা করেন না। এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তি প্রতারক।

চার নম্বর সূত্রে পুরুষার্থ-সাধনের যে পথগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে পঞ্চম সূত্রে কমলাকান্ত পূর্বপণ্ডিতের মতটি খণ্ডন করছেন।

(৫) এই ষড়বিধ উপায়ের দ্বারা উদরপূর্তি বা পুরুষার্থ অসাধ্য। এর ভাষ্যে কতকগুলি দৃষ্টান্ত নিয়ে কমলাকান্ত বলছেন, বিদ্যায় যদি উদরপূরণ হতো তবে বাঙলা সংবাদপত্রের অন্নাভাব কেন?' বুদ্ধিতে যদি উদরপূর্তি হতো, তবে গর্দভ মোট বইবে কেন? পরিশ্রমে যদি উদরপূর্তি হতো তবে বাঙালী বাবুরা কেরানি কেন? উপাসনায় যদি উদরপূর্তি হতো তবে কমলাকান্ত সায়ংকালীন আফিম পায় না কেন? বলে যদি উদরপূর্তি হতো তবে আমরা পড়ে পড়ে মার খাই কেন? প্রতারনায় যদি উদরপূর্তি হতো তবে মদের দোকান কখন কখন ফেল পড়ে কেন?

(৬) উদয়পূর্তি বা পুরুষার্থ কেবল হিতসাধনের দ্বারা সাধিত হয়। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ লোকের কানে মন্ত্র দিয়ে হিতসাধন করেন। ইউরোপীয় জাতিগণ বন্যজাতির হিতসাধন করছেন, রুশ মধ্য-এশিয়ার হিতসাধনে নিযুক্ত। কেউ বই লিখে ও সংবাদপত্র ছাপিয়ে দেশের হিতসাধন করছেন। সকলেই হিতসাধনে ব্যস্ত এবং সকলেরই প্রচুর পরিমাণে উদরপূর্তি হচ্ছে।

কমলাকান্ত আশা করেন যে, তাঁর এই উদরপূর্তি দর্শনের সঙ্গে হিতবাদ দর্শনের প্রচুর মিল আছে। সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা, পাতঞ্জল, বৈশেষিক ভারতের এই ষড়দর্শনের সঙ্গে কমলাকান্তের এই দর্শনটি সপ্তম দর্শন বলে সমাদৃত হবে।

পতঙ্গ—নসীরামবাবুর বৈঠকখানায় সেজ জ্বলছে। চারিদিকে নানারকম দলাদলির গল্প চলছে। কমলাকান্ত একটু বেশী মাত্রায় আফিম চড়িয়ে ফেলেছেন। আফিমের নেশায় কমলাকান্ত দেখলেন, একটি পতঙ্গ সেই সেজটির চারদিকে চোঁ-ও-ও বোঁ-ও-ও শব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কমলাকান্ত বহু চেষ্টা করেও পতঙ্গের ভাষার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে না পেরে পতঙ্গের নিকট আপনার অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন। তখন আফিমের প্রভাবে তাঁর দিব্যকর্ণ লাভ ঘটল। তিনি শুনতে পেলেন যে, পতঙ্গ তাঁকে চুপ করতে বলছে, কারণ আলোর সঙ্গে তার কথা চলছে।

কমলাকান্ত শুনলেন যে, পতঙ্গ বলছে—আলো, তুমি যখন নিরাবরণ প্রদীপমাত্র ছিলে তখন তোমার মধ্যে ছুটে গিয়ে মরতে পারতাম। কিন্তু এখন সেজের মধ্যে

প্রবেশ করায় আর পুড়ে মরতে পারি না।

অগ্নিশিখায় পুড়ে মরা আমাদের চিরকালীন অধিকার। তবে কেন তুমি কাচের আবরণে আপনাকে আবদ্ধ করে আমাদের পুড়ে মরার পথ বন্ধ করলে? আমরা ত হিন্দুর মেয়ে নই। আমরা সাধ-আশা থাকতে পুড় মরতে প্রস্তুত। আমাদের সঙ্গে স্ত্রী-জাতির একটিমাত্র সাদৃশ্য এই যে, তারাও আমাদের মতই জ্বলন্ত রূপ-শিখায় আত্মবিসর্জন করে। অবশ্য তারা সেই দাহে সুখলাভ করে। কিন্তু আমরা কেবল পুড়ে মরবার জন্যই পুড়ে মরি। আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। রূপবহ্নিতে আত্মসমর্পণ না করলে এ দেহের প্রয়োজন কোথায়? বিশ্বের অপর কোন বস্তুতে এত বৈচিত্র্য নেই। তা পুরোনো হয়ে যায়। সুতরাং হে আলো, তোমার কাচের আবরণ দূর কর যাতে আমি পুড়ে মরতে পারি।

আমার এ আকাঙ্ক্ষা একান্ত ক্ষুদ্র। তুমি শিখা, তুমি পোড়াবে না কেন? আমি পতঙ্গ, আমি পুড়ব না কেন? তোমাকে ঢেকে রাখে এমন বস্তু পৃথিবীতে নেই। তবে কেন কাচের এই তুচ্ছ আবরণ। এই আবরণ ভেদ করে আত্মপ্রকাশ কর।

তোমার স্বরূপ কি আমার জানা নেই। কিন্তু অহরহ তোমার কথাই ধ্যান করছি। আমার জীবনের অস্তিত্ব তোমার মধ্যে আত্মসমর্পণ করবার জন্য উন্মুখ। তুমি কাচের ভিতর রয়েছ। কিন্তু তোমাকে আমি একদিন পাবই। এখন যাই, কিন্তু আবার আসছি।

পতঙ্গ উড়ে গেল। কমলাকান্ত শুনলেন যে, নসীরামবাবু তাঁকে ডাকছেন। নেশার ঘোরে তিনি দেখলেন, নসীবাবুর যায়গায় বসে আছে একটি বৃহৎ পতঙ্গ। তাঁর মনে হলো মানুষমাত্রেই পতঙ্গ এবং তারা বিশেষ বিশেষ বহ্নির অভিমুখে ছুটে চলেছে। জ্ঞান, ধন, মান, রূপ, ধর্ম, ইন্দ্রিয়—সারাবিশ্বে নানা বহ্নি প্রজ্বলিত। কেউ তার মধ্যে ছুটে গিয়ে পুড়ে মরছে। আবার কেউ বা কাচের মতো নানা বাহ্য আবরণে প্রতিহত হওয়ায় রক্ষা পাচ্ছে।

ধর্মবহ্নির দাহে চৈতন্যদেব, ও জ্ঞানবহ্নিতে গ্যালিলিও সক্রেতিস প্রমুখ মহামানব পুড়ে মরেছেন। মহাভারতে দুর্যোধন মানবহ্নিতে ভস্মীভূত হয়েছে; প্যারাডাইস লস্ট জ্ঞানবহ্নির দাহ। সেন্ট পল, আন্টনি-ক্লিওপেট্রা, রোমিও-জুলিয়েট, আর ওথেলো, যথাক্রমে ধর্ম, ভোগ, রূপ, ও ঈর্ষাবহ্নির পতঙ্গ। ইন্দ্রিয়-বহ্নির লেলিহান শিখা গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দর। বহ্নির স্বরূপ না জেনে তাতেই ঝাঁপ দেওয়ার জন্য আমরা সবাই মত্ত। আমরা পতঙ্গ ছাড়া আর কি?

আমার মন—কমলাকান্তের মন চুরি গেছে। কোথায় গেল মন? রন্ধনশালায় কি? ইলিশ মাছের লোভে, সদ্যকর্তিত ছাগমাংসের সুরভিত ব্যঞ্জন, অথবা লুচি ও সন্দেশের লোভে মন মাঝে মাঝে পাকশালায় যায় বটে, কিন্তু অনুসন্ধান করে দেখা গেল এবার মন সেখানে যায় নি। তবে কি প্রসন্ন গোয়ালিনী মনচুরি করেছে?

কমলাকান্তের তার সঙ্গে সম্বন্ধ যে রসের—একথা সকলেই বলাবলি করে। কমলাকান্তও স্বীকার করছেন যে, প্রসন্নর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা মূলতঃ গব্যরসের গব্যরসে ও কাব্যরসে একটা বিনিময় চলতো। প্রসন্ন ও তার দুগ্ধবতী গাভী উভয়েই তুল্যভাবে কমলাকান্তের প্রিয়পাত্রী। উভয়ে স্থূলাঙ্গী, লাবণ্যময়ী ও ঘটোধ্নী। মনের সন্ধানে কমলাকান্ত পথে বেরোলেন। এক লাস্যময়ী যুবতী তাঁর মন হরণ করেছে কি না, জানতে গিয়ে হয়রানি ভোগ করলেন। তিনি লাঞ্ছিত হলেন। যুবতী তাঁকে কটুকথা শুনিয়ে বিদায় দিল।

দেখা গেল, উপস্থিত কিছুতেই তাঁর আর মন নেই। তবে মন কোথায় গেল?

আসল কথা, লঘুচেতাদের মনের বন্ধন চাই, নইলে মন উড়ে যায়। কোন কিছুতেই যার মন বাঁধা পড়ে নি সে মনের খোঁজ পাবে কি করে? যে চিরকাল আপনার রইলো কখনও পরের হলো না তার পৃথিবীতে সুখ কোথায়? এখন কমলাকান্ত বুঝেছেন, পরের জন্য আত্মবিসর্জন না করতে পারলে পৃথিবীতে স্থায়ী সুখ পাওয়া যায় না। অর্থ, মান প্রভৃতিতে সুখ আছে বটে, কিন্তু তারা অস্থায়ী। পৃথিবীতে যেগুলিকে আমরা কাম্য বস্তু বলে মনে করি তারা তৃপ্তি দিতে পারে না, বরং দুঃখ দেয়। যশের সঙ্গে নিন্দা, ইন্দ্রিয়সুখের সঙ্গে রোগ, ধনতৃষ্ণার সঙ্গে ক্ষতি ও মনস্তাপ, এবং সুনামের সঙ্গে কলঙ্ক অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। একমাত্র পরসুখবর্ধন ভিন্ন মানুষের স্থায়ী সুখ নেই। মানুষ যে একদিন এই সত্য উপলব্ধি করবেই কমলাকান্তের তা দৃঢ় বিশ্বাস।

আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী সভ্যতার ফলে বাহ্য সম্পদের উপর আসক্তি এত বেড়ে গেছে যে, দেশ উৎসন্নে যাওয়ার উপক্রম। দেশময় কেবল বাহ্য-সম্পদেরই পূজা—ভারতবর্ষের আর সব দেবমূর্তি মন্দিরচ্যুত হয়েছে। কমলা-কান্তের কথা হলো বাণিজ্যই বাড়ুক, আর রেলওয়ে টেলিগ্রাফের সুবিধাই বাড়ুক তাতে কি মনের সুখ বাড়বে, না এই হারানো মন খুঁজে পাওয়া যাবে? অথচ বাহ্য সম্পদের নেশায় দেশ উন্মত্ত, টাকার নেশায় মানুষ পাগল। মন বলে কিছু যেন নেই।

টাকশালেই আমাদের মন ভাঙে গড়ে। সমস্ত দেশ টাকার পূজাতেই মত্ত। এ পূজার পুরোহিত ইংরেজ। এর পুরাণ ও তন্ত্র এডাম স্মিথ ও মিল। ইংরেজী সংবাদপত্র এ পূজার ঢাক-ঢোল, বাংলা সংবাদপত্র কাঁসিদার, শিক্ষা ও উৎসাহ এর নৈবেদ্য, আর হৃদয় এর ছাগবলি। এ পূজার ফল ইহলোকে ও পরলোকে অনন্ত নরক। তাই কমলাকন্তের মনে এ ছাইভস্ম ভারতবর্ষ থেকে দূরীভূত হওয়া আবশ্যক।

প্রতিপক্ষ বললেন যে, উদর নামক যে বৃহৎ গহ্বর আছে, তাকে তো প্রত্যহ ভর্তি করতে হবে। এই যাতে ভালভাবে বোজে তার জন্য চেষ্টা করায় দোষ কি? কিন্তু কমলাকান্ত বলতে চান যে, আর সব কথা ভুলে গিয়ে কেবল গর্ত বোজাবার

চেষ্টায় সবাই পাগল হয়ে উঠলে চলবে কেন? গর্তের এক কোণ যদি খালি থাকে সেও ভাল, অন্যদিকে একটু মন দেওয়া প্রয়োজন। কমলাকান্ত চিরকাল গর্ত বোজাবার চেষ্টাই করেছে, পরের জন্য ভাবে নি। তাই সংসারে আজ তার সুখ নেই। পৃথিবীতে তার থাকবার কোন প্রয়োজন নেই। পরের বোঝা ঘাড়ে নিতে হবে বলে কমলাকান্ত সংসার করেন নি। তার ফল হয়েছে সংসারে তার মন নেই, পৃথিবীতে তার সুখ নেই। পরের জন্য যে দায়ী নয়, সুখে তার অধিকার নেই।

তাই বলে যে বিবাহমাত্রই সুখের নিদান তা নয়। যে বিবাহ আত্মপরিবারকে ভালবেসে তাবং মনুষ্যজাতিকে ভালবাসতে শেখায়, একমাত্র সেই মানবপ্রীতিবর্ধক, প্রকৃত সুখের উৎসস্বরূপ বিবাহ ছাড়া অন্য বিবাহে কোন প্রয়োজন নেই।

চন্দ্রালোকে—চন্দ্রালোকিত একটি রাত্রিতে কমলাকান্ত প্রাচীন কাব্যের নায়ক-নায়িকার কথা ভাবছিলেন। কমলাকান্তের জন্য কেউ তো অভিসারে বেরুলো না। চন্দ্রের সাতাশটি পত্নী কিন্তু কমলাকান্তের একটিও নেই। অন্তত অশ্লেষা ও মঘা এই দুটো হলেও কমলাকান্তের চলতো। এখন দেশে প্রাচীন কৌলীন্য প্রথা লোপ পেয়েছে। তৎপরিবর্তে ভাল পাশ-করা বরই পরম কুলীন। এমন বর প্রচুর দান-সামগ্রীর সঙ্গে একটি নির্বোধ নববধূ লাভ করে থাকেন। কমলাকান্ত এমন বিবাহে রাজী নন। বংশবৃদ্ধির জন্য বিবাহ করতে হ'লে মৎস্য বিবাহ করাই ভাল। টাকার জন্য টাঁকশালের অধ্যক্ষকে বিবাহ করলেই হয়। আর সৌন্দর্যের জন্য বিবাহ করতে হ'লে চাঁদ ছাড়া আর কেউ কমলাকান্তের চোখে পড়ে না। চাঁদই সমস্ত আকাশের শোভা। কমলাকান্ত চাঁদকেই বিবাহ করতে চায়। কিন্তু চাঁদ যে পুরুষ! হঠাৎ কমলাকান্তের মনে পড়লো আমাদের মতে চাঁদ হি কিন্তু বিলিতি মতে চাঁদ শী। কে যে হি, আর কে যে শী, তা ঠিক করা বড় শক্ত কথা। যে নবাব রাজ্য ও স্বাধীনতা হারিয়ে মাসোহারা নিয়ে বিলাসে মজে আছেন তিনি পুরুষ, আর যে মহিষী নিজের দেশের প্রতি অনুরাগের বশবর্তী হয়ে আত্মসম্মান বজায় রেখে অপরিচিত স্থানে বাস করেন তিনি নারী।

একে একে কমলাকান্তের এমন অনেক হি-শী-বিভ্রাটের কথা মনে পড়লো। মনে পড়লো ফ্রান্সের উদ্ধারকর্ত্রী জোয়ান ওর্লিয়ান্সের ও তার বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী বেডফোর্ডের কথা, কোমৎ-বিরোধিনী মাদম ক্লোডিলড দেবো-র কথা, তিন-তিনটি সীজর-বিজয়িনী মিসর-রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার কথা, নব্য-বঙ্গযুবক সম্প্রদায়কে মন্ত্রমুগ্ধ রাখতে সক্ষম এক কীর্তন-গায়িকার কথা—এদের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী ক্ষমতা-প্রতিপত্তি-আধিপত্যের দিক দিয়ে আসলে পুরুষশক্তির দাবী রাখে, অর্থাৎ আসলে শী নয় হি। হঠাৎ কমলাকান্তের মাথায় খেলে গেল, বঙ্গীয় যুবকেরা কোথাও হি, কোথাও শী, এবং সর্বত্র বিকল্পে ইট হন। এর নিত্যবিধি—ইয়ারকিতে হি, শয্যাগৃহে শী, এবং বিষয়কর্মে ইট। বক্তৃতায় হি, সাহেবের কাছে শী, মদ্যপানে

ইট। প্রসন্নকে শী বলা, কমলাকান্তের এখন মনে হলো, অযৌক্তিক ; কেননা একদা সে কোনো এক মধু চাটুয্যে-কে জব্দ করেছিলো কমলাকান্তের প্রতি অসম্মান দেখানোর জন্য, আর যে কমলাকান্তকে সকলেই জানে হি, সে যে দিব্যি একদিন নসীবাবুর এক টিপ্পনীর ভয়ে আফিমের মাত্রা কমিয়ে ফেললো, এটা কি শী-য়ের মতো আচরণ নয় ?

যাই হোক, চন্দ্রকে যখন কমলাকান্ত ভালোবেসেছে তখন তাকেই সে বিয়ে করবে, এবং বাধ্য হয়ে বিলিতি মতেই বিয়ে করবে। বলতে বলতেই বিবাহ সম্পন্ন হলো, প্রথমে কোর্টশিপ, তারপর গান্ধর্ব-বিবাহ। এখন বর কমলাকান্ত বধূ চন্দ্রকে উপদেশ দিতে শুরু করলো। চন্দ্র যেন যেখানে সেখানে তার রূপ-গৌরব না দেখায়। যেখানে শোক-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা সেখানে যেন সে সৌন্দর্য বিস্তার না করে। অপরকে সৌন্দর্যে ভোলাতে যাওয়া চন্দ্রের আর চলে না, কেননা সে এখন কমলাকান্তের একমাত্র। অতঃপর লীলা। চন্দ্রকে কমলাকান্তের সাধাসাধি সে যেন তার সকল রকম মাধুরী বিস্তার করে নায়কের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়। কিন্তু চাঁদের বুঝি অভিমান হয়েছে, সুতরাং মানভঞ্জনের প্রয়োজন। কিসে অভিমান হলো বোঝা ভার। যে নিজে কলঙ্কিনী তার আবার অভিমান ? চন্দ্রকে বিবাহ ক'রে আজ থেকে কমলাকান্ত Lunatic নাম ধারণ করলো, তবু এত রাগ ? জ্যোতির্বিদের মতে যে চন্দ্র পাষাণী, তার মনুষ্যত্ব নেই, তাকে কিনা কমলাকান্ত বধূরূপে গ্রহণ করেছে, তবু রাগ ? তবে আর উপায় কি ? পায়ে ধরেই সাধতে হয়! সাধাসাধিতেও ফল নেই দেখে কমলাকান্ত বলে, অমন করলে সে শতসহস্র বিবাহ করবে। চাঁদকে জব্দ করার জন্য সে অমনি এক নিশ্বাসে বহু বিচিত্র নিসর্গ-সৌন্দর্যের ছবি এঁকে দিয়ে জানালো যে, ইচ্ছামাত্র সে এদের যে-কোনো একটাকে বিয়ে করতে পারে। এইভাবে অকৃতদার কমলাকান্ত কেবল বিয়ে করতে শিখলো না, ঘটকালীও শিখে ফেললো। সে সকলের মনের মত সামগ্রী মিলিয়ে দেবে।

বসন্তের কোকিল—বসন্তের কোকিল কেবল বসন্তেরই—শীত বা বর্ষার সে কেউ নয়। সংসারেও এমন লোক বিস্তর আছে যারা কেবল সুখের সময় এসে জোটে, কিন্তু দুঃসময়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। নসীবাবুর যখন ভালো অবস্থা, যখন তাঁর বাড়ী আমোদ-উৎসবে ভরা, তখন সেখানে লোকের ভিড় আর কমে না, কিন্তু যে দিন তাঁর পুত্রের অকালমৃত্যু ঘটলো সে দিন আর কেউ সে বাড়ী মাড়ায় না। কারণ সে দিন নসীবাবুর বর্ষা, বসন্তের মানুষ-কোকিল আসবে কেন ?

কোকিল যে 'কু' বলে ডাকে তার অর্থ বুঝি এই যে, তার চোখে সবই কু, কিছুই সুন্দর নয়। সে নিজে কালো, পরের প্রতিপালিত ; তাই তার সমস্ত ভালোর প্রতি, সৌন্দর্যের প্রতি ঈর্ষা ও নিন্দাবাদ। অতএব দেখা যাচ্ছে কোকিলের গুণের অন্ত নেই। কোকিল সুখের দিনের সঙ্গী, কোকিল নিন্দুক। কিন্তু তবু

কোকিলের ডাক সকলেই শুনতে চায়। সংসারে গলা-বাজির জিত বরাবরই।
এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত গ্লাডস্টোন, ডিস্রেলির জয়জয়কার, আর গলাবাজির অভাবে জন স্টুয়ার্ট মিলের পার্লামেণ্টে স্থানাভাব। কমলাকান্তের মনে হলো সঙ্গত কারণেই বসন্তের কোকিল প্রকৃতির মহা-পার্লামেণ্টে উচ্চস্থান পেয়েছে—ঐ পঞ্চম-স্বরের অশেষ যাদু। কলকণ্ঠে যে সবই 'কু' বলে ঘোষণা করছে, একি মিথ্যা হতে পারে? সত্যই তো লতায় কণ্টক, কুসুমে কীট, গন্ধে বিষ, পত্রের শুষ্কতা, রূপের বিকৃতি, স্ত্রীজাতির বঞ্চনা কে অস্বীকার করতে পারে? সুর-পঞ্চমের কী মহিমা! বৃদ্ধ মাতা-পিতার বেসুরো বকাবকিতে কাজ হয় না, কিন্তু গৃহিণীর পঞ্চমে সাধা গলার আওয়াজ অগ্রাহ্য করা অসাধ্য। তাই এ 'পঞ্চমে'-র স্বরূপ নির্ণয়ে কমলাকান্ত দিশেহারা হয়ে পড়ে।

সহসা তার মনে হলো, বসন্তের কোকিল ও কমলাকান্ত একই পর্যায়ের, সমান দুঃখের দুঃখী, সমান সুখের সুখী। কেউ পুষ্পকাননে, আর কেউ সংসারকাননে,—কাজ একই, মনের আনন্দে গান গেয়ে বেড়ানো। কোকিল গান গায়, আর কমলাকান্ত দপ্তর লিখে বেড়ায়। একের পুঁজিপাটা ঐ গলা, অপরের এই আফিমের ডেলা। পঞ্চমে তান ধরে দু'জনে যেন একজনকেই ডাকে। সে যে কে, পাখীর কাছে সেইটাই কমলাকান্তের জিজ্ঞাসা। পরে মনে হলো, জেনে হোক, না-জেনে হোক, দুজনেই ডাকে চিরসুন্দরকে। কিন্তু কোকিলের ডাক যেমন লক্ষ্যস্থানে পৌঁছুতে অব্যর্থ কমলাকান্তের তো তা হতে পারে না। এই মনের ক্ষোভে সে কোকিলকেই, সমদরদী ব'লে, অনুরোধ করে যেন তার হয়ে সে ডাকে। কারণ, কমলাকান্তের মনের কথা যে এজন্মে বলা হলো না! কোকিল সন্ধান পেয়েছে পরম সত্যের যেমন পেয়েছে শেলির স্কাইলার্ক। সে জেনেছে 'things more true and deep than we mortals dream'. যদি একবার কোকিলের ঐ অমানুষী ভাষা সে পেতো তবেই বলার মত করে বলার সাধ মিটতো। তিনিও চান পাখীর ন্যায় 'harmonious madness' শিক্ষা করতে যার ফলে 'the world should listen than as I am listening now'.

স্ত্রীলোকের রূপ—রমণীকুল নিজেদের রূপের গৌরবে মাটিতে পা দেন না। তাঁরা মনে করেন যে, তাঁদের রূপ বুঝি অসাধ্য সাধন করতে পারে। কেবল সৌন্দর্যাভিমানী রমণীর এরূপ ধারণা নয়, অনেক পুরুষের ধারণাও এইরূপ। নারীর রূপ-বর্ণনা আরম্ভ করলে পৃথিবীতে এমন বস্তু নেই যার সঙ্গে নারীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের তুলনা কবিরা না দিয়ে থাকেন। তখন পূর্ণচন্দ্র হেরে যায়, উষার সুষমা হেরে যায়, হেরে যায় জ্যোৎস্না, তারা, তরঙ্গ, নীলোৎপল, খঞ্জন, চকোর, পদ্ম-কোরক, দাড়িম্ব, কদম্ব—যেখানে যা কিছু আছে উপমাস্থল। কমলাকান্ত মনে করে যে, এ সব বড়ই বাড়াবাড়ি। বিশেষ তো যে নারী হংসগামিনী তাকেই আবার গজেন্দ্রগামিনী বলা কমলাকান্তের সহ্য হয় না। তাই সে রহস্য

করে বলে যেদিকে এখনও রেলপথ হয়নি সেইসব দিকে গজেন্দ্রগামিনী মেয়ের ডাক বসালে কেমন হয়।

এককালে কমলাকান্তও ছিল নারী-রূপের উপাসক কবি-দলভুক্ত। কিন্তু এখন তার মোহ-ভঙ্গ হয়েছে। সে দিব্যজ্ঞান লাভ করেছে। রমণীরূপের মোহের জাল ছিঁড়ে কমলাকান্ত মুক্ত হয়েছে ঃ 'সকলই আফিমের প্রসাদে।'

যে যাই মনে করুক আফিমের কৃপায় কমলাকান্ত এবার কিছু সত্য কথা শোনাবে। সৌন্দর্যটা যেন স্ত্রীলোকেরই একচেটে, পুরুষের কোনো দাবী নেই, এটা মস্ত ভুল। আসল কথা, যার যে বস্তু আছে সে তার জন্য লালায়িত হয় না। কমলাকান্ত দেখে শুনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে স্ত্রীলোকদের মধ্যে সৌন্দর্যের বড়ই অভাব। সেইজন্য সর্বদাই তারা নিজেদের রূপ বাড়াতেই ব্যস্ত। বিচিত্র অলংকার যোগে তারা তাই অঙ্গের শোভাবর্ধনে ব্যাপৃত থাকে। পুরুষ বিনা অলংকারেই সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু স্ত্রীলোক অলংকার ছাড়া মনুষ্য সমাজে মুখ দেখাতে লজ্জা পায়। নিজেদের ব্যবহারেই স্ত্রীজাতি প্রমাণ করছে যে, পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য নিকৃষ্ট। সৃষ্টি-পদ্ধতি আলোচনা করলেও দেখা যায় এই সিদ্ধান্ত যথার্থ। ময়ূরীর নয় ময়ূরেরই আছে চন্দ্রককলাপ, সিংহীর নয় সিংহেরই আছে কেশর, গাভীর নয় বৃষেরই আছে ঝুঁটির শোভা। উচ্চশ্রেণীর জীবগণের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ সুন্দরতর। কমলাকান্তের ধারণা, মানুষ সৃষ্টি করতে গিয়ে সৃষ্টিকর্তা এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেছেন। তাছাড়া, সৌন্দর্যের শোভাবৃদ্ধি হয় যৌবনে। কিন্তু স্ত্রীলোকের যৌবন কতদিন? চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশে পুরুষের যে শ্রী থাকে নারীর তা থাকে না। বেশ-ভূষা-রূপ তেঁতুল মেখে আদা লবণের ছিটে দিয়ে, স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যরূপ বুকীর চালের ঠাণ্ডা ভাত যেমন তম্বির করে খেতে হয়, অতিক্রান্তযৌবনা নারীকে নিয়েও তেমনি ঘর করতে হয়। কাব্যে, সাহিত্যে রমণীরূপের যে এত প্রশংসা তার একমাত্র কারণ, লেখকগণ অধিকাংশই পুরুষ। তাদের মনের মোহ রমণীর রূপের বর্ণনা করেছে। এর ওপর আছে প্রণয়দেবের কারসাজি! প্রণয়াবেগ কুৎসিতকে সুন্দর দেখে, কর্কশকে মধুর ভাবে। তাই তো প্রণয়ান্ধ পুরুষের চোখে নারী রূপসী। নচেৎ নারীরা মনে মনে কিন্তু পুরুষরূপেরই উপাসিকা। আসলে রূপ রূপ করেই স্ত্রীলোকের সর্বনাশ হয়েছে। সকলে ভাবে রূপই বুঝি নারীর সর্বস্ব। রূপের জন্য বারাঙ্গনাবর্গের সৃষ্টি, পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোকের দাসীত্ব। কিন্তু কমলাকান্তের দৃঢ় বিশ্বাস, ক্ষণস্থায়ী রূপ নারীর সর্বস্ব নয়। নারীর গুণই রূপ অপেক্ষা সহস্রগুণে আদরণীয়। নারী সহিষ্ণুতা, ভক্তি ও প্রীতির মূর্তি। সন্তানের জন্য জননীর দুঃখবরণ, আর্ত ও পীড়ত আত্মীয়বর্গের সেবা ও শুশ্রূষার জন্য নারীর বিনিদ্র রাত্রিযাপন কে না দেখেছে! পতিপুত্রের জন্য জীবনবিসর্জন,

ধর্ম ও আদর্শের জন্য বাহ্যসুখবিসর্জন নারী যেমন অনায়াসে করতে পারে তাতে নারীর মহত্ত্বই সূচিত হয়। বেশীদিনের কথা নয় আমাদের দেশের পতিব্রতা রমণীগণ স্বামীর চিতায় সহস্যবদনে ভস্মীভূত হয়েছেন। কোমলাঙ্গী বঙ্গললনাগণ যে দেশে এইভাবে প্রাণবিসর্জন করতে পারতেন, সে দেশে সেই বঙ্গনারীর মধ্যে মহত্ত্বের বীজ নিহিত আছে। বঙ্গললনাগণ বঙ্গদেশের সার-রত্ন। সুতরং এই দেশের নারীর পক্ষে মিথ্যা রূপের বড়াই অশোভন ও অপ্রয়োজনীয়।

ফুলের বিবাহ—নসীরামবাবুর ফুলবাগানে বসে নেশার ঘোরে কমলাকান্ত একটি বিবাহ দেখলেন। যেমন যেমন দেখেছেন তার যথার্থ বর্ণনা করছেন। বিবাহের কন্যা মল্লিকা, তার কলিকা-অবস্থা প্রায় শেষ, প্রায় ফুটবার সময় হয়ে এসেছে, কন্যার পিতা সামান্য লোক। পরপর অনেকগুলি মেয়ের বিয়ে দিতে হবে কিন্তু সম্বল তেমন কিছুই নেই। অনেক জায়গায় বিয়ের কথা হয়েছিল, কিন্তু কোনটাই স্থির হয়নি। বাগানের রাজা স্থলপদ্ম পাত্র উৎকৃষ্ট বটে। কিন্তু জবা তার বড় বাধা—সতীনের ঘরে কন্যাকর্তা মেয়ে কি করে দেবেন? গন্ধরাজ পাত্র ভাল বটে কিন্তু বড় দেমাক্। এমন সময় ভ্রমর ঘটক হয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলো, মেয়ে আছে? মল্লিকাগাছ পাতা নেড়ে সায় দিল, আছে। ঘটক মেয়ে দেখতে চাইলো। ঘোমটা-পরা মেয়ে দেখে খুশি হলো না, মুখ খুলতে বললো, কিন্তু মেয়েগুলো বড় লাজুক, মুখ দেখতে হ'লে ঘটককে একটু অপেক্ষা করতে হয়। ঘটক স্থলপদ্মের বৈঠকখানায় গিয়ে বসলো, তখন মল্লিকার ঠান-দি সন্ধ্যা এসে মল্লিকাকে বোঝালো—দিদি, একবার ঘোম্‌টা খোল,—নইলে, বর আসিবে না। অনেক সাধ্যসাধনায় অবশেষে মল্লিকা মুখ খুললো। ঘটক এসে দেখলো, দেখে কন্যার গুণে মুগ্ধ হলো। কিন্তু প্রশ্ন হলো ঘরে মধু কতো। কন্যাকর্তা শাখা নেড়ে বললো—সব কড়ায় গণ্ডায় দেওয়া হবে—মায় ঘটকালিও। তবে ঘটকালির আগাম কিছু দাবী করতেই বিড়ম্বিত কন্যাকর্তা জানতে চায় বরটি কে। ঘটক জানালো—বর গোলাব লাল গন্ধোপাধ্যায়, একেবারে ফুলে মেলের কুলীন, তারপর আবার সাক্ষাৎ বাঞ্ছামালীর সন্তান। তার স্বহস্তরোপিত। এক দোষ, কিছু কাঁটা আছে, তা কাঁটা কোন্ ফুলে বা কোন্ কুলে নেই?

ঘটক সম্বন্ধ স্থির করে ভোঁ করে উড়ে গোলাবের বাড়ীতে খবর দিল। গোলাব বিয়ের কথায় খুশি হয়ে কনের বয়স জিজ্ঞাসা করলে ঘটক বললো—আজি কালিই ফুটিবে।

গোধূলি লগ্নে বিবাহ, মৌমাছি সানাই বাজাতে আরম্ভ করলো। কিন্তু রাত-কাণা বলে সঙ্গে যেতে পারলো না।—উচ্চিংড়া ন'বত বাজালো, জোনাকি আলোর ঝাড় সাজালো, বরযাত্র অনেকেই গেল, কিন্তু স্থলপদ্ম সন্ধ্যার পর অসুস্থ হয়ে পড়ায় যেতে পারলো না। জবা, করবী সকলেই সাজসজ্জা করে চললো।

সেঁউতির নীতবর হবার ইচ্ছে। চাঁপা গরদের জোড় পরে এলো,—উগ্র গন্ধে মনে হলো সে ব্র্যাণ্ডি টেনে এসেছে। গন্ধরাজ গন্ধে দেশ মাতিয়ে তুললো। অশোক নেশায় লাল হয়ে এসে উপস্থিত, সঙ্গে একপাল পিঁপড়ে। তাদের গুণ কিছু নেই, দাঁতে বড় জ্বালা, সব বিয়েতেই এই রকম কিছু কিছু বরযাত্রী এসে থাকে। তারা হুল ফুটিয়ে বিবাদ বাধায়। কুরুবক, কুটজ প্রভৃতি অনেক বরযাত্রী এসেছিল।

কমলাকান্তেরও নিমন্ত্রণ ছিল। গিয়ে দেখলেন বরপক্ষের বড় বিপদ। বাতাস বাহকের বায়না নিয়েছিলো, কিন্তু কার্যকালে কোথায় লুকালো আর খুঁজে পাওয়া গেল না। মল্লিকাদের কুল যায় দেখে কমলাকান্ত বর-বরযাত্রী সকলকে নিয়ে গেলেন মল্লিকাপুরে। কন্যার বাড়ীতে কন্যার ভগিনীরা সব আহ্লাদে ঘোমটা খুলে সুখের হাসি হাসছে। মালতী, বকুল, যুথী, রজনী-গন্ধা, প্রভৃতি এয়োরা স্ত্রীআচার করলো। পুরোহিতরূপে উপস্থিত নসীবাবুর নবমবর্ষীয়া কন্যা কুসুমলতা। কন্যাকর্তা কন্যা সম্প্রদান করতেই পুরোহিত দু'জনকে একসুতোয় গেঁথে ফেললো।

এবার বাসর। প্রাচীনা ঠানদি টগর রসিকতা করতে করতে শুকিয়ে উঠলো। রঙ্গণের রাঙ্গা মুখে হাসি ধরে না। যুঁই কন্যার পাশ ঘেঁষে বসলো। বকুল একে বয়সে ছোট, তাই গুণের তুলনায় রূপ কম। সে একপাশে গিয়ে বসল। ঝুমকো বড় মানুষের গিন্নীর মত মোটা মাগী নীল শাড়ী ছড়িয়ে আসর জমকিয়ে বসলো।

ঠিক এই সময় কুসুমলতা কমলাকান্তকে হাত দিয়ে ঠেলতে লাগলো—কাকা, ওঠ, চল বাড়ী যাই। কমলাকান্তের চমক ভাঙলো। কোথায় সেই পুষ্পবাসর? কোথায় সেই হাস্যমুখী পুষ্পসুন্দরীগণ? সব যেন স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল। কিন্তু সবই কি মিলিয়েছে? কুসুমলতা যে মালা গেঁথেছিল, কমলাকান্ত দেখলেন সেই মালায় বরকন্যা গাঁথা রয়েছে। কমলকান্ত সাংসারিক বিবাহের কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত করেছেন।

বড় বাজার—কমলাকান্ত নসীরাম-ভবনে আসা অবধি প্রসন্ন গোয়ালিনীর কাছ থেকে দুধ, দই, ক্ষীর, সব প্রচুর পেয়ে আসছেন। প্রত্যহই খাবার সময় মনে করতেন, পরলোকে সঙ্গতির জন্যই প্রসন্ন ব্রাহ্মণকে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য যোগান দিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করছে। কমলাকান্ত প্রত্যহ প্রসন্নর অক্ষয় স্বর্গের জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করতেন। কিন্তু কি ভয়ানক! এখন প্রসন্ন মূল্য চাইছে! যেদিন প্রসন্ন প্রথম মূল্য চাইলো, সেদিন কমলাকান্ত রসিকতা বলে উড়িয়ে দিলেন। দ্বিতীয় দিনে বিস্মিত হলেন। তৃতীয় দিনে ক্রুদ্ধ হয়ে গাল দিলেন। এখন প্রসন্ন দুধ দেওয়া বন্ধ করেছে। এতদিনে কমলাকান্ত ঠেকে শিখলেন যে, মনুষ্যজাতি নিতান্ত স্বার্থপর। ভক্তি, প্রীতি, স্নেহ, প্রণয় সবই

আকাশকুসুম। কী অন্যায়। প্রসন্নর দই, দুধ আছে। আর কমলাকান্তের ক্ষুধা আছে। এর মধ্যে মূলের কথা কি ক'রে আসে তা প্রথম কমলাকান্ত বুঝতে পারেননি। এখন বুঝতে পারছেন যে, সংসারে যাবতীয় সামগ্রী মূল্য দিয়ে ক্রয় করতে হয়। কেবল দুধ, দই, চাল, ডাল, নয়,—বিদ্যা, বুদ্ধি, যশ, মান, ধর্ম ইত্যাদিও মূল্য দিয়ে কিনতে হয়। বিনা মূল্যে মন্দ জিনিসও কেউ কাউকে দেয় না। যদি বিষ খেয়ে মরতে ইচ্ছা হয়, তাও তোমাকে মূল্য দিয়ে কিনতে হবে।

অতএব এই বিশ্বসংসার একটি বৃহৎ বাজার, সকলেই দোকান সাজিয়ে বসে আছে। সকলেরই উদ্দেশ্য নিজের মাল বেচে মূল্য লাভ করা, বেশী দামে পচা মাল চালাবার চেষ্টা সকলেরই। সস্তা খরিদের অবিরত চেষ্টার নামই মানব-জীবন।

কমলাকান্ত ভেবে-চিন্তে মনের দুঃখে আফিং-এর মাত্রা চড়ালেন। তাঁর দিব্য-দৃষ্টি খুলে গেল। কমলাকান্ত দেখলেন, সংসারে কেবল দোকানদার আর খরিদ্দার, সকলেই পরস্পরকে অঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছে। কমলাকান্ত বাজার করতে বেরিয়ে প্রথমে গেলেন রূপের দোকানে। দেখলেন, পৃথিবীর রূপসিগণ রুই, কাৎলা, মৃগেল, ইলিশ, কই, মাগুর, পুঁটি হয়ে খরিদ্দারের জন্য লেজ আছড়িয়ে ধড়ফড় করছে। বেলা বাড়ছে আর মাছগুলো খাবি খাচ্ছে। রকমারি মাছের গুণাগুণ বর্ণনা করে মেছুনি হেঁকে চলেছে। কমলাকান্ত মাছ কিনবার জন্য এগিয়ে গেলেন, দেখলেন মাছের দালালের নাম পুরোহিত। যে মাছই কেনা হোক না কেন একদর—জীবনসর্বস্ব। দু-চার দিন পরে যখন মাছ পচে গন্ধ হবে, তখন এত দর দিয়ে এ সামগ্রী কেনা কেন? কমলাকান্ত মেছোহাটা থেকে পালিয়ে এলেন। মেছুনীরা তাকে গাল পাড়তে লাগলো।

বিদ্যার বাজারে গিয়ে কমলাকান্তের চক্ষুস্থির। সেখানে আসল বস্তুর সন্ধান নেই—শাঁস ফেলে কেবল ছোবড়া নিয়ে টানাটানি। বিজ্ঞানের বাজারের অবস্থাও ঐ প্রকার; সেখানে ইউরোপীয়গণ আমাদের দেশের জ্ঞান আত্মসাৎ করে গবেষণা করছে ও ফল ভোগ করছে। সাহিত্যের বাজারে সংস্কৃত সাহিত্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের দোকান দেখলেন। বাংলা সাহিত্যের দোকানও একটি আছে। কিন্তু বিক্রেয় পদার্থটি কি দেখবার ইচ্ছা হওয়ায়, কমলাকান্ত দেখলেন যে, বস্তুটি হলো খবরের কাগজে জড়ানো কতগুলি অপক্ক কদলী। কলু-পটিতে গিয়ে কমলাকান্ত ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন, দেখলেন উমেদার মোসাহেব যত সব কলু সেজে তেলের ভাঁড় নিয়ে সারি সারি বসে গেছে। কারও কাছে চাকুরী আছে শুনতে পেলেই পা টেনে নিয়ে তেল মাখাতে বসে। যার নগদ টাকা আছে, কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির লোভে, তাকেও তেল দিতে চায়। কত লোকের কত প্রার্থনা। এই প্রার্থনা পূরণের জন্য তেল দিতে সকলেই প্রস্তুত।

কমলাকান্ত এইবার যশের ময়রাপটিতে প্রবেশ করলেন। সংবাদপত্র লেখক-রূপী ময়রারা গুড়ের সন্দেশ সস্তায় বিক্রী করছে। বিনা ছানায়, শুধু গুড়ে সেই আশ্চর্য সন্দেশরূপ বিক্রেয় যশের দুর্গন্ধে নাকে কাপড় দিতে হয়। কেউ টাকাটা সিকেটায়, আনা দু আনায়, কেউ কেবল খাতিরে, কেউ বা শুধু একটু বাবুর গাড়িতে চড়তে পেলেই যশ বিক্রী করেন। একদিকে রাজপুরুষগণ মিঠাই-ওয়ালা সেজে রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর প্রভৃতি মিঠাই বিক্রয় করছেন। কমলাকান্ত দেখলেন, বিক্রয়ের ব্যবস্থা বড়ই খারাপ, কেউ সর্বস্ব দিয়েও এক ঠোঙা পাচ্ছে না—কেউ বা শুধু সেলাম করে দেড় মণ নিয়ে যাচ্ছে।

কমলাকান্ত এইখানে একটি দোকান দেখলেন, সেটা বড় অন্ধকার। দোকানে কোন ক্রেতা নেই। একটি ফলকে লেখা আছে, স্বয়ং মহাকাল জীবন-মূল্যে অনন্ত যশ বিক্রয় করেন। জীবন্তে কেউ এ পায় না, খাঁটি যশ আর কোথাও পাওয়া যায় না।

তখন কমলাকান্ত বিচারের বাজারে গেলেন। সে এক মস্ত কসাইখানা, ছুরি হাতে ছোট-বড় সমস্ত কসাই ছাগ, মেষ, গরু প্রভৃতি কাটছে। আর মহিষাদি বড় বড় জন্তু পা ও শিং নেড়ে ছুটে পালাচ্ছে। কমলাকান্তের বাজার দেখবার আর সাধ রইল না। তবু উদরের প্রয়োজনে দইয়েহাটা দেখতে লাগলেন। সেখানে নজরে পড়লো স্বয়ং কমলাকান্ত চক্রবর্তী নামে গোয়ালা—দপ্তররূপ পচা ঘোলের হাঁড়ি নিয়ে বসে আছে। নিজেও ঘোল খাচ্ছে, পরকেও খাওয়াচ্ছে। তখন চমক ভাঙলো। দেখলেন এক হাঁড়ি ঘোল নিয়ে প্রসন্ন তাঁকে খাওয়ার জন্য সাধাসাধি করছে। সে বলছে যে আজ দুধ দই নেই ; এই ঘোলটুকুর জন্য দাম দিতে হবে না।· কমলাকান্তের বর্ণনা রূপকধর্মী হলেও বস্তুনিষ্ঠ এবং তা সমাজজ্ঞতার পরিচয় দেয়। তাঁর আত্ম-বিশ্লেষণ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

আমার দুর্গোৎসব—সপ্তমী পূজার দিন আফিম চড়িয়ে কমলাকান্ত প্রতিমা দেখতে গেলেন কেন, এই প্রশ্ন বারে বারে তাঁর মনে উঠছে, কারণ তিনি দেখলেন দিগন্তবিস্তৃত কালস্রোতে তিনি একা ভেসে চলেছেন। প্রাণভয়ে ভীত হয়ে মা মা বলে ডাকছেন। খুঁজছেন সেই, কালসমুদ্রে কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গমাতা কোথায়। সহসা তিনি স্বর্গীয় বাদ্য শুনলেন। দিগন্ত উজ্জ্বল করে সেই বিক্ষুব্ধ জল-রাশির উপর দূরে সুবর্ণমণ্ডিতা দশভুজা মূর্তি ফুটে উঠলো। মা তবে সাড়া দিয়েছেন। এই মৃন্ময়ী মূর্তি, জন্মভূমির মূর্তি, দশ দিকে প্রসারিত দশ বাহুতে নানা আয়ুধে দেশরক্ষা করছে। পদতলে শত্রু বিমর্দিত হচ্ছে। দেবীর বাহন শত্রু-নিপীড়নে নিযুক্ত। একদিকে ভাগ্যরূপিণী লক্ষ্মী, অন্যদিকে বিদ্যা-বিজ্ঞানময়ী বাণী—সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয় ও কার্যসিদ্ধিদাতা গণেশ। এই তো শারদীয়া প্রতিমা, এই তো জন্মভূমির পরিপূর্ণ চিত্র। এই সুবর্ণময়ী বঙ্গ-প্রতিমা।

কমলাকান্ত ভক্তিভরে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে প্রণত হয়ে প্রার্থনা জানালেন, এই বিশ্ববিমোহিনী মূর্তিতে মা যেন জগৎসমীপে আবির্ভূত হ'ন। জননী জন্মভূমির সুবর্ণপ্রতিমা কেন জলতলে থাকবে? ছয় কোটি সন্তান দ্বাদশ কোটি করে পাদপদ্ম পূজা করবে। তারা বন্দনা করবে প্রসূতি অম্বিকার, ধাত্রী-ধরিত্রীর ধনধান্য দায়িকার। জননী শত্রুবধে দশ প্রহরণধারিণী, অনন্তশ্রী, অনন্তকাল স্থায়িনী। যাঁর ছ'কোটি সন্তান তাঁর ভাবনা কী।

কিন্তু দেখতে দেখতে কালসমুদ্রে প্রতিমা ডুবল। কমলাকান্ত অশ্রুপ্লুত নয়নে প্রার্থনা করতে লাগলেন, উঠ মা, উঠ। এবার সুসন্তান হবো, সৎপথে চলবো, ভ্রাতৃবৎসল হবো, তোমায় সুখে রাখবো। কিন্তু বুঝি একার রোদনে সম্ভব নয়। তাই সকলকে ডেকে বললেন, অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে কালসমুদ্র তাড়িত মথিত করে এই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করে এনে আবার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি! যেদিন এই স্বর্ণপ্রতিমা দেশে আবার প্রতিষ্ঠিত হবে, সেদিন বড় পূজার ধূম পড়বে।

একটি গীত—কমলাকান্ত প্রসন্ন গোয়ালিনীকে একটা গান শোনাতে চান, "এসো এসো বঁধু এসো।" ছি-ছি-ছি! প্রসন্ন কি কমলাকান্তের মুখ থেকে এমন গান শুনতে পারে? সে কি তার বঁধু কিন্তু এ তো প্রসন্নর উদ্দেশে গাওয়া নয়, এ যে কীর্তনের গান, সুতরাং প্রসন্নর আর আপত্তি রইলো না। পুরো গানটি সুর-সংযোগে গেয়ে সমাপ্ত করেই আরম্ভ হলো সমালোচনা ও ভাষ্য।

"এসো এসো বঁধু এসো"—বিলাসপ্রিয়ের মুখে এই কথা কমলাকান্তের কাছে দুর্বোধ্য। তিনি বোঝেন, মানুষের জন্ম হয়েছিলো শুধু হৃদয়ে হৃদয়ে মিলনের জন্য। ইহজন্মে মনুষ্যহৃদয়ে একমাত্র তৃষা, অন্য হৃদয় কামনা। এক হৃদয় অন্য হৃদয়কে অনবরত ডাকছে, 'এসো এসো বঁধু এসো'। কেবল মানুষে মানুষে নয়, সারা জগতেই চলেছে এই গীতের অনুরণন, এই পরস্পরকে ডাকাডাকি, গ্রহে গ্রহে, অণুতে অণুতে। প্রকৃতি পুরুষকে ডাকছে 'এসো, এসো বঁধু এসো'। কমলাকান্তের বঁধু কি আসবে?

"আধ আঁচরে বসো।" দূরে নয়, একেবারে কাছে এসে ব'সবার জন্য মিনতি। পরের হৃদয়কে আপন হৃদয়ের অঞ্চলার্ধে বসাবার কামনা।

'নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।" বাঞ্ছিতকে নয়ন ভরে দেখা যে মানুষের হয় না! প্রকৃতিতে ও মানুষের জগতে কতো না সুন্দরের লীলা চলেছে, তাদের কতো কিই না খুঁটিনাটি মানুষের দেখতে ইচ্ছা করে! কিন্তু একে তো দেখাই হয় না, তার উপর নয়ন ভরে দেখা আরও হয় না। ফুল দেখতে দেখতে শুকোয়, পাখী উড়ে যায়, চাঁদ ডুবে যায়। আবার শিশুর হাসি, যুবতীর লজ্জা, প্রৌঢ়ার সামর্থ্য, সবই সংসারের গতির টানে বিলীয়মান। তাই নয়ন ভ'রে দেখার উপায় নেই। আর ঠিক সেই কারণেই ঐ দেখার কামনাটি এমন তীব্র। জগৎ পরিবর্তন-

শীল, নয়নও অতৃপ্ত, অথচ বাসনা, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি !

"অনেক দিবসে, মনের মানসে তোমা ধনে মিলাইল বিধি হে !" এই দিবস-গণনা এর মূলে আছে দুঃখের অবসানে সুখ দেখা দেওয়ার আশা। সুখ আছে বলেই দুঃখীজন দিন গুণে থাকে। দিবস-গণনা দুঃখ বিনোদন। কিন্তু কমলাকান্ত চক্রবর্তী কোন্ সুখের আশায় দিন গুণবেন ? সহসা মনে পড়লো, আছে, তাঁর একটি দুঃখ আছে। একটি আশাও আছে। তিনিও যে দিন গুণছেন ১২০৩ সাল থেকে যে দিন বঙ্গে হিন্দু নাম লোপ পেয়েছে সেই সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গ-বিজয় থেকে। কিন্তু কই ? কমলাকান্তের মনের মানসে বিধি মিললো কই ? তিনি যা চান,—মনুষ্যত্ব, একজাতীয়ত্ব, ঐক্য, বাংলার গৌরব—পেলেন কই ? বিদ্যা কোথায় ? শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, হলায়ুধ, লক্ষ্মণ সেন কোথায় ? সকলেরই ঈপ্সিত মেলে, কমলাকান্তের কি মিলবে না ?

"মণি নও মাণিক নও যে হার ক'রে গলে পরি"—কেন যে বিধাতা জগৎ জড়ময় করেছেন, এই কমলাকান্তের অনুযোগ। কারণ, তা না হলে, জননী-জন্মভূমি যে বঙ্গভূমি কমলাকান্তের বাঞ্ছিত ধন, তাকে তিনি মণি-মাণিক্যের মতো গলার হার করে পরতে পারতেন। তা হলে আর কোনো বিজাতীয় শক্তি এই বঙ্গভূমিকে লাঞ্ছিত করতে পারতো না। তিনি দেশজননীকে সকল দেশে দেখতে পারতেন।

"আমায় নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ।" গোপীর দুঃখ, বিধাতা গোপীকে নারী করেছেন কেন ; নারী না হলে তার হৃদয়বল্লভকে নিয়ে সে দেশ-বিদেশে দেখিয়ে বেড়াতে পারতো। এই থেকে বুঝতে হয়, গোপীর হৃদয়ে সুখের পূর্ণতা, সে সুখ সে সইতে পারছে না বলে অস্থির হয়ে উঠেছে। কিন্তু কমলাকান্তের, তথা, বাঙালীর, এ সুখে অধিকার নেই। তাই, তাদের দুঃখ এই, কেন বিধাতা বাঙালীকে নারী করেননি—তা হলে এ মুখ আর দেখাতে হোতো না ! বাঙালীর জীবন দুর্ভাগ্য-বিড়ম্বিত ও অকৃতার্থ।

"তোমার যখন পড়ে মনে, আমি চাই বৃন্দাবন পানে, আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।" সুখ গেলেও সুখের স্মৃতি যার আছে, যেমন গোপীর ক্ষেত্রে বঁধু চলে গেলেও আছে, স্মৃতি-জাগানো বৃন্দাবন, সে একরকম সুখী বৈকি। কিন্তু যার সুখও গেছে, সুখের নিদর্শনও গেছে, যার বঁধুও গেছে, বৃন্দাবনও গেছে, তার দুঃখের সীমা নেই। সে অনন্ত দুঃখী। বঙ্গ-প্রাণ কমলাকান্তের বাংলার স্বাধীনতা-সুখ অবলুপ্ত, স্মৃতিমাত্র অবশেষ, কিন্তু নিদর্শন কই ? অনেক অনুসন্ধানে তিনি খুঁজে পেলেন, এক শ্মশান-ভূমি আছে,—নবদ্বীপ ;—সেই যেখান থেকে লুপ্ত হয় বঙ্গমাতার রাজলক্ষ্মীরূপ। সে নবদ্বীপ নেই, কিন্তু সেই গঙ্গা তো আছে যে ঐ পুণ্যধামের সেবায় ছিল অনন্তপ্রবাহিত। কলনাদিনী সেই গঙ্গাকে ক্ষুব্ধহৃদয় কমলাকান্তের বিশ্বাসঘাতিনী মনে হয়। কেন সে এখনও কলতানে

সকলকে মুগ্ধ করে ? মানস-চক্ষে দুঃস্বপ্নের মতো কমলাকান্ত দেখতে পান সেই বিভীষিকা—সেই বঙ্গরাজলক্ষ্মীর অন্তর্ধান। তাঁর মনে হয়, ওই গঙ্গার অতল জলেই সেই স্বর্ণপ্রতিমা রয়েছে নিমজ্জিত, না হলে, তাঁর দেশলক্ষ্মী গেলেন কোথায় ?

বিড়াল—কমলাকান্ত আপন শয়নগৃহে চারপায়ার উপর সুখে নেশার ঘোরে যখন নেপোলিয়ান হয়ে ওয়াটার্লুজয়ের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন তখন সহসা একটি শব্দ হলো 'মেও'। কমলাকান্তের দুধটুকু উদরসাৎ করে বিড়াল পরিতৃপ্ত হয়ে এই শব্দ করেছে। কমলাকান্ত লাঠি দিয়ে বিড়ালকে তাড়না করতে মনস্থ করে-ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হয়ে শুনলেন, বিড়াল বলছে—মারপিট কেন ? এ সংসারের সমস্ত ভাল ভাল জিনিস কি শুধু তোমরাই খাবে ? আমরা কি কিছুই পাব না ? তোমাদের ক্ষুধা আছে, আমাদের কি ক্ষুধা নেই ? তোমার দুধে আমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হলো। সুতরাং তোমার পরোপকার সিদ্ধ হয়েছে, তোমার পুণ্য হয়েছে। আমি তোমার ধর্মসঞ্চয়ের মূল কারণ। তবে আমি যে চোর হয়েছি সে তো স্বেচ্ছায় হইনি। খেতে পেলে কে আবার চোর হয় ? নিজের ভাঁড়ারে যিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সঞ্চয় করে রেখেছেন, তা থেকে এক কণা কাউকে দিচ্ছেন না, চোর তো তিনিই সৃষ্টি করছেন। কৃপণ-ধনী চোরের অপেক্ষাও অনেক বেশী দোষী। তোমাদের উদ্বৃত্ত তোমরা ফেলে দাও, নষ্ট কর, অপচয় কর, কিন্তু আমাদের দাও না। তেলা মাথায় তেল দেওয়া তোমাদের স্বভাব। খেতে বললে যে বিরক্ত হয়, তার জন্য তোমরা ভোজের আয়োজন কর। আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানে তোমার অন্ন খেয়ে ফেলে, চোর বলে তাকে দণ্ড দাও। দেখ, আমাদের চেহারা দেখ। পেট শুকিয়ে গেছে, হাড় দেখা যাচ্ছে, জিব ঝুলে পড়েছে। আমাদের কালো চামড়া দেখে ঘৃণা করো না। এই পৃথিবীর মৎস্য-মাংসে আমাদেরও কিছু অধিকার আছে। খেতে দাও, নইলে চুরি ক'রবো।

কমলাকান্ত বিড়ালকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। চুরি করলে সমাজে বিশৃঙ্খলা বাড়বে। সমাজে ধনসঞ্চয় হবে না। কিন্তু বিড়াল হটলো না। সে বলে, সমাজে ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হলে দরিদ্রের ক্ষতি কি ? কমলাকান্ত দেখলেন, বিড়ালটি বেজায় তার্কিক। একে ফাঁকি দিয়ে কিছু বোঝানো যাবে না। তার এই সমস্ত কথা অতি নীতিবিরুদ্ধ এই বলে উপদেশ দিয়ে তার সঙ্গে আপস করবার চেষ্টা করলেন। তিনি তাকে হাঁড়ি না-খাওয়ায় উপদেশ দিলে সে জানালো যে, ক্ষুধা অনুসারে তা বিবেচিত হবে।

ঢেঁকি—ঢেঁকিকে কমলাকান্তের লোকহিতব্রতধারী মহাপুরুষ বলে মনে হয়, মনে হয়, আর্যসভ্যতার বিশেষ ফলস্বরূপ, কারণ তারই মহিমায় ধান থেকে চাল হয়।

ঢেঁকির এই পরোপকার-প্রবৃত্তির কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে কমলাকান্ত দেখলেন যে, সে পুনঃপুনঃ খানায় পড়ছে। এই দেখে প্রথমে তাঁর মনে হল খানায় পড়াই বুঝি পরার্থপরতার উৎস। কিন্তু প্রথমে এক মাতালের নিয়মিত খানায় পড়ার দৃষ্টান্ত ও পরে মঙ্গলা 'গাইয়ের তাড়ায় তাঁর নিজেরই একবার ভূপাতিত হওয়ার দৃষ্টান্ত থেকে তিনি বুঝলেন, খানায় পড়াই কখনও ঢেঁকির অপরিমেয় মাহাত্ম্যেরও পরোপকারের কারণ হতে পারে না।

এমন সময় বামাকণ্ঠের আহ্বানে চকিত হয়ে দেখলেন যে, তরঙ্গিণী, মাতঙ্গিনী দুইবোনে মিলে ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে। কখন তিনি বুঝলেন যে, রমণী-পাদপদ্মই ঢেঁকির মাহাত্ম্যের কারণ। সুন্দরীর শ্রীচরণের মৃদু বা কঠিন স্পর্শ লাভ করেই সে ধান ভানে। বলতে কি, এই ধান-ভানা তার এমনই প্রকৃতিগত হয়ে গেছে যে. সে স্বর্গে গিয়েও ধান না ভেনে থাকতে পারে না।

কমলাকান্ত ঢেঁকির সঙ্গে সদালাপ সুরু করতে চাইলেন, কিন্তু ঢেঁকি তাঁর কথার উত্তর দিল না। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করলেন এবং চারপায়ার উপর শয়ন করে আফিম চড়ালেন। তখন তাঁর দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল।

কমলাকান্ত দেখলেন যে, এই সংসার কেবল ঢেঁকিশাল। সমগ্র জগৎ ঢেঁকিশালেরই ছদ্মরূপ। কোথাও জমিদাররূপ ঢেঁকি প্রজাদের হৃৎপিণ্ড গড়ে পিষে নূতন নিরিখরূপ চাল বার করে সুখে সিদ্ধ করে অন্ন ভোজন করছেন। কোথাও আইনকারক ঢেঁকি মিনিট-রিপোর্টের রাশি গড়ে পিষে ভেঙে বার করছেন আইন; বিচারক ঢেঁকি সেই আইনগুলো গড়ে পিষে বার করছেন—দারিদ্র্য, কারাবাস—ধনীর ধনান্ত, ভাল মানুষের দেহান্ত। বাবুঢেঁকি বোতল গড়ে পিতৃধন পিষে বার করছেন পিলে যকৃৎ, আর গৃহিণী ঢেঁকি একাদশীর গড়ে বাজার খরচ পিষে বার করছেন অনাহার। সর্বাপেক্ষা ভয়ানক লেখক ঢেঁকি, সাক্ষাৎ মা সরস্বতীর মুণ্ড ছাপার গড়ে পিষে বার করছেন—স্কুল বুক।

কমলাকান্ত দেখলেন তিনি নিজেও ঢেঁকিবিশেষ; নেশার গড়ে মনোদুঃখ ধান্য পিষে দপ্তর চাল বার করছেন। এই চালের অভিনবত্ব দেখে তাঁর মনে অহঙ্কার জন্মালো; তিনি স্বর্গে ধান ভানবার উদ্দেশ্যে গেলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে বাক্যকৌশলে মুগ্ধ করে একসের অমৃত ও একঘণ্টা উর্বশীর গীত পুরস্কার লাভ করলেন। অবশ্য নেশাটা কেটে গেলে তিনি দেখলেন যে, একসের দুধ নিয়ে প্রসন্ন গোয়ালিনী তাঁকে কটূক্তি করছে। তিনি বললেন 'বাইজী'! এক ঘণ্টা হয়েছে—এখন বন্ধ কর।'

(১০)

কমলাকান্তের পত্র—বস্তু-সংক্ষেপ

"কমলাকান্তের দপ্তর-এর পরিশিষ্টে "কমলাকান্তের পত্র" সংকলিত হয়েছে।

রচনার form বা রূপকল্প হিসাবে পত্রের রীতি গ্রহণ নূতন নয়, এর পূর্বে অনেকে তা করেছেন। 'দপ্তর' ও 'পত্র' রচনার উদ্দেশ্য আসলে একই। "কমলাকান্তের দপ্তর"-এর জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করেই হয়ত বঙ্কিমচন্দ্র এই জাতীয় রসরচনার আর একটি সঙ্কলন প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন—'কমলাকান্তের পত্র" সম্ভবতঃ তারই সূচনা। এর সার্থকতা রচনার রস-সম্ভোগে।

প্রথম সংখ্যা

কি লিখিব ?

দীর্ঘকাল ব্যবধানে কমলাকান্ত বঙ্গদর্শন সম্পাদকের কাছে যে প্রথম পত্র পাঠান তার উদ্দেশ্য ছিল কী জতীয় রচনা লিখলে প্রয়োজনমত আফিম পাওয়া যেতে পারে, তাই জানতে চাওয়া। তিনি জানতেন না যে, তাঁর দপ্তরটি ভীষ্মদেব খোসনবিস বঙ্গদর্শন সম্পাদকের নিকট বিক্রী করে দিয়েছেন। আসল কথা, তীর্থদর্শনে যাওয়ার সময় কমলাকান্ত সেটি খোসনবিসের কাছে গচ্ছিত রেখে যান। খোসনবিস জুয়াচোর লোক, গচ্ছিত বস্তু বিক্রী করেছেন। কমলাকান্ত জানতে পারলেন যখন তিনি ছাপার কাগজে বাঁধা এক জোড়া জুতো কিনে নিয়ে আসেন। দেখে তাঁর মনে হচ্ছিলো, কে এই ভাগ্যবান লেখক যাঁর রচনা শ্রীমৎ কমলাকান্ত শর্মার পাদুকা দুটিকে মণ্ডিত করেছে। কাগজখানি পড়ে দেখলেন, উপরে লেখা রয়েছে 'বঙ্গদর্শন' এবং ভিতরে লেখা রয়েছে—'কমলকান্তের দপ্তর'। তখন কমলাকান্ত বুঝলেন যে, তাঁর লেখনীধারণ এতদিনে সার্থক হলো।

বঙ্গদর্শন-টা কী জানবার জন্য কৌতূহলী হয়েই তিনি সংগ্রহ করেন অনেক কৌতুকাবহ তথ্য, অবশেষে খাঁটি করে জানতে পারেন যে, এটি একটি মাসিক পত্রিকা এবং তাতে কমলাকান্তের লেখা মাসে মাসে বেরোয়।

কমলান্তের এই পত্রের কারণ হলো, তাঁর এত কালের পৃষ্ঠপোষক নসীবাবু ইহধাম পরিত্যাগ করেছেন। তাঁর আফিমের বড় গোলযোগ ঘটেছে। লেখার দরুণ যদি এক-আধপোয়া করে আফিম পাওয়া যায়, তবে নিয়মিত লেখা যোগানো সহজ হয়, অধিকন্তু সম্পাদক কমলাকান্তের মঙ্গলকামনাও লাভ করতে পারেন। তবে উভয়ের মধ্যে বোঝাপড়া সহজ করার জন্য কমলাকান্ত জানাতে চান, তাঁর কমলা-কান্তি কলে ফরমাস-মতো সব রকম লেখাই তৈরি হয়। নাটক, নভেল, পলিটিকস্, ঐতিহাসিক গবেষণা, সাহিত্য-সমালোচনা, বিজ্ঞান, ভূগোল সব জিনিসই তিনি লিখতে পারেন। গুরু, লঘু সব রকম প্রবন্ধই তিনি পাঠাতে পারেন। সম্পাদক যদি কোটেশান বা ফুটনোট ভালোবাসেন তবে কমলাকান্ত তাও প্রচুর যোগাতে পারেন। বহু রকমের ভাষা থেকে তাঁর কোটেশান সংগ্রহ করা আছে। গুরু

বিষয়ের মধ্যে ইতিহাস, পাটীগণিত, জ্যামিতি বা ত্রিকোণমিতি প্রভৃতিতেও লেখা পাওয়া যেতে পারে। এবিষয়ে তাঁর সহায়ক ভীষ্মদেবের পুত্রের কথাও জানানো হয়েছে। এম্. এ. পাস গবেষক এই পণ্ডিতপ্রবর অদ্ভুত গবেষণা বলে তিনি চিতোরের রাজা আলফ্রেড দি গ্রেটের জীবন-চরিত লিখেছেন, ও বাঙলা সাহিত্য বিষয়ক একটি গ্রন্থ মহাভারত থেকে সঙ্কলিত করেছেন, স্পেনসার ও ডার্‌-উইন-তত্ত্বের সঙ্গে সংস্কৃত নাটকের শ্লোক মিলিয়ে এমন একটি গুরুবিষয়ক গবেষণাগ্রন্থ লিখে ফেলেছেন যে, বাংলাভাষায় আর তার জুড়ি নেই।

নাটকের ছাঁচ হিসেবে জানিয়েছেন, বিষয়বস্তু কিছু ঠিক হয়নি বটে, তবে নায়ক-নায়িকার মানান-সই নাম যথা ভীমসিংহ ও শশিরম্ভা দেওয়া হয়েছে; আটটা 'হা সখি' এবং তেরোটি 'কি হলো! কি হলো!' থাকবে তা ঠিক হয়েছে, আর সব শেষের দৃশ্যে ঠিক হয়েছে নায়িকা নায়কের বুকে ছুরিকাঘাত করার পরেই—ছুরি হস্তে গান গাইতে থাকবে!

নবেলের ছাঁচও চিত্তাকর্ষক। যদিও পড়াশুনো কিছুই নেই, তবু 'ডন্ কুইক্‌সোট'—প্যাটার্ণের কিম্ভূতকিমাকার একটা কিছু খাড় করা খুবই চলবে। না হয়, যে কোনো এক ধরনের অপরের লেখার—যেমন মেকলের 'এসেস'—একটা পরিশিষ্ট লিখে দিলেও নবেল হতে পারে।

কাব্য চাইলে অবশ্য আগেই বলে দিতে হবে যে তা মিল না অমিল। সমিল ছন্দ হবে না, অমিল যত খুশি লেখা যেতে পারে। মেঘনাদবধের অনুকরণে জীমূতনাদবধ বলে তার একখানি কাব্যের প্রথম খণ্ড লেখাই আছে। রচনার বিষয়ের জন্য কোনো চিন্তা নেই—আফিম-এর বিনিময়ে কমলাকান্ত সবই লিখতে প্রস্তুত।

দ্বিতীয় সংখ্যা

পলিটিক্‌স্

বঙ্গদর্শনের সম্পাদকের কাছ থেকে প্রার্থিত আফিম এসে পৌঁছেছে, আর এসেছে পলিটিক্‌স্ সম্বন্ধে কিছু লেখবার ফরমাস। এতেই কমলাকান্ত কিঞ্চিৎ বিরূপ। কারণ, কী ধারণায় সম্পাদক এমন অদ্ভুত ফরমাস করেছেন। রাজা, খোসামুদে, জোচ্চোর, ভিক্ষুক বা সম্পাদক ভিন্ন কেউ পলিটিক্‌স্ লিখতে পারে না। বঙ্গদর্শন সম্পাদক জানেন না যে, কমলাকান্ত শর্মা উচ্চাশয় কবি, কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবী পলিটিশ্যান নয়।

মন শান্ত করবার জন্য সামনেই দেখলেন, শিবে কলুর বাড়ীর উঠোনে বলদেরা নিশ্চিন্ত মনে নাদায় মুখ ডুবিয়ে ভোজন-সুখ উপভোগ করছে। এখানে তো পলিটিক্‌সের বিকার প্রবেশ করতে পারে না ভেবে এই বিকার সম্বন্ধে খুশি-

মতো তর্কবিতর্ক মনে আনছিলেন। তাঁর ইচ্ছা হচ্ছিল পলিটিক্‌স্‌ ওয়ালাদের উপদেশচ্ছলে বলেন, বাপু হে, পেয়াদারও শ্বশুরবাড়ী আছে, কিন্তু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে পরাভূত করে সে-জাতির পলিটিকস্‌ থাকতে পারে না। 'জয় রাধেকৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো!' এই এদের একমাত্র পলিটিক্‌স্‌! অন্য পলিটিক্‌স্‌ যে গাছে ফলে তার বীজ এ মাটিতে লাগবার সম্ভাবনা নেই।

হঠাৎ কমলাকান্তের চোখ পড়লো কলুর পৌত্র এক কাঁসি ভাত এনে উঠোনে বসে খাচ্ছে, দূর থেকে একটা কুকুর তা দেখতে পেয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। কলুর পৌত্র ভাত খেয়ে চলছে, আর কুকুরটা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখে, একপা একপা করে এগিয়ে এসে ভাতের থালার কাছে হাজির হলো। কলুর পৌত্র কিছু বলে না, কুকুরও কাছে এসে ন্যাজ নাড়ে। কুকুরের পাতলা পেট, রোগা শরীর, কাতর দৃষ্টি ও ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়া দেখে কলুর পৌত্র একখানা মাছের কাঁটা কুকুরের দিকে ফেলে দিলো। কমলাকান্ত দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেলেন, এই তো পলিটিক্‌স্‌,—এই কুকুর তো পলিটিসিয়ান! তার পলিটিক্যাল চা'ল ফলাতে শুরু করেছে। সাহস পেয়ে কুকুর আরও একটু এগুলো। মনোযোগ আকর্ষণ ক'রবার জন্য একটু একটু শব্দ করতে লাগলো। ভাবটা এই—যা দিয়েছো তাতে পেট ভরেনি। কলুর পৌত্র আর একবার চেয়ে এক মুঠো ভাত কুকুরকে ফেলে দিলো—কুকুরের তো মহা আনন্দ। এমন সময় কলুগিন্নী ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলো যে, তার পৌত্রের কাছে একটা কুকুর বসে ভাত খাচ্ছে। প্রচণ্ড ক্রোধে সে কুকুরটাকে ঢিল ছুঁড়ে মারলো, আহত হয়ে কুকুর রাগ-রাগিণী আলাপচারী করতে করতে ন্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে গেল।

ঠিক এই সময়ে আর একটি দৃশ্য কমলাকান্তের চোখে পড়লো। বলদগুলোর সেই খোলবিচালিপূর্ণ নাদায় কোথা থেকে এক বিরাট ষাঁড় এসে মুখ ডুবিয়ে জোর করে খেতে শুরু করেছে। ষাঁড়ের রুদ্র মূর্তি ও ভীষণ শৃঙ্গের ভয়ে বলদেরা সরে দাঁড়িয়েছে। কলুগিন্নী একখানা বাঁশ নিয়ে ষাঁড় তাড়াতে গেল, কিন্তু ষাঁড় ক্ষিপ্ত হয়ে শিং উঁচিয়ে দেহে শৃঙ্গাগ্রভাগ প্রবেশ করাবার এমন ভীতি দেখলো যে, কলুগিন্নী তখন পালিয়ে বাঁচে। ষাঁড়টি সমস্ত খোলবিচালি উদরসাৎ করে ধীরে ধীরে হেলতে দুলতে স্বস্থানে চলে গেল।

এও আর এক ধরনের পলিটিক্‌স্‌। পৃথিবীতে যত পলিটিসিয়ান আছে তাদের কেউ কুকুর-জাতীয়, কেউ বা বৃষ-জাতীয়। বিসমার্ক ও গর্শাকভ বৃষ জাতীয় পলিটিশ্যান, আর উলসি থেকে রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর কুকুরের দলের পলিটিশ্যান।

তৃতীয় সংখ্যা

বাঙালির মনুষ্যত্ব

কমলাকান্তের অনেক শত্রু, তাঁর লিখবার অনেক বাধা। মানুষের সঙ্গ এড়িয়ে আপন মনে খুশি থাকবার জন্য কমলাকান্ত কয়েকটি ফুলের গাছ লাগালেন। গাছে ফুল ফুটল, কিন্তু ফুল দেখে ভোমরার দল ঝাঁকে ঝাঁকে কমলাকান্তের দ্বারে এসে গুন্ গুন্ ঘ্যান্ঘ্যান্ করতে লাগলো। কমলাকান্তের ঘর তো আর সভা, লীগ, সোসাইটি বা ক্লাব নয়—এ-ঘরে ভ্রমরের এত ঘ্যান্ ঘ্যান্ উৎপাত কেন? কিন্তু ভ্রমর তো গেলই না, উপরন্তু কমলাকান্তের কানের কাছে নানাভাবে ঘুরে ঘুরে নানাপ্রকার শব্দ করতে লাগলো। অগত্যা ভ্রমরের জ্বালাতনে অস্থির হয়ে কমলাকান্ত পাখা নিয়ে ভ্রমর তাড়াতে ব্যস্ত হলেন। কিন্তু তাঁর সাধ্য কি? ভ্রমরের আক্রোশ যেন বেড়ে গেল। ভ্রমর কমলাকান্তের নাকমুখ বেষ্টন করে শব্দ করতে লাগলো—কখনও মাথার চুলের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

চৌকাঠ পায়ে বেধে কমলাকান্ত পড়ে গেলেন। এই অবস্থায় আফিমের প্রসাদে দিব্যকর্ণ লাভ করে তিনি শুনতে পেলেন ভ্রমর বলছে—আমার ঘ্যান্ঘ্যানানিতে তুমি এত চটছো কেন? তোমাদের বাংলাদেশে ঘ্যান্ঘ্যান্ করে না কে? বাঙালির একমাত্র ব্যবসাই তো ঘ্যান্ঘ্যান্ করা। রাজা-মহারাজেরা বড়লাটের কাছে গিয়ে ঘ্যান্ঘ্যান্ করছেন। উমেদার ও চাকুরী-প্রার্থী দিবারাত্রি ঘ্যান্ঘ্যান্ করছে। যিনি স্বাধীন ব্যবসা করেন তাঁরও ঘ্যান্ঘ্যানানির অন্ত নেই। ঘ্যান্-ঘ্যান্ করবার সনদ নিয়ে উকীলবাবু ছোটো-বড়ো আদালতে ঘ্যান্ঘ্যানানির ফোয়ারা খুলে দিয়েছেন। কেউ বা ভাবছেন ঘ্যান্ঘ্যান্ করেই দেশোদ্ধার করবেন। কোনো শোকসভায় ঘ্যান্ঘ্যানানির অন্ত থাকে না। যাঁরা লেখক তাঁদের তো ঘ্যান্ঘ্যান্ করাই পেশা। কমলাকান্ত নিজেই তো একটু আফিমের প্রত্যাশায় বঙ্গদর্শনের স-পাদকের কাছে ঘ্যান্ঘ্যান্ করছেন।

বাস্তবিকই বাঙালির ঘ্যান্ঘ্যান্ ভ্রমরের অসহ্য হয়ে উঠেছে। ভ্রমর পতঙ্গ মাত্র। কিন্তু সে কেবল ঘ্যান্ঘ্যানই করে না—সে মধু সংগ্রহ করে ও প্রয়োজনমত হুল ফোটায়। বাঙালি না পারে মধু সংগ্রহ করতে, না পারে হুল ফোটাতে। কোনো কাজকর্ম নেই কেবল দিনরাত কাঁদুনে মেয়ের মত ঘ্যান্ঘ্যান্ করে চলেছে। লেখালেখি বকাবকি একটু কম করে ভ্রমর কমলাকান্তকে কাজে মন দেওয়ার উপদেশ দিয়ে উড়ে গেল।

কমলাকান্ত ভাবলেন—ভ্রমর কথাগুলো বলে বিশেষ বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে। না দেবেই বা কেন, কারণ ভ্রমরের পদবৃদ্ধির তুলনা নেই। এর একখানি নয়, দুখানি নয়, ছ'খানি পা।

এই বিজ্ঞ পতঙ্গের পরামর্শ অনুসারে কমলাকান্ত ঘ্যান্ঘ্যান্ করা বন্ধ

রেখেছেন। কেবল বঙ্গদর্শন সম্পাদকের কাছ থেকে কিছু অহিফেন-মধু সংগ্রহের আশা রাখেন।

চতুর্থ সংখ্যা

বুড়ো বয়সের কথা

কমলাকান্ত বুড়ো বয়সের কথা লিখছেন। কিন্তু তাঁর আশঙ্কা আছে নিজের কাছে এই কথা ভাল লাগলেও হয়তো বুড়ো বয়সের কথার পাঠক জুটবে না।

কমলাকান্ত একেবারে মৃত্যুর দ্বারে উপনীত না হলেও তাঁর যৌবন অতিক্রান্ত হয়েছে। শেষের দিনের পাথেয় এখনও সংগ্রহ করা হয়নি। জীবনের ধারদেনা এখনও সম্পূর্ণ শোধ করা হয়নি।

একটা কথা আগে মীমাংসা করা প্রয়োজন—বৃদ্ধ কাকে বলে? একটা বিশেষ বয়স হলেই কি মানুষ বৃদ্ধ হয়? যার চুল পাকেনি, দাঁতও পড়েনি, যার প্রতিরাত্রেই সুনিদ্রা হয়—সেই কি যুবক? আসল কথা কেউ চল্লিশে বৃদ্ধ হয়, কেউ বিয়াল্লিশেও যুবক থাকে। প্রাচীনতা বয়সেরই ফল—ব্যক্তিবিশেষের প্রকৃতি-ভেদে কিছু কিছু তারতম্য ঘটে। যে পঁয়ত্রিশে বৃদ্ধ সাজে, তার ব্যক্তিগত কারণ আছে। হয়তো জীবনে তার দুঃখ অনেক। যে পঁয়তাল্লিশেও যুবক সেজে বেড়ায় তার ব্যক্তিগত পরিবেশ ও মানসিক প্রবণতা এর জন্য দায়ী।

প্রথম চশমাখানি রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে যদি নিজেকে জিজ্ঞাসা করা যায় —বুড়ো হয়েছি কি—তবে কি উত্তর পাওয়া যাবে? নিজেকে তো বুড়ো বলে স্বীকার করতে মন চায় না। চোখের না হয় সামান্য দোষ হয়েছে, চুল না হয় দু' একগাছা পেকেছে—কিন্তু পৃথিবী তো আগের মতই নবীন আছে—কোকিলের স্বর তো তেমনি ভাল লাগে—পুষ্পের গন্ধ ও বৃক্ষের শ্যামশোভা তো আগের মতই আনন্দ দেয়। সবই তেমনি আছে আর আমিই কি বুড়ো হয়ে গেলাম! জগতে আলোকের সীমা নেই আর কেবল আমার পক্ষেই অন্ধকার হয়ে গেল! মন সায় দেয় না, বৃদ্ধ হয়েছি বলে স্বীকার করতে ইচ্ছা হয় না।

কিন্তু স্বীকার না করলে কি হবে? দিনে দিনে ধীরে ধীরে বয়স এসে গোপনে দেহের মধ্যে প্রবেশ করছে, প্রতি নিশ্বাসে বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। নিজে বুঝতে না পারলেও অপরের কাছে এটা গোপন থাকে না।

জীবনের যারা সঙ্গী ছিল তারা কেউ বিদায় নিয়েছে, কেউ বার্ধক্যের প্রভাবে শুকিয়ে উঠছে। উজ্জ্বল রঙ্গমঞ্চের দীপগুলো একে একে নিভে যাচ্ছে হৃদয়েরও পরিবর্তন হচ্ছে। কার দোষে এ সব ঘটছে? কারও দোষ নয়— বয়সের দোষে বা যমের দোষে।

একা এসেছি একা যাব তাতে ভাবনা কি? লোকালয়ের সঙ্গে বনল না, তাতে কার কি ক্ষতি? পঞ্চাশ পার হলেই সংসার ত্যাগ করে বনে যাবে এ কথাটি তেমন যুক্তিযুক্ত নয়। আবার বনে যেতে হবে কেন? এ সংসারই তো বন, যেখানে কারুও সঙ্গে কোনো সহৃদয়তা নেই। বিপদের দিনে কেউ এসে বুড়ো বলে কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ চাইতে পারে, কিন্তু আনন্দের দিনে বুড়ো এসে আনন্দবর্ধন করুক, এ কেউ চাইবে না—তুমি তখন উৎপাত—সংসারে তো এই অবস্থা, তবে সংসারে ও অরণ্যে তফাৎ কোথায়!

আগে তুমি ভালবাসার অকাঙ্ক্ষা করতে, এখন তুমি কেবল ভয় ও ভক্তির পাত্র। যে পুত্র শৈশবে তোমার সঙ্গে একশয্যায় শুয়ে ঘুমের ঘোরে তোমাকে জড়িয়ে ধরতো, সে এখন লোকমুখে সংবাদ নেয় বাবা কেমন আছেন। যাকে তুমি প্রথম লেখাপড়া শিখিয়েছিলে, সে এখন তোমার অজ্ঞতা দেখে মনে মনে পরিহাস করে। যার স্কুলের বেতন তুমি এক সময় জুগিয়েছিলে সে এখন টাকা ধার দিয়ে তোমার কাছে সুদ চায়—এই যদি সংসারের অবস্থা, তবে অরণ্যের আর বাকি কি?

বাইরের পরিবর্তন লক্ষ্য কর সেখানেও একই অবস্থা। তুমি সেখানে নানারকম ফুলের গাছ সংগ্রহ করে বড় আশায় নিজ হাতে প্রত্যহ জল দিতে, সেখানে হারাধন পোদ ছোলামটরের চাষের জন্য লাঙ্গল দিয়ে জমি চষছে। যৌবনে যে গৃহ বড় আশায় তুমি নির্মাণ করেছিলে, সেই গৃহের অভ্যন্তরে বড় সাধে যে খাট পেতেছিলে হয়ত দেখবে সেই গৃহের ইটগুলি দাসু ঘোষের কলে গুঁড়িয়ে সুরকি করা হচ্ছে আর তোমার সেই সাধের পালঙ্কের কাঠ দিয়ে পাচিকা ভাতের হাঁড়িতে জ্বাল দিচ্ছে। সর্বাপেক্ষা বিপদের কথা হলো এই যে, যৌবনে যাকে দেখতে সুন্দর লাগে, বার্ধক্যে সেই কুৎসিত হয়ে দাঁড়ায়। নারী, পুরুষ সকলেরই এই এক অবস্থা। তরঙ্গিনী যৌবনে যখন বাগানে ফুল চুরি করতে আসত তখন তাকে দেখলে কার না ভাল লাগত? কিন্তু সেই তরঙ্গিনী বয়সের ধর্মে গদার মা হয়েছে। তার দীর্ঘ দেহ কৃশ ও কৃষ্ণ, তার পাকাচুল এবং কুঞ্চিত চর্ম, তার কর্কশ কণ্ঠ শুষ্ক বাহু দেখে কে বুঝতে পারে যে, এককালে এই যুবতীর রূপের তুলনা ছিল না।

বৃদ্ধগণ যদি সংসার ত্যাগ করে বনে যেতেন তবে সংসারের অবস্থা যে কেবল ভাল হতো তা নয়, বৃদ্ধ বয়সেও বহু লোক দেশের ও জাতির স্থায়ী কল্যাণ সাধন করেছেন। জার্মান জাতির ঐক্য-বিধায়ক বিসমার্ক ও ফ্রেদারিক, ইংলণ্ডের দুজন অতি প্রসিদ্ধ নেতা গ্ল্যাডস্টোন ও ডিসরেলি বৃদ্ধ বয়সেই দেশের সর্বোত্তম উপকার করেছেন। প্রাচীন বয়সই জ্ঞানকর্মের সময়। যৌবনকে কর্মের সময় বলা হয় বটে, কিন্তু যৌবনে কাজ ভাল হয় না, বুদ্ধি তখন কাঁচা থাকে, থাকে রিপুর প্রবলতা। যৌবন অতিক্রান্ত হলে মানুষের বহুদর্শিতা জন্মে, বুদ্ধি স্থির

হয়, প্রতিষ্ঠার লোভ থাকে না, রিপুও প্রশমিত হয়।

সাধারণতঃ দেখা যায়, মানুষ আমরণ বিষয়কর্মেই ব্যাপৃত থাকে। কিন্তু কমলাকান্তর কথা হলো বার্ধক্যে পরের জন্য কিছু কাজ করতে হবে। অনেকে হয়ত বলবে, নিজের কাজই করে উঠতে পারা গেল না পরের কাজ করা হবে কখন? নিজের কাজ কি শেষ হয়! মানুষ যদি লক্ষ বছর বাঁচত তবু তার নিজের কাজ শেষ হত না। কিন্তু বার্ধক্য এলে নিজের কাজ শেষ হয়েছে মনে করে পরের কাজে রত হওয়া—এই হলো যথার্থ মুনিবৃত্তি।

সারাজীবন যদি এইভাবে কাজই করা হয়, বার্ধক্যেও যদি কাজের বিরাম না থাকে তবে পরলোকের কাজ-ঈশ্বরচিন্তা মানুষ করবে কখন? কমলাকান্ত বলেন, পরকালের কাজ অর্থাৎ ঈশ্বরচিন্তা শৈশব থেকে জীবনভোরই কর্তব্য। যে কাজ সকল কাজের উপর সে কাজ কি কেবল বার্ধক্যের জন্য ফেলে রাখা ভাল? শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, বার্ধক্যে সব সময়ই ঈশ্বরকে ডাকবার সময়। এর জন্য কোনো অবসরের প্রয়োজন নেই, এর জন্য অন্য কোনো কাজের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু হয়তো এসব কথা অনেকেরই ভালো লাগছে না। তরঙ্গিণী যুবতীর কথা হ'তে হ'তে আবার ঈশ্বরপ্রসঙ্গ কেন? পাঠকের ভাল লাগুক বা না লাগুক কমলাকান্তের আর কোনো উপায় নেই। যৌবন-সৌন্দর্য আর কমলাকান্তকে মুগ্ধ করতে পারে না। দর্শনের তত্ত্বানুসন্ধিৎসা বার্ধক্যের দ্বারে উপনীত কমলাকান্তের হৃদয়ে আর আনন্দ দিতে পারে না। জীবনের সায়াহ্নে উপনীত হয়ে কমলাকান্ত অনুভব করছেন, ভবিষ্যতে দিকচিহ্নহীন, অন্ধকারের মধ্যে ভগবানই একমাত্র আশ্রয়। তিনি একমাত্র গতি। তিনি ছাড়া আর কেউ ত্রাণকর্তা নেই।

পঞ্চম সংখ্যা

কমলাকান্তের বিদায়

কমলাকান্ত বিদায় নিচ্ছেন। কারও সঙ্গে তাঁর বনলো না। পাঠকের সঙ্গে যেখানে লেখকের বনে না, সেখানে আর লিখে লাভ কি! বাঁশীর সুর নেই; সে রস নেই আর বাঁশী বাজিয়ে লাভ কি! শুনবে কে? সকলেই নিজের নিজের চিন্তায় ব্যস্ত, এখন কমলাকান্তের কথা বা বক্তব্য—গলাভাঙ্গা কোকিলের রব কে শুনবে?

বঙ্গদর্শন থেকেও কমলাকান্ত বিদায় নিয়েছেন। কমলাকান্ত চিরদিনই একা, চিরদিনই নিঃসঙ্গ। কিন্তু যৌবনের আনন্দ স্মরণ করে কমলান্ত এখন নির্জনে কাঁদতে চাইছেন—লেখবার আর ইচ্ছা নেই।

প্রমীলা ভবন
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড, বারাসত।

শ্রীভবানীগোপাল সান্যাল

কমলাকান্তের দপ্তর

(তৃতীয় সংস্করণ)

উৎসর্গ

পণ্ডিতাগ্রগণ্য

শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন মহাশয়কে

এই গ্রন্থ

প্রণয়োপহার স্বরূপ

অর্পিত

হইল।

কমলাকান্তের দপ্তর

অনেকে কমলাকান্তকে পাগল বলিত। সে কখন্ কি বলিত, কি করিত, তাহার স্থিরতা ছিল না। লেখাপড়া না জানিত, এমত নহে। কিছু ইংরেজি, কিছু সংস্কৃত জানিত। কিন্তু যে বিদ্যায় অর্থোপার্জ্জন হইল না, সে বিদ্যা কি বিদ্যা? আসল কথা এই, সাহেব সুবোর কাছে যাওয়া আসা চাই। কত বড় বড় মূর্খ, কেবল নাম দস্তখত করিতে পারে,—তাহারা তালুক মুলুক করিল—আমার মতে তাহারাই পণ্ডিত। আর কমলাকান্তের মত বিদ্বান্, যাহারা কেবল কতকগুলা বহি পড়িয়াছে, তাহারা আমার মতে গণ্ডমূর্খ।

কমলাকান্তের একবার চাকরি হইয়াছিল। একজন সাহেব তাহার ইংরেজি কথা শুনিয়া ডাকিয়া লইয়া গিয়া একটি কেরাণীগিরি দিয়াছিলেন। কিন্তু কমলাকান্ত চাকরি রাখিতে পারিল না। আপিসে গিয়া, আপিসের কাজ করিত না। সরকারি বহিতে কবিতা লিখিত—আপিসের চিঠিপত্রের উপরে সেক্ষপীয়র নামক কে লেখক আছে, তাহার বচন তুলিয়া লিখিয়া রাখিত; বিলবহির পাতায় ছবি আঁকিয়া রাখিত। এক বার সাহেব তাহাকে মাস্কাবারের পে-বিল প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিলেন। কমলাকান্ত বিলবহি লইয়া একটি চিত্র আঁকিল যে, কতকগুলি নাগা ফকির সাহেবের কাছে ভিক্ষা চাহিতেছে, সাহেব দুই চারিটা পয়সা ছড়াইয়া ফেলিয়া দিতেছেন। নীচে লিখিয়া দিল "যথার্থ পে-বিল"। সাহেব নূতনতর পে-বিল দেখিয়া কমলাকান্তকে মানে মানে বিদায় দিলেন।

কমলাকান্তের চাকরি সেই পর্য্যন্ত। অর্থেরও বড় প্রয়োজন ছিল না। কমলাকান্ত কখন দারপরিগ্রহ করেন নাই। স্বয়ং যেখানে হয়, দুইটি অন্ন এবং আধ ভরি আফিম পাইলেই হইত। যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিত। অনেক দিন আমার বাড়ীতে ছিল। আমি তাহাকে পাগল বলিয়া যত্ন করিতাম। কিন্তু আমিও তাহাকে রাখিতে পারিলাম না। সে কোথাও স্থায়ী হইত না। এক দিন প্রাতে উঠিয়া ব্রহ্মচারীর মত গেরুয়া-বস্ত্র পরিয়া, কোথায় চলিয়া গেল। কোথায় চলিয়া গেল, আর তাহাকে পাইলাম না। সে এ পর্য্যন্ত আর ফিরে নাই।

তাহার একটি দপ্তর ছিল। কমলাকান্তের কাছে ছেঁড়া কাগজ পড়িতে পাইত না; দেখিলেই তাহাতে কি মাথা মুণ্ড লিখিত, কিছু বুঝিতে পারা যাইত না। কখন কখন আমাকে পড়িয়া শুনাইত—শুনিলে আমার নিদ্রা আসিত। কাগজগুলি একখানি মসীচিত্রিত, পুরাতন, জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা থাকিত। গমনকালে, কমলাকান্ত আমাকে সেই দপ্তরটি দিয়া গেল। বলিয়া গেল, তোমাকে ইহা

বখ্‌শিশ করিলাম।

এ অমূল্য রত্ন লইয়া আমি কি করিব? প্রথমে মনে করিলাম, অগ্নিদেবকে উপহার দিই। পরে লোকহিতৈষিতা আমার চিত্তে বড় প্রবল হইল। মনে করিলাম যে, যে লোকের উপকার না করে, তাহার বৃথায় জন্ম। এই দপ্তরটিতে অনিদ্রার অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ আছে—যিনি পড়িবেন, তাঁহারই নিদ্রা আসিবে। যাঁহারা অনিদ্রারোগে পীড়িত, তাঁহাদিগের উপকারার্থে আমি কমলাকান্তের রচনাগুলি প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম।

শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীস।

প্রথম সংখ্যা

একা

"কে গায় ওই ?"

বহুকাল বিস্মৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় ঐ মধুর গীতি কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। এত মধুর লাগিল কেন? এই সঙ্গীত যে অতি সুন্দর, এমত নহে। পথিক পথ দিয়া, আপন মনে গায়িতে গায়িতে যাইতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি দেখিয়া, তাহার মনের আনন্দ উছলিয়া উঠিয়াছে। স্বভাবতঃ তাহার কণ্ঠ মধুর;—মধুর কণ্ঠে, এই মধুমাসে, আপনার মনের সুখের মাধুর্য্য বিকীর্ণ করিতে করিতে যাইতেছে। তবে বহুতন্ত্রীবিশিষ্ট বাদ্যের তন্ত্রীতে অঙ্গুলিস্পর্শের ন্যায়, ঐ গীতিধ্বনি আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিল কেন?

কেন, কে বলিবে? রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—নদী-সৈকতে কৌমুদী হাসিতেছে। অর্দ্ধাবৃতা সুন্দরীর নীল বসনের ন্যায় শীর্ণ-শরীরা নীল-সলিলা তরঙ্গিণী, সৈকত বেষ্টিত করিয়া চলিয়াছেন; রাজপথে, কেবল আনন্দ—বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, বিমল চন্দ্রকিরণে স্নাত হইয়া, আনন্দ করিতেছে। আমিই কেবল নিরানন্দ—তাই ঐ সঙ্গীতে আমার হৃদয়যন্ত্র বাজিয়া উঠিল।

আমি একা—তাই এই সঙ্গীতে আমার শরীর কণ্টকিত হইল। এই বহু জনাকীর্ণ নগরীমধ্যে, এই আনন্দময়, অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে, আমি একা। আমিও কেন ঐ অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে মিশিয়া, এই বিশাল আনন্দতরঙ্গ-তাড়িত জলবুদ্বুদসমূহের মধ্যে আর একটি বুদ্বুদ না হই? বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র; আমি বারিবিন্দু এ সমুদ্রে মিশাই না কেন?

তাহা জানি না—কেবল ইহাই জানি যে, আমি একা। কেহ একা থাকিও না। যদি অন্য কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল, তবে তোমার মনুষ্যজন্ম বৃথা। পুষ্প সুগন্ধি, কিন্তু যদি ঘ্রাণগ্রহণকর্ত্তা না থাকিত, তবে পুষ্প সুগন্ধি হইত না—ঘ্রাণেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট না থাকিলে গন্ধ নাই। পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।

কিন্তু বারেক মাত্র শ্রুত ঐ সঙ্গীত আমার কেন এত মধুর লাগিল, তাহা বলি নাই। অনেক দিন আনন্দোত্থিত সঙ্গীত শুনি নাই—অনেক দিন আনন্দানুভব করি নাই। যৌবনে যখন পৃথিবী সুন্দরী ছিল, যখন প্রতি পুষ্পে সুগন্ধ পাইতাম, প্রতি পত্রমর্ম্মরে মধুর শব্দ শুনিতাম, প্রতি নক্ষত্রে চিত্রা রোহিণীর শোভা দেখিতাম, প্রতি মনুষ্যমুখে সরলতা দেখিতাম, তখন আনন্দ ছিল। পৃথিবী এখনও তাই আছে, সংসার এখনও তাই আছে, মনুষ্য-চরিত্র এখনও তাই আছে। কিন্তু এ হৃদয় আর তাই নাই।

তখন সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দ হইত। আজ এই সঙ্গীত শুনিয়া সেই আনন্দ মনে পড়িল। যে অবস্থায়, যে সুখে সেই আনন্দ অনুভূত করিতাম, সেই অবস্থা, সেই সুখ মনে পড়িল। মুহূর্ত্ত জন্য আবার যৌবন ফিরিয়া পাইলাম। আবার তেমনি করিয়া, মনে মনে সমবেত বন্ধুমণ্ডলীমধ্যে বসিলাম ; আবার সেই অকারণসঞ্জাত উচ্চ হাসি হাসিলাম, যে কথা নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া এখন বলি না নিষ্প্রয়োজনেও চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু তখন বলিতাম, আবার সেই সকল বলিতে লাগিলাম ; আবার অকৃত্রিম হৃদয়ে পরের প্রণয় অকৃত্রিম বলিয়া মনে মনে গ্রহণ করিলাম। ক্ষণিক ভ্রান্তি জন্মিল—তাই এ সঙ্গীত এত মধুর লাগিল ; শুধু তাই নয়। তখন সঙ্গীত ভাল লাগিত,—এখন লাগে না— চিত্তের যে প্রফুল্লতার জন্য ভাল লাগিত, সে প্রফুল্লতা নাই বলিয়া ভাল লাগে না। আমি মনের ভিতর মন লুকাইয়া সেই গত যৌবনসুখ চিন্তা করিতেছিলাম—সেই সময়ে এই পূর্ব্বস্মৃতিসূচক সঙ্গীত কর্ণে প্রবেশ করিল, তাই এত মধুর বোধ হইল।

সে প্রফুল্লতা, সে সুখ আর নাই কেন? সুখের সামগ্রী কি কমিয়াছে? অর্জ্জন এবং ক্ষতি উভয়েই সংসারের নিয়ম। কিন্তু ক্ষতি অপেক্ষা অর্জ্জন অধিক, ইহাও নিয়ম। তুমি জীবনের পথ যতই অতিবাহিত করিবে, ততই সুখপ্রদ সামগ্রী সঞ্চয় করিবে। তবে বয়সে স্ফূর্ত্তি কমে কেন? পৃথিবী আর তেমন সুন্দরী দেখা যায় না কেন? আকাশের তারা আর তেমন জ্বলে না কেন? আকাশের নীলিমায় আর সে উজ্জ্বলতা থাকে না কেন? যাহা তৃণপল্লবময়, কুসুমসুবাসিত, স্বচ্ছ কল্লোলিনী-শীকর-সিক্ত, বসন্তপবনবিধূত বলিয়া বোধ হইত, এখন তাহা বালুকাময়ী মরুভূমি বলিয়া বোধ হয় কেন? কেবল রঙিগল কাচ নাই বলিয়া। আশা সেই রঙ্গিল কাচ। যৌবনে অর্জ্জিত সুখ অল্প, কিন্তু সুখের আশা অপরিমিত। এখন অর্জ্জিত সুখ অধিক, কিন্তু সেই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী আশা কোথায়? তখন জানিতাম না, কিসে কি হয়, অনেক আশা করিতাম। এখন জানিয়াছি, এই সংসারচক্রে আরোহণ করিয়া, যেখানকার আবার সেইখানে ফিরিয়া আসিতে হইবে ; যখন মনে ভাবিতেছি, এই অগ্রসর হইলাম, তখন কেবল আবর্ত্তন করিতেছি মাত্র। এখন বুঝিয়াছি যে, সংসার-সমুদ্রে সন্তরণ আরম্ভ করিলে, তরঙ্গে তরঙ্গে আমাকে প্রহত করিয়া আবার আমাকে কূলে ফেলিয়া যাইবে। এখন জানিয়াছি যে, এ অরণ্যে পথ নাই, এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই। এখন জানিয়াছি যে, কুসুমে কীট আছে, কোমল পল্লবে কণ্টক আছে, আকাশে মেঘ আছে, নির্ম্মলা নদীতে আবর্ত্ত আছে, ফলে বিষ আছে, উদ্যানে সর্প আছে ; মনুষ্য-হৃদয়ে কেবল আত্মাদর আছে। এখন জানিয়াছি যে, বৃক্ষে বৃক্ষে ফল ধরে না, ফুলে ফুলে গন্ধ নাই, মেঘে মেঘে বৃষ্টি নাই, বনে বনে চন্দন নাই, গজে গজে মৌক্তিক নাই। এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে, কাচও হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল, পিতলও সুবর্ণের ন্যায় ভাস্বর, পঙ্কও চন্দনের ন্যায় স্নিগ্ধ, কাংস্যও রজতের ন্যায় মধুরনাদী।—কিন্তু কি বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গেলাম। সেই গীতধ্বনি! উহা ভাল লাগিয়াছে বটে, কিন্তু আর দ্বিতীয় বার শুনিতে চাহি না। উহা যেমন মনুষ্যকণ্ঠজাত সঙ্গীত, তেমনি সংসারের এক সঙ্গীত আছে

সংসাররসে রসিকেরাই তাহা শুনিতে পায়। সেই সঙ্গীত শুনিবার জন্য আমার চিত্ত আকুল। সে সঙ্গীত আর কি শুনিব না? শুনিব, কিন্তু নানা বাদ্যধ্বনিসংমিলিত বহুকণ্ঠপ্রসূত সেই পূর্ব্বশ্রুত সংসার-সঙ্গীত আর শুনিব না। সে গায়কেরা আর নাই—সে বয়স নাই, সে আশা নাই। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যাহা শুনিতেছি, তাহা অধিকতর প্রীতিকর। অনন্যসহায় একমাত্র গীত-ধ্বনিতে কর্ণবিবর পরিপূরিত হইতেছে। প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসার-সঙ্গীত। অনন্ত কাল সেই মহাসঙ্গীত সহিত মনুষ্য-হৃদয়-তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে তবে আমি অন্য সুখ চাই না।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

দ্বিতীয় সংখ্যা

মনুষ্য ফল

আফিমের একটু বেশী মাত্রা চড়াইলে, আমার বোধ হয় মনুষ্যসকল ফলবিশেষ—মায়াবৃন্তে সংসার বৃক্ষে ঝুলিয়া রহিয়াছে পাকিলেই পড়িয়া যাইবে। সকলগুলি পাকিতে পায় না—কতক অকালে ঝড়ে পড়িয়া যায়। কোনটি পোকায় খায়, কোনটিকে পাখীতে ঠোক্‌রায়। কোনটি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে। কোনটি সুপক্ক হইয়া আহরিত হইলে গঙ্গাজলে ধৌত হইয়া দেবসেবায় বা ব্রাহ্মণভোজনে লাগে—তাহাদিগেরই ফলজন্ম বা মনুষ্যজন্ম সার্থক; কোনটি সুপক্ক হইয়া, বৃক্ষ হইতে খসিয়া পড়িয়া মাটিতে পড়িয়া থাকে, শৃগালে খায়। তাহাদিগের মনুষ্যজন্ম বা ফলজন্ম বৃথা। কতকগুলি তিক্ত, কটু বা কষায়,—কিন্তু তাহাতে অমূল্য ঔষধ প্রস্তুত হয়। কতকগুলি বিষময়—যে খায়, সেই মরে। আর কতকগুলি মাকাল জাতীয়—কেবল দেখিতে সুন্দর।

কখন কখন ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিতে পাই যে, পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের মনুষ্য পৃথক জাতীয় ফল। আমাদের দেশের এক্ষণকার বড়মানুষদিগকে মনুষ্যজাতিমধ্যে কাঁটাল বলিয়া বোধ হয়। কতকগুলি খাসা খাজা কাঁটাল, কতকগুলির বড় আটা, কতকগুলি কেবল ভুতুড়িসার, গরুর খাদ্য। কতকগুলি ইঁচোড়ে পাকে, কতকগুলি কেবল ইঁচোড়ই থাকে, কখনও পাকে না। কতকগুলি পাকিলে পাকিতে পারে, কিন্তু পাকিতে পায় না, পৃথিবীর রাক্ষস রাক্ষসীরা ইঁচোড়েই পাড়িয়া দাল্‌না রাঁধিয়া খাইয়া ফেলে। যদি পাকিল ত বড় শৃগালের দৌরাত্ম্য। যদি গাছ ঘেরা থাকে ত ভালই। যদি কাঁটাল উঁচু ডালে ফলিয়া থাকে, ভালই; নহিলে শৃগালেরা কাঁটাল কোনমতে উদরসাৎ করিবে। শৃগালেরা কেহ দেওয়ান, কেহ কারাকুন কেহ নাএব, কেহ গোমস্তা, কেহ মোছায়েব, কেহ কেবল আশীর্ব্বাদক। যদি এ সকলের হাত এড়াইয়া, পাকা কাঁটাল ঘরে গেল, তবে মাছি ভন্ ভন্ করিতে আরম্ভ করিল। মাছিরা কাঁটাল চায়

না, তাহারা কেবল একটু একটু রসের প্রত্যাশাপন্ন। এ মাছিটি কন্যাভারগ্রস্ত উহাকে এক ফোঁটা রস দাও,—ওটির মাতৃদায়, একটু রস দাও। এটি একখানি পুস্তক লিখিয়াছে, একটু রস দাও,—সেটি পেটের দায়ে একখানি সম্বাদ-পত্র করিয়াছে, উহাকেও একটু রস দাও। এই মাছিটি কাঁটালের পিসীর ভাশুর পুত্রের শ্যালীপুত্র—খাইতে পায় না, কিছু রস দাও ;—সে মাছিটির টোলে পৌনে চোদ্দটি ছাত্র পড়ে, কিছু রস দাও। আবার এদিকে কাঁটাল ঘরে রাখাও ভাল না—পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া উঠে। আমার বিবেচনায় কাঁটাল ভাঙিয়া, উত্তম নির্জ্জল দুগ্ধের ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া, কমলাকান্তের ন্যায় সুব্রাহ্মণকে ভোজন করানই ভাল।

এদেশের সিবিল সার্ব্বিসের সাহেবদিগকে আমি মনুষ্যজাতি মধ্যে আম্রফল মনে করি। এদেশে আম ছিল না, সাগরপার হইতে কোন মহাত্মা এই উপাদেয় ফল এদেশে আনিয়াছেন। আম্র দেখিতে রাঙ্গা রাঙ্গা, ঝাঁকা আলো করিয়া বসে। কাঁচায় বড় টক—পাকিলে সুমিষ্ট বটে, কিন্তু তবু হাড়ে টক যায় না। কতকগুলো আম এমন কদর্য্য যে, পাকিলেও টক যায় না। কিন্তু দেখিতে বড় বড় রাঙ্গা রাঙ্গা হয়, বিক্রেতা ফাঁকি দিয়া পঁচিশ টাকা শ বিক্রয় করিয়া যায়। কতকগুলি আম কাঁচামিটে আছে—পাকিলে পানশে। কতকগুলো জাতে পাকা। সেগুলি কুটিয়া নুন মাখিয়া আমসী করাই ভাল।

সকলে আম্র খাইতে জানে না। সদ্য গাছ হইতে পাড়িয়া এ ফল খাইতে নাই। ইহা কিয়ৎক্ষণ সেলাম-জলে ফেলিয়া ঠাণ্ডা করিও—যদি জোটে, তবে সে জলে একটু খোসামোদ-বরফ দিও—বড় শীতল হইবে। তারপরে ছুরি চালাইয়া স্বচ্ছন্দে খাইতে পার।

স্ত্রীলোকদিগকে লৌকিক কথায় কলাগাছের সহিত তুলনা করিয়া থাকে। কিন্তু সে গেছো কথা। কদলীফলের সঙ্গে ভুবনমোহিনী জাতির আমি সৌসাদৃশ্য দেখি না। স্ত্রীলোক কি কাঁদি কাঁদি ফলে? যাহার ভাগ্যে ফলে ফলুক—কমলাকান্তের ভাগ্যে ত নয়। কদলীর সঙ্গে কামিনীগণের এই পর্য্যন্ত সাদৃশ্য আছে যে, উভয়েই বানরের প্রিয়। কামিনীগণের এ গুণ থাকিলেও কদলীর সঙ্গে তাঁহাদিগের তুলনা করিতে পারি না। পক্ষান্তরে কতকগুলি কটুভাষী আছেন, তাঁহারা ফলের মধ্যে মাকাল ফলকেই যুবতীগণের অনুরূপ বলেন! যে বলে, সে দুর্ম্মুখ—আমি ইঁহাদিগের ভৃত্যস্বরূপ ; আমি তাহা বলিব না।

আমি বলি, রমণীমণ্ডলী এ সংসারের নারিকেল। নারিকেলও কাঁদি কাঁদি ফলে বটে, কিন্তু (ব্যবসায়ী নহিলে) কেহ কখন কাঁদি কাঁদি পাড়ে না। কেহ কখন দ্বাদশীর পারণার অনুরোধে, অথবা বৈশাখ মাসে ব্রাহ্মণসেবার জন্য একটি আধটি পাড়ে। কাঁদি কাঁদি পাড়িয়া খাওয়ার অপরাধে যদি কেহ অপরাধী থাকে, তবে কুলীন ব্রাহ্মণেরা। কমলাকান্ত কখন সে অপরাধে অপরাধী নহে।

বৃক্ষের নারিকেলের ন্যায় সংসারের নারিকেলের বয়োভেদে নানাবস্থা। কবকচি বেলা উভয়েই বড় স্নিগ্ধকর—নারিকেলের জলে উদর স্নিগ্ধ হয়—কিশোরীর অকৃত্রিম

বিলাস-লক্ষণ-শূন্যে প্রণয়ে হৃদয় স্নিগ্ধ হয়। কিন্তু দুই জাতীয়,—ফলজাতীয় এবং মনুষ্যজাতীয়, নারিকেলের ডাবই ভাল। তখন দেখিতে কেমন উজ্জ্বল শ্যাম—কেমন জ্যোতির্ম্ময়, রৌদ্র তাহা হইতে প্রতিহত হইতেছে—যেন সে নবীন শ্যাম শোভায় জগতের রৌদ্র শীতল হইতেছে। গাছের উপর কাঁদি কাঁদি নারিকেল আর গবাক্ষপথে কাঁদি কাঁদি যুবতী, আমার চক্ষে একই দেখায়—উভয়ই চতুর্দ্দিক আলো করিয়া থাকে। কিন্তু দেখ দেখিয়া ভুলিও না—এই চৈত্র মাসের রৌদ্র, গাছ হইতে পাড়িয়া ডাব কাটিও না—বড় তপ্ত। সংসারশিক্ষাশূন্যা কামিনীকে সহসা হৃদয়ে গ্রহণ করিও না—তোমার কলিজা পুড়িয়া যাইবে। আম্রের ন্যায় ডাবকেও বরফজলে রাখিয়া শীতল করিও বরফ না যোটে, পুকুরের পাঁকে পুঁতিয়া রাখিয়া ঠাণ্ডা করিও, মিষ্ট কথায় না করিতে পার, কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর আজ্ঞা, কড়া কথায় করিও।

নারিকেলের চারিটি সামগ্রী—জল, শস্য, মালা আর ছোবড়া। নারিকেলের জলের সঙ্গে স্ত্রীলোকের স্নেহের আমি সাদৃশ্য দেখি। উভয়ই বড় স্নিগ্ধকর; যখন তুমি সংসারের রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে, গৃহের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম কামনা কর, তখন এই শীতল জল পান করিও—সকল যন্ত্রণা ভুলিবে। তোমার দারিদ্র্য-চৈত্রে বা বন্ধুবিয়োগ-বৈশাখে—তোমার যৌবন মধ্যাহ্নে বা রোগতপ্ত-বৈকালে, আর কিসে তোমার হৃদয় শীতল হইবে? মাতার আদর, স্ত্রীর প্রেম, কন্যার ভক্তি, ইহার অপেক্ষা জীবনের সন্তাপে আর কি সুখের আছে? গ্রীষ্মের তাপে ডাবের জলের মত আর কি আছে?

তবে, ঝুনো হইলে জল একটু ঝাল হইয়া যায়। রামার মা ঝুনো হইলে পর, রামার বাপ ঝালের চোটে বাড়ী ছাড়িয়াছিল। এইজন্য নারিকেলের মধ্যে ডাবেরই আদর।

নারিকেলের শস্য, স্ত্রীলোকের বুদ্ধি। কয়কচি বেলায় বড় থাকে না; ডাবের অবস্থায় বড় সুমিষ্ট, বড় কোমল; ঝুনোর বেলায় বড় কঠিন, দন্তস্ফুট করে কার সাধ্য? তখন ইহাকে গৃহিণীপণা বলে। গৃহিণীপনা রসাল বটে, কিন্তু দাঁত বসে না। একদিকে কন্যা বসিয়া আছেন মায়ের অলঙ্কারের বাক্স হইতে কিয়দংশ সংগ্রহ করিবেন,—কিন্তু ঝুনোর শস্য এমনি কঠিন যে, মেয়ের দাঁত বসিল না—ঝুনো দয়া করিয়া একটি মাকড়ি বাহির করিয়া দিল। হয় ত পুত্র বসিয়া আছেন, মায়ের নগদ পুঁজির উপর দাঁত বসাইবেন,—ঝুনো দয়া করিয়া নগদ সাত সিকা বাহির করিয়া দিল। স্বামী প্রাচীন বয়সে একটি ব্যবসায় ফাঁদিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু শেষ বয়সে হাত খালি—টাকা নহিলে ব্যবসায় হয় না—ঝুনোর পুঁজির উপর দৃষ্টি। দুই চারিটি প্রবৃত্তিরূপ দন্ত ফুটাইয়া দিলেন—বুড়া বয়সের দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। শেষ যদি দাঁত বসিল, নারিকেল জীর্ণ করিবার সাধ্য কি? যতদিন না টাকা ফিরাইয়া দেন, ততদিন অজীর্ণ রোগে রাত্রে নিদ্রা হয় না।

তারপর মালা—এটি স্ত্রীলোকের বিদ্যা—কখন আধখানা বৈ পুরা দেখিতে পাইলাম না। নারিকেলের মালা বড় কাজে লাগে না; স্ত্রীলোকের বিদ্যাও বড় নয়। মেরি

সমরবিল বিজ্ঞান লিখিয়াছেন, জেন্ অষ্টেন্ বা জর্জ্জ এলিয়ট উপন্যাস লিখিয়াছেন—মন্দ হয় নাই, কিন্তু দুই মালার মাপে।

ছোব্‌ড়া স্ত্রীলোকের রূপ। ছোব্‌ড়া যেমন নারিকেলের বাহ্যিক অংশ, রূপও স্ত্রীলোকের বাহ্যিক অংশ। দুই বড় অসার;—পরিত্যাগ করাই ভাল। তবে ছোব্‌ড়ায় একটি কাজ হয়—উত্তম রজ্জু প্রস্তুত হয়, তাহাতে জাহাজ বাঁধা যায়। স্ত্রীলোকের রূপের কাছিতেও অনেক জাহাজ বাঁধা গিয়াছে—তোমরা যেমন নারিকেলের কাছিতে জগন্নাথের রথ টান, স্ত্রীলোকেরা রূপের কাছিতে কত ভারি ভারি মনোরথ টানে। যখন রথ-টানা বারণের আইন হইবে, তখন তাহাতে এ রথ-টানা নিষেধের জন্য যেন একটা ধারা থাকে—তাহা হইলে অনেক নরহত্যা নিবারণ হইবে। আমি জানি না, নারিকেলের রজ্জু গলায় বাঁধিয়া কেহ কখন প্রাণত্যাগ করিয়াছে কি না, কিন্তু রূপরজ্জু গলায় বাঁধিয়া কতলোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে কে তাহার গণনা করিবে?

বৃক্ষের নারিকেল এবং সংসারের নারিকেলের সঙ্গে আমার বিবাদ এই যে, আমি হতভাগা, দুয়ের এককেও আহরণ করিতে পারিলাম না। অন্য ফল আকর্ষী দিয়া পাড়া যায়, কিন্তু নারিকেল গাছে না উঠিলে পাড়া যায় না। গাছে উঠিতে গেলেও হয় নিজের পায়ে দড়ি বাঁধিতে হইবে, না হয় ডোমের খোসামোদ করিতে হইবে।*

ডোমের খোসামোদ করিতেও রাজি আছি। কিন্তু আমার ভাগ্যদোষে কপালে নারিকেল যোটে না। আমি যেমন মানুষ, তেমনি গাছে তেমনি রূপগুণের আকর্ষী দিয়া নারিকেল পাড়িতে পারি। পারি, কিন্তু ভয়—পাছে নারিকেল ঘাড়ে পড়ে। এমন অনেক শ্যামী, বামী রামী, কামিনী আছে যে, কমলাকান্তকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু পরের মেয়ে ঘাড়ে করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে এ দীন অসমর্থ। অতএব এ যাত্রা, কমলাকান্ত ভক্তিভাবে, নারিকেল ফলটি বিশ্বেশ্বরকে দিলেন। তিনি একে শ্মশানবাসী, তাহাতে আবার বিষপান করিয়াছেন—ছাই ডাব নারিকেলে তাহার কি করিবে?

এ দেশে এক জাতি লোক সম্প্রতি দেখা দিয়াছেন তাঁহারা দেশহিতৈষী বলিয়া খ্যাত। তাহাদের আমি শিমুল ফুল ভাবি। যখন ফুল ফুটে, তখন দেখিতে শুনিতে বড় শোভা—বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা, গাছ আলো করিয়া থাকে। কিন্তু আমার চক্ষে নেড়া গাছে অত রাঙ্গা ভাল দেখায় না। একটু একটু পাতা ঢাকা থাকিলে ভাল দেখাইত; পাতার মধ্য হইতে যে অল্প অল্প রাঙ্গা দেখা যায়, সেই সুন্দর। ফুলে গন্ধ মাত্র নাই—কোমলতা মাত্র নাই, কিন্তু তবু ফুল বড় বড় রাঙ্গা রাঙ্গা। যদি ফুল ঘুচিয়া ফল ধরিল, তবে মনে করিলাম, এইবার কিছু লাভ হইবে। কিন্তু তাহা বড় ঘটে না। কালক্রমে চৈত্র মাস আসিলে রৌদ্রের তাপে, অন্তর্দ্দাহে ফল ফট করিয়া ফাটিয়া উঠে; তাহার ভিতর হইতে খানিক তূলা বাহির হইয়া বঙ্গদেশময় ছড়াইয়া পড়ে।

অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ সংসারের ধুতরা ফল। বড় বড় লম্বা লম্বা সমাসে, বড় বড়

* কমলাকান্ত বোধ হয়, পুরোহিতকে ডোম বলিতেছে; কেননা, পুরোহিতই বিবাহ দেয়। উঃ কি পাষণ্ড!—ভীষ্মদেব।

বচনে, তাঁহাদিগকে অতি সুদীর্ঘ কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হয়, ফলের বেলা কণ্টকময় ধুতুরা। আমি অনেক দিন হইতে মানস করিয়াছি যে, কুক্কুটমাংস ভোজন করিয়া হিন্দুজন্ম পবিত্র করিব—কিন্তু এই অধম ধুতুরাগুলার কাঁটার জ্বালায় পারিলাম না। গুণের মধ্যে এই যে, এই ধুতুরায় মাদকের মাদকতা বৃদ্ধি করে। যে গাঁজাখোরের গাঁজায় নেশা হয় না, তাঁহার গাঁজার সঙ্গে দুইটা ধুতুরার বীচি সাজিয়া দেয়—যে সিদ্ধিখোরের সিদ্ধিতে নেশা না হয়, তাহার সিদ্ধির সঙ্গে দুইটা ধুতুরার বীচি বাটিয়া দেয়। বোধ হয়, এই হিসারেই বঙ্গীয় লেখকেরা আপনাপন প্রবন্ধমধ্যে অধ্যাপকদিগের নিকট দুই চারিটা বচন লইয়া গাঁথিয়া দেন। প্রবন্ধ-গাঁজার মধ্যে সেই বচন-ধুতুরার বীচিতে পাঠকের নেশা জমাইয়া তুলে। এই নেশায় বঙ্গদেশ আজি কালি মাতিয়া উঠিয়াছে।

আমাদের দেশের লেখকদিগকে আমি তেঁতুল বলিয়া গণি। নিজের সম্পত্তি খোলা আর সিটে, কিন্তু দুগ্ধকেও স্পর্শ করিলে দধি করিয়া তোলেন। গুণের মধ্যে কেবল অম্লগুণ—তাও নিকৃষ্ট অম্ল। তবে এক গুণ মানি—ইহারা সাক্ষাৎ কাষ্ঠাবতার। তেঁতুল কাঠ নীরস বটে, কিন্তু সমালোচনার আগুনে পোড়েন ভাল। সত্য কথা বলিতে কি, তেঁতুলের মত কুসামগ্রী আমি সংসারে দেখিতে পাই না। যেই কিয়ৎপরিমাণে খায়, তাহারই অজীর্ণ হয়, সেই অম্ল উদ্গার করে। যেই অধিক পরিমাণে খায়, সেই অম্ল-পিত্তরোগে চিররুগ্ন। যাঁহারা সাহেব হইয়াছেন, টেবিলে বসিয়া, গ্যাসের আলোতে বা আর্গাণ্ড জ্বালিয়া, ফরজু খানসামার হাতের পাক, কাঁটা চামচে ধরিয়া খাইতে শিখিয়াছেন—তাঁহারা এক দায় এড়াইয়াছেন—তেঁতুলের অম্লের বড় ধার ধারিতে হয় না—আগা গোড়া তেঁতুলের মাছ দিয়া ভাত মারিতে হয় না। কিন্তু যাহাদিগকে চালা-ঘরে বসিয়া, মুঙ্গেরে পাতর কোলে করিয়া, পদী পিসীর রান্না খাইতে হয়, তাহাদের কি যন্ত্রণা! পদী পিসী কুলীনের মেয়ে, প্রাতঃস্নান করে, নামাবলী গায়ে দেয়, হাতে তুলসীর মালা; কিন্তু রাঁধিবার বেলা কলাইয়ের দাল, আর তেঁতুলের মাছ ছাড়া আর কিছুই রাঁধিতে জানেন না। ফরজু জাতিতে নেড়ে কিন্তু রাঁধে অমৃত।

আর একটি মনুষ্যফলের কথা বলা হইলেই অদ্য ক্ষান্ত হই। দেশী হাকিমেরা কোন্ ফল বল দেখি? যিনি রাগ করেন করুন; আমি স্পষ্টকথা বলিব, ইহারা পৃথিবীর কুষ্মান্ড। যদি চালে তুলিয়া দিলে, তবেই ইঁহারা উচুতে ফলিলেন—নহিলে মাটিতে গড়াগড়ি যান। যেখানে ইচ্ছা, সেখানে তুলিয়া দাও, একটু ঝড় বাতাসেই লতা ছিঁড়িয়া ভূমে গড়াগড়ি। অনেকগুলি রূপেও কুষ্মাণ্ড, গুণেও কুষ্মাণ্ড।—তবে কুষ্মাণ্ড এখন দুই প্রকার হইতেছে—দেশী কুমড়া ও বিলাতী কুমড়া। বিলাতী কুমড়া বলিলে এমত বুঝায় না যে, এই কুমড়াগুলি বিলাত হইতে আসিয়াছে। যেমন দেশী মুচির তৈয়ারি জুতাকে ইংরেজি জুতা বলে, ইঁহারাও সেইরূপ বিলাতী। বিলাতী কুমড়ার যে গৌরব অধিক, ইহা বলা বাহুল্য। সংসারোদ্যানে আরও অনেক ফল ফলে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অকর্ম্মণ্য, কদর্য্য, টক—

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

তৃতীয় সংখ্যা

ইউটিলিটি* বা উদর-দর্শন

বেন্থাম হিতবাদ দর্শনের সৃষ্টি করিয়া ইওরোপে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আমি এই হিতবাদমতে অমত করি না, বরং আমি ইহার অনুমোদক, তবে আপনারা জানেন কি না, বলিতে পারি না, আমি একজন সুযোগ্য দার্শনিক। আমি এই হিতবাদ দর্শন অবলম্বন করিয়া, কিছু ভাঙ্গিয়া, কিছু গড়িয়া, একটি নূতন দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে, তাহা বাঙ্গালায় প্রচলিত হিতবাদ দর্শনের নূতন ব্যাখ্যা মাত্র। তাহার স্থূল মর্ম্ম আমি সংক্ষেপতঃ লিপিবদ্ধ করিতেছি। প্রাচীন প্রথানুসারে দর্শনটি সূত্রাকারে লিখিত হইয়াছে। এবং আমি স্বয়ংই সূত্রের ভাষ্য করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়াছি। বাঙ্গালাতেই সূত্রগুলি লিখিত হইয়াছে। আমি যে অসংস্কৃতজ্ঞ, এমত কেহ মনে করিবেন না। তবে সংস্কৃতে সূত্রগুলি কয়জন বুঝিতে পারিবে? অতএব, সাধারণ পাঠকের প্রতি অনুকূল হইয়া বাঙ্গালাতেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছি। সে সূত্রগ্রন্থের সারাংশ এই;—

১। **জীবশরীরস্থ বৃহৎ গহ্বরবিশেষকে উদর বলে।**

ভাষ্য

"বৃহৎ"—অর্থাৎ নাসিকা কর্ণাদি ক্ষুদ্র গহ্বরকে উদর বলা যায় না। বলিলে বিশেষ প্রত্যবায় আছে।

"জীবশরীরস্থ বৃহৎ গহ্বর"—জীবশরীরস্থ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, নহিলে পর্ব্বতগুহা প্রভৃতিকে উদর বলিয়া পরিচয় দিয়া কেহ তাহার পূর্ত্তির প্রত্যাশা করিতে পারেন।

"গহ্বর"—যদিও জীবশরীরস্থ গহ্বরবিশেষই উদর শব্দে বাচ্য, তথাপি অবস্থাবিশেষে অঞ্জলি প্রভৃতিও উদরমধ্যে গণ্য। কোন স্থানে উদর পূরাইতে হয়, কোন স্থানে অঞ্জলি পূরাইতে হয়।

* "ইউটিলিটি" শব্দের অর্থ কি? ইহার কি বাঙ্গালা নাই? আমি নিজে ইংরেজি জানি না—কমলাকান্তও কিছু বলিয়া দেয় নাই—অতএব অগত্যা আমার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আমার পুত্র ডেক্‌সনারী দেখিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছে—"ইউ" শব্দে তুমি বা তোমরা, "টিল" শব্দে চাষ করা, "ইট" শব্দে খাওয়া, "ই" অর্থে কি, তাহা সে বলিতে পারিল না, কিন্তু বোধ করি কমলাকান্ত, "ইউ-টিল-ইট-ই" পদে ইহাই অভিপ্রেত করিয়াছেন যে, "তোমরা চাষ করিয়াই খাও।" কি পাষণ্ড! সকলকেই চাষা বলিল; ঈদৃশ দুর্ব্বৃত্ত দশানন লম্বোদর গজাননের রচনা পাঠ করাতেও পাপ আছে। বোধ হয়, আমার পুত্রটি ইংরেজি লেখাপড়ায় ভাল হইয়াছে, নচেৎ এরূপ দুরূহ শব্দের সদর্থ করিতে পারিত না।—শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীস।

২। উদরের ত্রিবিধ পূর্ত্তিই পরম পুরুষার্থ।

ভাষ্য

সাংখ্যেরও এই মত। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ উদর-পূর্ত্তি।

"আধিভৌতিক"—অন্ন ব্যঞ্জন সন্দেশ মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভৌতিক সামগ্রীর দ্বারা উদরের যে পূর্ত্তি হয়, তাহাই আধিভৌতিক পূর্ত্তি।

"আধ্যাত্মিক"—যাঁহারা বড়লোকের বাক্যে লুব্ধ হইয়া, কালযাপন করেন, তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক উদর পূর্ত্তি হয়।

"আধিদৈবিক"—দৈবানুকম্পায় প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতি দ্বারা যাঁহাদের উদর পুরিয়া উঠে, তাঁহাদিগের আধিদৈবিক উদর-পূর্ত্তি।

৩। এতন্মধ্যে আধিভৌতিক পূর্ত্তিই বিহিত।

ভাষ্য

"বিহিত"—বিহিত শব্দের দ্বারা অন্যান্য পূর্ত্তির প্রতিষেধ হইল কি না, ভবিষ্যৎ ভাষ্যকারেরা মীমাংসা করিবেন।

এক্ষণে সিদ্ধ হইল, উদরনামক মহা-গহ্বরে লুচি সন্দেশ প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থের প্রবেশই পুরুষার্থ। অতএব এ গর্ত্তের মধ্যে কি প্রকার ভূত প্রবেশ করান যাইতে পারে, তাহা নির্ব্বাচন করা যাইতেছে।

৪। বিদ্যা বুদ্ধি পরিশ্রম উপাসনা বল এবং প্রতারণা, এই ষড়্‌বিধ পুরুষার্থের উপায়, পূর্ব্বপণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভাষ্য।

১। "বিদ্যা"—বিদ্যা কি, তাহা অবধারণ করা কঠিন। কেহ কেহ বলেন, লিখিতে ও পড়িতে শিখাকে বিদ্যা বলে। কেহ কেহ বলেন, বিদ্যার জন্য বিশেষ লিখিতে বা পড়িতে শিখার প্রয়োজন নাই, গ্রন্থ লিখিতে, সম্বাদ পত্রাদিতে লিখিতে জানিলেই হইল। কেহ কেহ তাহাতে আপত্তি করেন যে, যে লিখিতে জানে না, সে পত্রাদিতে লিখিবে কি প্রকারে? আমার বিবেচনায় এরূপ তর্ক নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কুম্ভীরশাবক ডিম্ব ভেদ করিবামাত্র জলে গিয়া সাঁতার দিয়া থাকে, শিখিতে হয় না। সেইরূপ বিদ্যা বাঙ্গালের স্বতঃসিদ্ধ, তজ্জন্য লেখাপড়া শিখিবার প্রয়োজন নাই।

২। "বুদ্ধি"—যে আশ্চর্য্য শক্তিদ্বারা তূলাকে লৌহ, লৌহকে তূলা বিবেচনা হয়, সেই শক্তিকেই বুদ্ধি বলে। কৃপণের সঞ্চিত ধনরাশির ন্যায় ইহা আমরা স্বয়ং সর্ব্বদা দেখিতে পাই, কিন্তু পরে কখন দেখিতে পায় না। পৃথিবীর সকল সামগ্রীর অপেক্ষা বোধ হয়, জগতে ইহারই আধিক্য। কেন না, কখন কেহ বলিল না যে, ইহা আমি অল্প পরিমাণে পাইয়াছি।

৩। "পরিশ্রম"—উপযুক্ত সময়ে ঈষদুষ্ণ অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন, তৎপরে নিদ্রা, বায়ু সেবন, তামাকুর ধূমপান, গৃহিণীর সহিত সম্ভাষণ ইত্যাদি গুরুতর কার্য্যসম্পাদনের নাম পরিশ্রম।

৪। "উপাসনা"—কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে, হয় তাহার গুণানুবাদ, নয় দোষকীর্ত্তন করিতে হয়। কোন ক্ষমতাশালী প্রধান ব্যক্তি সম্বন্ধে এরূপ কথা হইলে, যদি তিনি প্রকৃত দোষযুক্ত ব্যক্তি হয়েন, তবে তাঁহার দোষকীর্ত্তন করাকে নিন্দা বলে। আর তিনি যদি দোষযুক্ত না হয়েন, তবে তাঁহার দোষকীর্ত্তনকে স্পষ্টবক্তৃত্ব বা রসিকতা বলে। গুণ পক্ষে, তিনি যদি গুণহীন হয়েন, তবে তাঁহার গুণকীর্ত্তনকে ন্যায়নিষ্ঠতা বলে। আর যদি তিনি যথার্থ গুণবান্ হয়েন, তবে তাঁহার গুণকীর্ত্তনকে উপাসনা বলে।

৫। "বল"—দীর্ঘচ্ছন্দ বাক্য—মুখ চক্ষুর আরক্তভাব—ঘোরতর ডাক হাঁক,—মুখ হইতে অনর্গল হিন্দী, ইংরাজী এবং নিষ্ঠীবনের বৃষ্টি, দূর হইতে ভঙ্গীদ্বারা কিল, চড়, ঘুষা এবং লাথি প্রদর্শন ও সাদর্দ্ধ তিষ্পান্ন প্রকার অন্যান্য অঙ্গভঙ্গী—এবং বিপক্ষের কোনপ্রকার উদ্যম দেখিলে অকালে পলায়ন ইত্যাদিকে বল বলে।

বল ষড়্বিধ যথা ঃ—

মৌখিক—অভিসম্পাত, গালি, নিন্দা প্রভৃতি।

হাস্ত—কিল চড় প্রদর্শন প্রভৃতি।

পাদ—পলায়নাদি।

চাক্ষুষ—রোদনাদি। যথা, চাণক্যপণ্ডিত,—"বালানাং রোদনং বলং" ইত্যাদি।

ত্বাচ—প্রহারসহিষ্ণুতা ইত্যাদি।

মানস—দ্বেষ, ঈর্ষা, হিংসা প্রভৃতি।

৬। প্রতারণা—

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের পৃথিবীমধ্যে প্রতারক বলিয়া জানিও।

এক, পণ্যাজীব। প্রমাণ—দোকানদার জিনিস বেচিয়া আবার মূল্য চাহিতে থাকে। মূল্যদাতা মাত্রেরই মত যে, তিনি ক্রয়কালীন প্রতারিত হইয়াছেন।

দ্বিতীয়, চিকিৎসক। প্রমাণ—রোগী রোগ হইতে মুক্ত হইলে পরে যদি চিকিৎসক বেতন চায়, তবে রোগী প্রায় সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে, আমি নিজে আরাম হইয়াছি; এ বেটা অনর্থক ফাঁকি দিয়া টাকা লইতেছে।

তৃতীয়, ধর্ম্মোপদেষ্টা এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি। ইঁহারা চিরপ্রথিত প্রতারক, ইঁহাদিগের নাম "ভণ্ড"। ইঁহারা যে প্রতারক, তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, ইঁহারা অর্থাদির কামনা করেন না। ইত্যাদি।

৫। **এই ষড়্বিধ উপায়ের দ্বারা উদরপূর্ত্তি বা পুরুষার্থ অসাধ্য।**

ভাষ্য।

এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপণ্ডিতদিগের মত খণ্ডন করা যাইতেছে। বিদ্যাদি

ষড়্‌বিধ উপায়ের দ্বারা যে উদরপূর্ত্তি হইতে পারে না, ক্রমে তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

"বিদ্যা"—বিদ্যাতে যদি উদরপূর্ত্তি হইত, তবে বাঙ্গালা সম্বাদপত্রের অন্নাভাব কেন?

"বুদ্ধি"—বুদ্ধিতে যদি উদরপূর্ত্তি হইত, তবে গর্দ্দভ মোট বহিবে কেন?

"পরিশ্রম"—পরিশ্রমে যদি হইত, তবে বাঙ্গালি বাবুরা কেরাণী কেন?

"উপাসনা"—উপাসনায় যদি হইত, তবে সাহেবগণ কমলাকান্তকে অনুগ্রহ করেন না কেন? আমি ত মন্দ পে-বিল লিখি নাই।

"বল"—বলে যদি হইত, তবে আমরা পড়িয়া মার খাই কেন?

"প্রতারণা"—প্রতারণায় যদি হইত, তবে মদের দোকান কখন কখন ফেল হয় কেন।

৬। **উদরপূর্ত্তি বা পুরুষার্থ কেবল হিতসাধনের দ্বারা সাধ্য।**

ভাষ্য।

উদাহরণ। ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা লোকের কানে মন্ত্র দিয়া তাহাদের হিতসাধন করিয়া থাকেন। ইউরোপীয় জাতিগণ অনেক বন্য জাতির হিতসাধন করিয়াছেন, এবং রুসেরা এক্ষণে মধ্য-আসিয়ার হিতসাধনে নিযুক্ত আছেন। বিচারকগণ বিচার করিয়া দেশের হিতসাধন করিতেছেন। অনেকে সুবিক্রেয় এবং অবিক্রেয় পুস্তক ও পত্রাদি প্রণয়ন দ্বারা দেশের হিতসাধন করিতেছেন। এ সকলের প্রচুর পরিমাণে উদরপূর্ত্তি অর্থাৎ পুরুষার্থ লাভ হইতেছে।

৭। **অতএব সকলে দেশের হিতসাধন কর।**

ভাষ্য।

এই শেষ সূত্রের দ্বারা হিতবাদ দর্শন এবং উদর দর্শনের একতা প্রতিপাদিত হইল। সুতরাং এই স্থলে কমলাকান্তের সূত্র-গ্রন্থের সমাপ্তি হইল। ভরসা করি, ইহা ভারতবর্ষের সপ্তম দর্শনশাস্ত্র বলিয়া আদৃত হইবে।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

চতুর্থ সংখ্যা

পতঙ্গ

বাবুর বৈঠকখানায় সেজ জ্বলিতেছে—পাশে আমি, মোসায়েবি ধরণে বসিয়া আছি। বাবু দলাদলির গল্প করিতেছে,—আমি আফিং চড়াইয়া ঝিমাইতেছি। দলাদলিতে চটিয়া মাত্রা বেশী করিয়া ফেলিয়াছি। বিধিলিপি! এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অনাদি ক্রিয়াপরম্পরায় একটি ফল এই যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে কমলাকন্ত চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ

করিয়া অদ্য রাত্রে নসীরামবাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া মাত্রা বেশী করিয়া ফেলিবেন। সুতরাং আমার সাধ্য কি যে, তাহা অন্যথা করি।

ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিলাম যে, একটা পতঙ্গ আসিয়া ফানুসের চারিপাশে শব্দ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। "চোঁ-ও-ও-ও" "বোঁ ও-ও" করিয়া শব্দ করিতেছে। আফিমের ঝোঁকে মনে করিলাম, পতঙ্গের ভাষা কি বুঝিতে পারি না? কিছুক্ষণ কান পাতিয়া শুনিলাম—কিছু বুঝিতে পারিলাম না। মনে মনে পতঙ্গকে বলিলাম, "তুমি কি ও চোঁ বোঁ করিয়া বলিতেছ, আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।" তখন হঠাৎ আফিম প্রসাদাৎ দিব্য কর্ণ প্রাপ্ত হইলাম—শুনিলাম, পতঙ্গ বলিল, "আমি আলোর সঙ্গে কথা কহিতেছি—তুমি চুপ কর।" আমি তখন চুপ করিয়া পতঙ্গের কথা শুনিতে লাগিলাম। পতঙ্গ বলিতেছে—

দেখ, আলো মহাশয়, তুমি সে কালে ভাল ছিলে—পিতলের পিলসুজের উপর মেটে প্রদীপে শোভা পাইতে—আমরা স্বচ্ছন্দে পুড়িয়া মরিতাম। এখন আবার সেজের ভিতর ঢুকিয়াছ—আমরা চারিদিকে ঘুরে বেড়াই—প্রবেশ করিবার পথ পাই না, পুড়িয়া মরিতে পাই না।

দেখ, পুড়িয়া মরিতে আমাদের রাইট আছে—আমাদের চিরকালের হক্। আমরা পতঙ্গজাতি, পূর্ব্বাপর আলোতে পুড়িয়া মরিয়া আসিতেছি—কখন কোন আলো আমাদের বারণ করে নাই। তেলের আলো, বাতির আলো, কাঠের আলো, কোন আলো কখন বারণ করে নাই। তুমি কাচ মুড়ি দিয়া আছ কেন, প্রভু? আমরা গরিব পতঙ্গ—আমাদের উপর সহমরণ নিষেধের আইন জারি কেন? আমরা কি হিন্দুর মেয়ে যে, পুড়িয়া মরিতে পাব না?

দেখ, হিন্দুর মেয়ের সঙ্গে আমাদের অনেক প্রভেদ। হিন্দুর মেয়েরা আশা ভরসা থাকিতে কখন পুড়িয়া মরিতে চাহে না—আগে বিধবা হয়, তবে পুড়িয়া মরিতে বসে। আমরাই কেবল সকল সময়ে আত্মবিসর্জ্জনে ইচ্ছুক। আমাদের সঙ্গে স্ত্রী-জাতির তুলনা?

আমাদিগের ন্যায়, স্ত্রীজাতিও রূপের শিখা জ্বলিতে দেখিলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে বটে, ফলও এক,—আমরাও পুড়িয়া মরি, তাহারাও পুড়িয়া মরে। কিন্তু দেখ, সেই দাহতেই তাদের সুখ,—আমাদের কি সুখ? আমরা কেবল পুড়িবার জন্য পুড়ি, মরিবার জন্য মরি। স্ত্রীজাতিতে পারে? তবে আমাদের সঙ্গে তাহাদের তুলনা কেন?

শুন, যদি জ্বলন্ত রূপে শরীর না ঢালিলাম, তবে এ শরীর কেন? অন্য জীবে কি ভাবে, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আমরা পতঙ্গজাতি, আমরা ভাবিয়া পাই না, কেন এ শরীর?—লইয়া কি করিব?—নিত্য নিত্য কুসুমের মধু চুম্বন করি, নিত্য নিত্য বিশ্ব-প্রফুল্লকর সূর্য্যকিরণে বিচরণ করি—তাহাতে কি সুখ? ফুলের সেই একই গন্ধ, মধুর সেই একই মিষ্টতা, সূর্য্যের সেই এক প্রকারই প্রতিভা। এমন অসার, পুরাতন, বৈচিত্র্যশূন্য জগতে থাকিতে আছে? কাচের বাইরে আইস, জ্বলন্ত রূপশিখায় গা ঢালিব।

দেখ, আমার ভিক্ষাটি বড় ছোট—আমার প্রাণ তোমাকে দিয়া যাইব, লইবে না? দিব বৈ ত গ্রহণ করিব না। তবে ক্ষতি কি? তুমি রূপ, পোড়াইতে জন্মিয়াছ, আমি পতঙ্গ, পুড়িতে জন্মিয়াছি; আইস, যার যে কাজ, করিয়া যাই। তুমি হাসিতে থাক, আমি পুড়ি।

তুমি বিশ্বধ্বংসক্ষম—তোমাকে রোধিতে পারে, জগতে এমন কিছুই নাই—তুমি কাচের ভিতর লুকাইয়া আছ কেন? তুমি জগতের গতির কারণ—কার ভয়ে তুমি ডোমের ভিতর লুকাইয়াছ? কোন্ ডোমে এ ডোম গড়িয়াছে? কোন্ ডোমে তোমাকে এ ডোমের ভিতর পুরিয়াছে? তুমি যে বিশ্বব্যাপী, কাচ ভাঙ্গিয়া আমায় দেখা দিতে পার না?

তুমি কি? তা আমি জানি না—আমি জানি না—কেবল জানি যে, তুমি আমার বাসনার বস্তু—আমার জাগ্রতের ধ্যান—নিদ্রার স্বপ্ন—জীবনের আশা—মরণের আশ্রয়। তোমাকে কখন জানিতে পারিব না—জানিতে চাহিও না—যেদিন জানিব, সেইদিন আমার সুখ যাইবে। কাম্য বস্তুর স্বরূপ জানিলে কাহার সুখ থাকে?

তোমাকে কি পাইব না? কতদিন তুমি কাচের ভিতর থাকিবে? আমি কাচ ভাঙ্গিতে পারিব না। ভাল থাক—আমি ছাড়িব না—আবার আসিতেছি—বোঁ—ও—ও।

পতঙ্গ উড়িয়া গেল।

নসীরামবাবু ডাকিল, "কমলাকান্ত!" আমার চমক হইল—চাহিয়া দেখিলাম—বুঝি বড় ঢুলিয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু চাহিয়া দেখিয়া নসীরামকে চিনিতে পারিলাম না—দেখিলাম, মনে হইল, বৃহৎ পতঙ্গ বালিশ ঠেসান দিয়া, তামাকু টানিতেছে। সে কথা কহিতে লাগিল—আমার বোধ হইতে লাগিল যে, সে চোঁ বোঁ করিয়া কি বলিতেছে। এখন হইতে আমার বোধ হইতে লাগিল যে, মনুষ্য মাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে—সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে, সকলেই মনে করে, সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে—কেহ মরে, কেহ কাচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে। জ্ঞান-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নি, রূপ-বহ্নি, ধর্ম্ম-বহ্নি, ইন্দ্রিয়-বহ্নি, সংসার বহ্নিময়। আবার সংসার কাচময়। যে আলো দেখিয়া মোহিত হই—মোহিত হইয়া যাহাতে ঝাঁপ দিতে যাই—কই, তাহা ত পাই না—আবার ফিরিয়া বোঁ করিয়া চলিয়া যাই—আবার আসিয়া ফিরিয়া বেড়াই। কাচ না থাকিলে, সংসার এতদিন পুড়িয়া যাইত। যদি সকল ধর্ম্মবিৎ চৈতন্যদেবের ন্যায় ধর্ম্ম মানস-প্রত্যক্ষে দেখিতে পাইত, তবে কয়জন বাঁচিত? অনেকে জ্ঞান-বহ্নির আবরণ-কাচে ঠেকিয়া রক্ষা পায়, সক্রেতিস্, গেলিলিও তাহাতে পুড়িয়া মরিল। রূপ-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে,—আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি। মহাভারতকার মান-বহ্নি সৃজন করিয়া দুর্যোধন পতঙ্গকে পোড়াইলেন; জগতে অতুল্য কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল। জ্ঞান-

বহ্নিজাত দাহের গীত “Paradise Lost”। ধর্ম্ম-বহ্নির অদ্বিতীয় কবি, সেণ্ট পল। ভোগ-বহ্নির পতঙ্গ, “আণ্টনি, ক্লিওপেত্রা”। রূপ-বহ্নির “রোমিও ও জুলিয়েত,” ঈর্ষা-বহ্নির “ওথেলো”। গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরে ইন্দ্রিয়-বহ্নি জ্বলিতেছে। স্নেহ-বহ্নিতে সীতাপতঙ্গের দাহ জন্য রামায়ণের সৃষ্টি। বহ্নি কি, আমরা জানি না। রূপ, তেজ, তাপ, ক্রিয়া, গতি এ সকল কথার অর্থ নাই। এখানে দর্শন হারি মানে, বিজ্ঞান হারি মানে। ধর্ম্মপুস্তক হারি মানে, কাব্যগ্রন্থ হারি মানে। ঈশ্বর কি, ধর্ম্ম কি, জ্ঞান কি, স্নেহ কি? তাহা কি, কিছু জানি না। তবু সে অলৌকিক, অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া বেড়িয়া ফিরি। আমরা পতঙ্গ না ত কি?

দেখ ভাই, পতঙ্গের দল, ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোন ফল নাই। পার, আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া মর। না পার চল, “বোঁ” করিয়া চলিয়া যাই।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

পঞ্চম সংখ্যা

আমার মন

আমার মন কোথায় গেল? কে লইল? কই, যেখানে আমার মন ছিল, সেখানে ত নাই। যেখানে রাখিয়াছিলাম, সেখানে নাই? কে চুরি করিল? কই, সাত পৃথিবী খুঁজিয়া ত আমার “মনচোর” কাহাকে পাইলাম না। তবে কে চুরি করিল?

একজন বন্ধু বলিলেন, দেখ, পাকশালা খুঁজিয়া দেখ, সেখানে তোমার মন পড়িয়া থাকিতে পারে। মানি, পাকের ঘরে আমার মন পড়িয়া থাকিত। যেখানে পোলাও, কাবাব, কোফ্‌তার সুগন্ধ, যেখানে ডেক্‌চী-সমারূঢ়া অন্নপূর্ণার মৃদু মৃদু ফুটফুটবুটবুট-টকবকোধ্বনি, সেইখানে আমার মন পড়িয়া থাকিত। যেখানে ইলিস মৎস্য, সতৈল অভিষেকের পর ঝোলগঙ্গায় স্নান করিয়া, মৃন্ময়, কাংস্যময়, কাচময় বা রজতময় সিংহাসনে উপবেশন করেন, সেইখানেই আমার মন প্রণত হইয়া পড়িয়া থাকে, ভক্তিরসে অভিভূত হইয়া, সেই তীর্থস্থান আর ছাড়িতে চায় না। যেখানে ছাগ-নন্দন, দ্বিতীয় দধীচির ন্যায়, পরোপকারার্থ আপন অস্থি সমর্পণ করেন, যেখানে মাংসসংযুক্ত সেই অস্থিতে কোরমা-রূপ বজ্র নির্ম্মিত হইয়া, ক্ষুধারূপ বৃত্রাসুর বধের জন্য প্রস্তুত থাকে, আমার মন সেইখানেই, ইন্দ্রত্বলাভের জন্য বসিয়া থাকে। যেখানে, পাচকরূপী বিষ্ণুকর্ত্তৃক, লুচিরূপ সুদর্শন চক্র পরিত্যক্ত হয়, আমার মন সেইখানেই গিয়া বিষ্ণুভক্ত হইয়া দাঁড়ায়। অথবা যে আকাশে লুচি-চন্দ্রের উদয় হয়, সেইখানেই আমার মন-রাহু গিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে চায়। অন্যে যাহাকে বলে বলুক, আমি লুচিকেই অখণ্ড মণ্ডলাকার বলিয়া থাকি। যেখানে সন্দেশরূপ শালগ্রামের বিরাজ, আমার মন সেইখানেই পূজক। হালদারদিগের বাড়ীর রামমণি দেখিতে অতি কুৎসিতা,

এবং তাহার বয়ঃক্রম ষাট্ বৎসর, কিন্তু রাঁধে ভাল এবং পরিবেষণে মুক্তহস্তা বলিয়া, আমার মন তাহার সঙ্গে প্রসক্তি করিতে চাহিয়াছিল। কেবল রামমণির সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হওয়ায় এটি ঘটে নাই।

সুহৃদের প্রবর্ত্তনায়, পাকশালায় মনের সন্ধান করিলাম, সেখানে পাইলাম না। পলান্ন, কোফ্তা প্রভৃতি অধিষ্ঠাতৃদেবগণ জিজ্ঞাসায় বলিলেন, তাঁহারা কেহ আমার মন চুরি করেন নাই।

বন্ধু বলিলেন, একবার প্রসন্ন গোয়ালিনীর নিকট সন্ধান জান। প্রসন্নের সঙ্গে আমার একটু প্রণয় ছিল বটে, কিন্তু সে প্রণয়টা কেবল গব্যরসাত্মক। তবে প্রসন্ন দেখিতে শুনিতে মোটাসোটা, গোলগাল, বয়সে চল্লিশের নীচে, দাঁতে মিসি, হাসিভরা মুখ, কপালের একটি ছোট উল্‌কী টিপের মত দেখাইত; সে রসের হাসি পথে ছড়াইতে ছড়াইতে যাইত, আমি তাহা কুড়াইয়া লইতাম, এইজন্য লোকে আমার নিন্দা করিত। পূজারি বামণের জ্বালায় বাগানে ফুল ফুটিতে পায় না—আর নিন্দকের জ্বালায় প্রসন্নের কাছে আমার মুখ ফুটিতে পায় না—নচেৎ গব্যরসে ও কাব্যরসে বিলক্ষণ বিনিময় চলিত। ইহাতে আমার নিজের জন্য আমি যত দুঃখিত হই, না হই, প্রসন্নের জন্য আমি একটু দুঃখিত। কেন না, প্রসন্ন সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা। এ কথাও আমি মুখ ফুটিয়া বলিতে পাই না। বলিয়াছিলাম বলিয়া, পাড়ার একটি নষ্টবুদ্ধি ছেলে ইহার বিপরীত অর্থ করিয়াছিল। সে বলিল যে, প্রসন্ন আছেন, এজন্য সৎ বা সতী বটে, তিনি সাধুঘোষের স্ত্রী, এজন্য সাধ্বী; এবং বিধবাবস্থাতেও পতিছাড়া নহেন, এজন্য ঘোরতর পতিব্রতা। বলা বাহুল্য যে, যে অশিষ্ট বালক এই ঘৃণিত অর্থ মুখে আনিয়াছিল, তাহার শিক্ষার্থ, তাহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে আমার কলঙ্ক গেল না।

যখন লিখিতে বসিয়াছি, তখন স্পষ্ট কথা বলা ভাল—আমি প্রসন্নের একটু অনুরাগী বটে। তাহার কারণ আছে—প্রথমতঃ, প্রসন্ন যে দুগ্ধ দেয়, তাহা নির্জ্জল, এবং দামে সস্তা; দ্বিতীয়, সে কখন কখন ক্ষীর, সর, নবনীত আমাকে বিনামূল্যে দিয়া যায়; তৃতীয়, সে একদিন আমাকে কহিয়াছিল, "দাদাঠাকুর, তোমার দপ্তরে ও কিসের কাগজ?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "শুনিবি?" সে বলিল, "শুনিব।" আমি তাহাকে কয়েকটি প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইলাম—সে বসিয়া শুনিল। এত গুণে কোন্ লিপিব্যবসায়ী ব্যক্তি বশীভূত না হয়? প্রসন্নের গুণের কথা আর অধিক কি বলিব—সে আমার অনুরোধে আফিম ধরিয়াছিল।

এই সকল গুণে আমার মন কখন কখন প্রসন্নের ঘরের জানালার নীচে ঘুরিয়া বেড়াইত ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কেবল তাহার ঘরের জানালার নীচে নয়, তাহার গোহালঘরের আগড়ের পাশেও উঁকি মারিত। প্রসন্নের প্রতি আমার যেরূপ অনুরাগ, তাহার মঙ্গলা নামে গাইয়ের প্রতিও তদ্রূপ। একজন ক্ষীর সর নবনীতের আকর, দ্বিতীয়, তাহার দানকর্ত্রী। গঙ্গা বিষ্ণুপদ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভগীরথ তাঁহাকে আনিয়াছেন; মঙ্গলা আমার বিষ্ণুপদ; প্রসন্ন আমার ভগীরথ;

আমি দুইজনকেই সমান ভালবাসি। প্রসন্ন এবং তাহার গাই, উভয়েই সুন্দরী ; উভয়েই স্থূলাঙ্গী, লাবণ্যময়ী এবং ঘটোধ্নী। একজন গব্যরস সৃজন করেন আর একজন, হাস্যরস সৃজন করেন। আমি উভয়েরই নিকট বিনামূল্যে বিক্রীত।

কিন্তু আজি কালি সন্ধান করিয়া দেখিলাম, প্রসন্নের গবাক্ষতলে, অথবা তাহার গোহালঘরে আমার মন নাই। আমার মন কোথা গেল ?

কাঁদিতে কাঁদিতে পথে বাহির হইলাম। দেখিলাম, এক যুবতী জলের কলসী কক্ষে লইয়া যাইতেছে। তাহার মুখের উপর গভীর-কৃষ্ণ দোদুল্যমান কুঞ্চিতালকরাজি ; গভীর-কৃষ্ণ ভ্রূযুগ, এবং গভীর-কৃষ্ণ চঞ্চল নয়নতারা দেখিয়া বোধ হইল, যেন পদ্মবনে কতকগুলো ভ্রমর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—বসিতেছে না, উড়িয়া বেড়াইতেছে। তাহার গমনে যেমন অঙ্গ দুলিতেছিল, বোধ হইল, যেন লাবণ্যের নদীতে ছোট ছোট ঢেউ উঠিতেছে ; তাহার প্রতি পদক্ষেপে বোধ হইল, যেন পাঁজরের হাড় ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহাকে দেখিয়া আমার বোধ হইল, নিঃসন্দেহ এই আমার মন চুরি করিয়াছে। আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। সে ফিরিয়া দেখিয়া ঈষৎ রুষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি ও ? সঙ্গ নিয়েছ কেন ?"

আমি বলিলাম, "তুমি আমার মন চুরি করিয়াছ।"

যুবতী কটূক্তি করিয়া গালি দিল। বলিল, "চুরি করি নাই। তোমার ভগিনী আমাকে যাচাই করিতে দিয়াছিল। দর কষিয়া আমি ফিরিয়া দিয়াছি।"

সেই অবধি শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া, মনের সন্ধানে আর রসিকতা করিতে প্রয়াস পাই না, কিন্তু মনে মনে বুঝিয়াছি যে, এ সংসারে আমার মন কোথাও নাই। রহস্য ছাড়িয়া সত্য কথা বলিতেছি, কিছুতেই আমার আর মন নাই। শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দতায় মন নাই যে, রহস্যালাপের আমি প্রিয় ছিলাম, সে রহস্যালাপে আমার মন নাই। আমার কতকগুলি ছেঁড়া পুথি ছিল—তাহাতে আমার মন থাকিত, তাহাতে আমার মন নাই। অর্থসংগ্রহে কখন ছিল না—এখনও নাই। কিছুতেই আমার মন নাই—আমার মন কোথা গেল ?

বুঝিয়াছি, লঘুচেতাদিগের মনের বন্ধন চাই ; নহিলে মন উড়িয়া যায়। আমি কখন কিছুতে মন বাঁধি নাই—এজন্য কিছুতেই মন নাই। এ সংসারে আমরা কি করিতে আসি, তাহা ঠিক বলিতে পারি না—কিন্তু বোধ হয়, কেবল মন বাঁধা দিতেই আসি। আমি চিরকাল আপনার রহিলাম—পরের হইলাম না, এইজন্যই পৃথিবীতে আমার সুখ নাই। যাহারা স্বভাবতঃ নিতান্ত আত্মপ্রিয়, তাহারাও বিবাহ করিয়া, সংসারী হইয়া, স্ত্রী পুত্রের নিকট আত্মসমর্পণ করে, এজন্য তাহারা সুখী। নচেৎ তাহারা কিছুতেই সুখী হইত না। আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি, পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই। ধন, যশঃ, ইন্দ্রিয়াদিলব্ধ সুখ আছে বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে। এ সকল প্রথমবারে যে সুখদায়ক হয়, দ্বিতীয়বারে সে পরিমাণে হয় না, তৃতীয়বারে আরও অল্প সুখদায়ক হয়, ক্রমে অভ্যাসে তাহাতে কিছুই সুখ থাকে না। সুখ থাকে না, কিন্তু দুইটি

অসুখের কারণ জন্মে; প্রথমতঃ অভ্যস্ত কতর ভাবে সুখ না হউক, অভাবে গুরুতর অসুখ হয়; এবং অপরিতোষণীয়া আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধিতে যন্ত্রণা হয়। অতএব পৃথিবীতে যে সকল বিষয় কাম্যবস্তু বলিয়া চিরপরিচিত, তাহা সকলই অতৃপ্তিকর এবং দুঃখের মূল। সকল স্থানেই যশের অনুগামিনী নিন্দা, ইন্দ্রিয়সুখের অনুগামী রোগ, ধনের সঙ্গে ক্ষতি ও মনস্তাপ; কান্ত কপু জরাগ্রস্ত বা ব্যাধিদুষ্ট হয়; সুনামেও মিথ্যা কলঙ্ক রটে; ধন পরদ্বারেও ভোগ করে; মান সম্ভ্রম মেঘমালার ন্যায় শরতের পর আর থাকে না। বিদ্যা তৃপ্তিদায়িনী নহে, কেবল অন্ধকার হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে লইয়া যায়, এ সংসারের তত্ত্বজিজ্ঞাসা কখন নিবারণ করে না। স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে বিদ্যা কখন সক্ষম হয় না। কখন শুনিয়াছ, কেহ বলিয়াছে, আমি ধনোপার্জ্জন করিয়া সুখী হইয়াছি বা যশস্বী হইয়া সুখী হইয়াছি? যেই এই কয় ছত্র পড়িবে, সেই বেশ করিয়া স্মরণ করিয়া দেখুক, কখন এমন শুনিয়াছে কি না। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, কেহ এমত কথা কখন শুনে নাই। ইহার অপেক্ষা ধনমানাদির অকার্য্যকারিতার গুরুতর প্রমাণ আর কি পাওয়া যাইতে পারে? বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এমন অকাট্য প্রমাণ থাকিতেও মনুষ্যমাত্রেই তাহার জন্য প্রাণপাত করে। এ কেবল কুশিক্ষার গুণ। মাতৃস্তন্য দুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ধনমানাদির সর্ব্বসারবত্তায় বিশ্বাস শিশুর হৃদয়ে প্রবেশ করিতে থাকে—শিশু দেখে, রাত্রিদিন পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী গুরু ভৃত্য প্রতিবেশী শত্রু মিত্র সকলেই প্রাণপণে হা অর্থ, হা যশ, হা মান, হা সম্ভ্রম! করিয়া বেড়াইতেছে। সুতরাং শিশু কথা ফুটিবার আগেই সে পথে গমন করিতে শিখে। কবে মনুষ্য নিত্য সুখের একমাত্র মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে? যত বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দার্শনিক, সংসারতত্ত্ববিৎ, যে কেহ আস্ফালন কর, সকলে মিলিয়া দেখ, পরসুখবর্দ্ধন ভিন্ন মনুষ্যের অন্য সুখের মূল আছে কি না? নাই। আমি মরিয়া ছাই হইব, আমার নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবে, কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, একদিন মনুষ্যমাত্রে আমার এই কথা বুঝিবে যে, মনুষ্যের স্থায়ী সুখের অন্য মূল নাই। এখন যেমন লোকে উন্মত্ত হইয়া ধন মান ভোগাদির প্রতি ধাবিত হয়, একদিন মনুষ্যজাতি সেইরূপ উন্মত্ত হইয়া পরের সুখের প্রতি ধাবমান হইবে। আমি মরিয়া ছাই হইব, কিন্তু আমার এ আশা একদিন ফলিবে! ফলিবে, কিন্তু কত দিনে! হায়, কে বলিবে, কত দিনে!

কথাটি প্রাচীন। সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে শাক্যসিংহ এই কথা কত প্রকারে বলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর শত সহস্র লোকশিক্ষক শত সহস্র বার এই শিক্ষা শিখাইয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই লোকে শিখে না—কিছুতেই আত্মাদরের ইন্দ্রজাল কাটাইয়া উঠিতে পারে না। আবার আমাদের দেশ ইংরেজি মুলুক হইয়া এ বিষয়ে বড় গণ্ডগোল বাধিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজি শাসন, ইংরেজি সভ্যতা ও ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে "মেটিরিয়েল প্রস্পেরিটির"* উপর অনুরাগ আসিয়া দেশ উৎসন্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইংরেজ জাতি বাহ্য সম্পদ বড় ভালবাসেন—ইংরেজি সভ্যতার

* বাহ্য সম্পদ্।

এইটি প্রধান চিহ্ন—তাঁহারা আসিয়া এদেশের বাহ্য সম্পদ্ সাধনেই নিযুক্ত—আমার তাহাই ভালবাসিয়া আর সকল বিস্মৃত হইয়াছি। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেবমূর্ত্তিসকল মন্দিরচ্যুত হইয়াছে—সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত কেবল বাহ্য সম্পদের পূজা আরম্ভ হইয়াছে। দেখ, কত বাণিজ্য বাড়িতেছে—দেখ, কেমন রেলওয়েতে হিন্দু-ভূমি জাল-নিবদ্ধ হইয়া উঠিল—দেখিতেছ, টেলিগ্রাফ কেমন বস্তু! দেখিতেছি, কিন্তু কমলাকান্তের জিজ্ঞাসা এই যে, তোমার রেলওয়ে টেলিগ্রাফে কতটুকু মনের সুখ বাড়িবে? আমার এই হারান মন খুঁজিয়া আনিয়া দিতে পারিবে? কাহারও মনের আগুন নিবাইতে পারিবে? ঐ যে কৃপণ ধনতৃষায় মরিতেছে, উহার তৃষা নিবারণ করিবে? অপমানিতের অপমান ফিরাইতে পারিবে? রূপোন্মত্তের ক্রোড়ে রূপসীকে তুলিয়া বসাইতে পারিবে? না পারে, তবে তোমায় রেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতি উপাড়িয়া জলে ফেলিয়া দাও—কমলাকান্ত শর্ম্মা তাতে ক্ষতি বিবেচনা করিবেন না।

কি ইংরেজি, কি বাঙ্গালা, যে সম্বাদ-পত্র, সাময়িক পত্র, স্পীচ, ডিবেট, লেক্‌চর, যাহা কিছু পড়ি বা শুনি, তাহাতে এই বাহ্য সম্পদ্ ভিন্ন আর কোন বিষয়ের কোন কথা দেখিতে পাই না; হর হর বম্ বম্। বাহ্য সম্পদের পূজা কর। হর হর বম্ বম্। টাকার রাশির উপর টাকা ঢাল! টাকা ভক্তি, টাকা মুক্তি, টাকা নতি, টাকা গতি! টাকা ধর্ম্ম, টাকা অর্থ, টাকা কাম, টাকা মোক্ষ! ও পথে যাইও না, দেশের টাকা কমিবে, ও পথে যাও, দেশের টাকা বাড়িবে! বম্ বম্ হর হর। টাকা বাড়াও, টাকা বাড়াও, রেলওয়ে টেলিগ্রাফ অর্থ-প্রসূতি ও মন্দিরে প্রণাম কর! যাতে টাকা বাড়ে, এমন কর; শূন্য হইতে টাকা বৃষ্টি হইতে থাকুক। টাকার ঝন্‌ঝনিতে ভারতবর্ষ পুরিয়া যাউক! মন! মন আবার কি? টাকা ছাড়া মন কি? টাকা ছাড়া আমাদের মন নাই; টাকশালে আমাদের মন ভাঙ্গে গড়ে। টাকাই বাহ্য সম্পদ্। হর হর বম্ বম্। বাহ্য সম্পদের পূজা কর। এ পূজার তাম্রশ্মশ্রুধারী ইংরেজ নামে ঋষিগণ পুরোহিত; এডাম্ স্মিথ পুরাণ এবং মিল তন্ত্র হইতে এ পূজার মন্ত্র পড়িতে হয়; এ উৎসবে ইংরেজি সম্বাদ-পত্রসকল ঢাক ঢোল, বাঙ্গালা সম্বাদ-পত্র কাঁসিদার; শিক্ষা এবং উৎসাহ ইহাতে নৈবেদ্য, এবং হৃদয় ইহাতে ছাগবলি। এ পূজার ফল, ইহলোকে ও পরলোকে অনন্ত নরক। তবে, আইস, সবে মিলিয়া বাহ্য সম্পদের পূজা করি। আইস, যশোগঙ্গার জলে ধৌত করিয়া, বঞ্চনা-বিল্বদলে মিষ্টকথা-চন্দন মাখাইয়া, এই মহাদেবের পূজা করি। বল হর হর বম্ বম্! বাহ্য সম্পদের পূজা করি। বাজা ভাই ঢাক ঢোল—ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্! বাজা ভাই কাঁসিদার, ট্যাং ট্যাং ট্যাং নাট্যাং নাট্যাং! আসুন পুরোহিত মহাশয়! মন্ত্র বলুন। আমাদের এই বহুকালের পুরাতন ঘৃতটুকু লইয়া স্বহা স্বাহা বলিয়া আগুনে ঢালুন। কোথা ভাই ইউটিলিটেরিয়েন্ কামার! পাঁটা হাড়িকাটে ফেলিয়াছি; একবার বাবা পঞ্চানন্দের* নাম করিয়া, এক কোপে পাচার কর! হর হর বম্ বম্! কমলাকান্ত দাঁড়াইয়া আছে, মুড়িটা দিও! তোমরা স্বচ্ছন্দে পূজা কর!

* পঞ্চানন নাম প্রসিদ্ধ নহে—পঞ্চানন্দই প্রসিদ্ধ। মদ্য, মাংস গাড়িজুড়ি, পোষাক এবং বেশ্যা—এই পাঁচটি আনন্দে এই নূতন পঞ্চানন্দ।

পূজা কর, ক্ষতি নাই, কিন্তু আমাকে গোটাকত কথা বুঝাইয়া দাও। তোমার বাহ্য সম্পদে কয়জন অভদ্র ভদ্র হইয়াছে? কয়জন অশিষ্ট শিষ্ট হইয়াছে? কয়জন অধার্ম্মিক ধার্ম্মিক হইয়াছে? কয়জন অপবিত্র পবিত্র হইয়াছে? একজনও না? যদি না হইয়া থাকে, তবে তোমার এই ছাই আমরা চাহি না—আমি হুকুম দিতেছি, এই ছাই ভারতবর্ষ হইতে উঠাইয়া দাও।

তোমাদের কথা আমি বুঝি। উদর নামে বৃহৎ গহ্বর, ইহা প্রত্যহ বুজান চাই; নহিলে নয়। তোমরা বল যে, এই গর্ত্ত যাহাতে সকলেরই ভাল করিয়া বুজে, আমরা সেই চেষ্টায় আছি! আমি বলি, সে মঙ্গলের কথা বটে, কিন্তু উহার অত বাড়াবাড়িতে কাজ নাই। গর্ত্ত বুজাইতে তোমরা এমনই ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছ যে, আর সকলের কথা ভুলিয়া গেলে। বরং গর্ত্তের এক কোণ খালি থাকে, সেও ভাল, তবু আর আর দিকে একটু মন দেওয়া উচিত। গর্ত্ত বুজান হইতে মনের সুখ একটা স্বতন্ত্র সামগ্রী; তাহার বৃদ্ধির কি কোন উপায় হইতে পারে না? তোমরা এত কল করিতেছ, মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয় বৃদ্ধির জন্য কি একটা কিছু কল হয় না? একটু বুদ্ধি খাটাইয়া দেখ, নহিলে সকল বেকল হইয়া যাইবে।

আমি কেবল চিরকাল গর্ত্ত বুজাইয়া আসিয়াছি—কখন পরের জন্য ভাবি নাই। এই জন্য সকল হারাইয়া বসিয়াছি—সংসারে আমার সুখ নাই; পৃথিবীতে আমার থাকিবার আর প্রয়োজন দেখি না। পরের বোঝা কেন ঘাড়ে করিব, এই ভাবিয়া সংসারী হই নাই। তাহার ফল এই যে, কিছুতেই আমার মন নাই! আমি সুখী নহি। কেন হইব? আমি পরের জন্য দায়ী হই নাই, সুখে আমার অধিকার কি?

সুখে আমার অধিকার নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না যে, তোমরা বিবাহ করিয়াছ বলিয়া সুখী হইয়াছ। যদি পারিবারিক স্নেহের গুণে তোমাদের আত্মপ্রিয়তা লুপ্ত না হইয়া থাকে, যদি বিবাহনিবন্ধন তোমাদের চিত্ত মার্জ্জিত না হইয়া থাকে, যদি আত্ম-পরিবারকে ভালবাসিয়া, তাবৎ মনুষ্যজাতিকে ভালবাসিতে না শিখিয়া থাক, তবে মিথ্যা বিবাহ করিয়াছ; কেবল ভূতের বোঝা বহিতেছ। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বা পুত্রমুখ নিরীক্ষণের জন্য বিবাহ নহে। যদি বিবাহবন্ধে মনুষ্য চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয়াদি অভ্যাসের বশ; অভ্যাসে এ সকল একেবারে শান্ত থাকিতে পারে। বরং মনুষ্যজাতি ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া পৃথিবী হইতে লুপ্ত হউক, তথাপি যে বিবাহে প্রীতি শিক্ষা না হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই।

এক্ষণে কমলাকান্ত যুক্ত করে সকলের নিকট নিবেদন করিতেছে, তোমরা কেহ কমলাকান্তের একটি বিবাহ দিতে পার?

ষষ্ঠ সংখ্যা

চন্দ্রালোকে

এই তৃণ-শষ্প-শোভিত হরিৎক্ষেত্রে, এই কলবাহিনী ভাগীরথী তীরে, এই স্ফুটচন্দ্রালোকে, আজি দপ্তরের শ্রীবৃদ্ধি, কলেবর-বৃদ্ধি করিব। এইরূপ চন্দ্রালোকেই না ট্রৈলস্ শর্ম্মা ট্রয়ের উচ্চ প্রাচীরে আরোহণ করিয়া, ক্রিসীদাকে স্মরণ করিয়া, উষ্ণ-শ্বাস ত্যাগ করিতেন! এইরূপ চন্দ্রালোকেই না থিসবী সুন্দরী এইরূপ মৃদু শিশির-পাত-সিক্ত শষ্প মৃদু পদে দলিত করিয়া পিরামসের সঙ্কেতস্থানাভিমুখে অভিসারিণী হইতেন? অভিসারিণী শব্দটিতে অভি একটি উপসর্গ আছে, সৃ একটি ধাতু আছে এবং স্ত্রীত্ববাচক একটি 'ইনী' আছে; এই জীবনে কমলাকান্ত শর্ম্মা কত উপসর্গ দেখিলেন, কত লোকের ধাতু ছাড়িল গঠিল দেখিলেন, কত ইনীও গেলেন, কিন্তু সোপসর্গ ধাতুবিশিষ্ট একটি ইনীও কখন দেখিলাম না। কমলাকান্ত উপসর্গে কোন ইনীর ধাতু বিগড়াইল না। কমলাভিসারিণী, এরূপ নায়িকা কখন হইল না। যাহারা দধি দুগ্ধ বিক্রয়ার্থ আগমন করে, তাহাদিগকে শ্রীমদ্ভাগবতে "পসারিণী" বলিয়াছে, কখন "অভিসারিণী" বলিয়াছে, এরূপ স্মরণ হয় না, তাহা যদি বলিত, তাহা হইলে অনেক অভিসারিণী দেখিয়াছি বলিতে পারিতাম।

চন্দ্র, তুমি হাস্য করিতেছ? হেসে হেসে ভেসে উঠিতেছ? তোমার সাতাইশ ইনী লুব্ধ আমাকে দেখিয়া, আমার প্রতি চক্ষু টিপিয়া উপহাস করিতেছ? দক্ষ রাজার যেমন কর্ম্ম— একেবারে সাতাইশটিকে এক চন্দ্রে সমর্পণ করিলেন, আর এখন কমলাকান্ত শর্ম্মা বিবাহের জন্য লালায়িত। অমল-ধবল-কিরণরাশি সুধাংশো! আর সকল তোমার থাক্, তুমি অন্ততঃ অশ্লেষা মঘাকে ছাড়িয়া দেও, আমি ওই দুইটিকে বড় ভালবাসি। আমার মত নিষ্কর্ম্মা লোক উহাদের কল্যাণে অন্ততঃ দুই দিন গৃহবাসসুখ উপলব্ধি করিতে পারে। আমি ঐ ভগিনীদ্বয়কে আমার ভবনে চিরকাল জন্য স্থান দান করিয়া সুখে কাল কর্ত্তন করিব। ইহাদিগের আরও অনেক গুণ আছে—লোকে নিজে অক্ষমতানিবন্ধন কোন কর্ম্ম করিতে না পারিয়া, স্বচ্ছন্দে ইহাদিগের দোহাই দিয়া, লোকের কাছে আস্ফালন করিতে পারে আমিও নসীবাবুর কাপড় কিনিতে যদি নির্বুদ্ধিতাবশতঃ প্রতারিত হইয়া আসি, আমার সহধর্ম্মিণীদ্বয়ের স্কন্ধে সমস্ত দোষ অর্পণ করিয়া সাফাই করিতে পারিব।

চন্দ্রদেব! তুমি আমার কথায় কর্ণপাত করিলে না? এখনও মন্দাকিনীর মন্দান্দোলিত বক্ষ-বসন করস্পর্শে প্রতিভাসিত করিতেছ? এখনও মন্দ সমীরণের সহ পরামর্শ করিয়া বৃক্ষের অগ্রভাগে পলকে পলকে ঝলক বর্ষণ করিবে? এখন তৃণক্ষেত্রে মণি মুক্তা মরকত অকাতরে ছড়াইয়া দিবে? উলুবনে মুক্তা, আর কেহ ছড়াক আর না ছড়াক, দেখিতেছি তুমি ছড়াইয়া থাক। আর আজ আমি ছড়াইব!

এই সংসারের লোক, এই বল্লালসেনের প্র-পরা-অপ-পৌত্রেরা এবং তাহার নির্-দুর্-বি-অধি-দৌহিত্রেরা আমাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে। আমার বক্ষের উপরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বি. এ. না হলে বিয়ে হয় না। এইবার সংসার ডুবিল। উচ্চ শিক্ষার ফল কি? ছাপর খাট রূপার কলসী, গরদের কাচা, এবং স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিতা, পট্ট-বসনাবৃতা, একটি বংশখণ্ডিকা! হরি হরি বল, ভাই! তৃণগ্রাহী পাণ্ডিত্যাভিমানী বি. এ. উপাধিধারী উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত নব বঙ্গবাসীর, কলসী বস্ত্র বংশখট্টাসমেত সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হইল!!!* প্রথমে উপাধি পাইয়াছিলেন, এবার সমাধি পাইলেন। তিনি বিলাতী ব্রহ্মে লীন হইলেন। বঙ্গীয় যুবক সংসারী হইলেন। তাঁহার উচ্চশিক্ষা তাঁহাকে তাঁহার চরমধামে পৌঁছিয়া দিয়াছে। তিনি সহস্র তোলক পরিমিত রজতপাত্র, শত তোলক পরিমিত স্বর্ণালঙ্কার এবং সংসার-কুটিরের একমাত্র দাণ্ডকা একটি বংশ-খণ্ডিকা পাইয়াছেন, তিনি তাঁহার চিরবাঞ্ছিত হেমকূট পর্ব্বত-নিকটস্থ কিষ্কিন্ধ্যাপুরীর সরকারি ওকালতী পাইয়াছেন, হরি হরি বল, ভাই! তাঁহার এত দিনে সমাধি হইল!!! তিনি উচ্চশিক্ষালাভার্থ বহু যত্নে কামস্কট্কা দেশের নদীসকলের নাম কণ্ঠাগ্রে করিয়াছিলেন! এই উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি নিশীথপ্রদীপে অনন্যমনে শাহারা মরুভূমির বালুকাপুঞ্জের সংখ্যা অবধারণ করিয়াছিলেন। এই উচ্চশিক্ষার জন্যই শার্লিমানের উর্দ্ধে বায়ান্ন পুরুষ, নিম্নে সাড়ে তিপ্পান্ন পুরুষের কুলাজি মুখস্ত করিয়াছেন। এই উচ্চশিক্ষা-বলে তিনি শিখিয়াছেন যে, টাউনহলে বক্তৃতা করিতে পারিলেই পরম পুরুষার্থ, ইংরেজের নিন্দা যে কোন প্রকারে করিতে পারিলেই রাজনীতির একশেষ হইল। এবং বংশ-দাণ্ডকার স্থাপন করিয়া উমেদার গোষ্ঠীর বৃদ্ধি করিয়া দেশ জঙ্গলময় করিতে পারিলেই কলির জীব-ধর্ম্মের চরিতার্থতা হইল।

এরূপ বংশ-দাণ্ডকা-প্রয়াসী আমি নহি; আমি উইল করিয়া যাইব, সাত পুরুষ বিবাহ করিতে না হয়, তাও কর্ত্তব্য, তথাপি এরূপ বংশ-দান্ডকা আশ্রয়ে স্বর্গ-প্রাপ্তির বাঞ্ছাও কেহ না করে। যদি জীবপ্রবাহ বৃদ্ধি করাই বিবাহের উদ্দেশ্য হয়, তবে আমি মৎস্যাদি বিবাহ করিব, যদি টাকার জন্য বিবাহ করিতে হয়, তবে আমি টাকশালের অধ্যক্ষকে বিবাহ করিব; আর যদি সৌন্দর্য্যার্থে বিবাহ করিতে হয়, তবে ঘোমটাটানা চাঁদবদনীদের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া, ঐ আকাশের চাঁদকে বিবাহ করিব।

ভাগীরথি! যদি তুমি শান্তনুবক্ষে অথবা তদপেক্ষা উচ্চতর হিমালয়-ভবনে, অথবা আরো উচ্চতর ধূর্জ্জটির জটা-কলাপে বিরাজ করিতে, তাহা হইলে কে আজ তোমায় উপাসনা করিত? তুমি নীচগা হইয়া, মর্ত্ত্যে অবতরণ করিয়া সহস্রধা হইয়া সাগরোদ্দেশে গমন করিয়াছিলে বলিয়াই সগর-বংশের উদ্ধার হইয়াছে। সমীরণ! তুমি যদি অঞ্জনার অঞ্চল লইয়া চিরক্রীড়াসক্ত থাকিতে, অথবা মলয়াচলে স্বীয় প্রমোদভবনে চন্দন-শাখা নমিত করিয়া বা এলা-লতা কম্পিত করিয়া পরিভ্রমণ করিতে, তাহা হইলে কে তোমাকে

* বোধ হয়, এই রাত্রি হইতেই কমলাকান্তের বাতিকের বড় বাড়াবাড়ি হইয়াছিল।
—শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীশ।

"ত্বমেব জগজ্জীবনং পালনং" বলিয়া আর তোমার স্তব স্তুতি করিত? এই বাল-বসন্ত-বিহারী বিহঙ্গমকুলের কাকলি যদি কেবল নন্দন-কাননেই প্রতিধ্বনিত হইত তাহা হইলে কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী তাহাদের নাম করিয়া এই রাত্রিকালে স্বীয় মসী লেখনীর অনর্থক ক্ষয় করিবে কেন? শুধাংশো! যদি তুমি ক্ষীরোদ-সাগরতলে, অমৃত-ভাণ্ডারে, প্রবালপালঙ্কে মৌক্তিক-শয্যায় শায়িত থাকিতে, তাহা হইলে কে তোমার সহিত রমণীমুখ-মণ্ডলের তুলনা করিত? অথবা তোমার ঐ সাতাইশটি ক্রমান্বয় ভর্ত্তৃকা লইয়া খলু সার শ্বশুর-মন্দির দক্ষালয়ে বাস করিতে, তাহা হইলে আজি কমল শর্ম্মা কি তোমার দর্শনাভিলাষী হইয়া—এই শ্মশাননিকট বটতলায় তীরস্থ হইয়া বাস করে?

শশী—যদি তোমার ব্যাকরণ পড়া থাকে, তবে আমাকে মাপ করিও, আমি প্রাণান্তেও শশিন্ বলিতে পারিব না—আমি এতক্ষণ তোমার গুণের অনুধ্যান করিতেছিলাম; শশী, তুমি অনাথার কুটীরদ্বারে প্রহরীরূপে অনিমেষনয়নে বসিয়া থাক, আধভাষী শিশু যখন নাচিতে নাচিতে তোমায় ধরিতে যায়, তুমি তাহার সঙ্গে নাচিতে নাচিতে খেলা কর, বালিকা যখন স্বচ্ছ সরোবরহৃদয়ে তোমায় একবার দেখিতে পাইয়া, একবার না পাইয়া, তোমার সন্দর্শন লাভার্থ, ইতস্ততঃ সরোবরকূলে দৌড়িতে থাকে, তখন তুমি এক একবার ঈষৎ দেখা দিয়া তাহার সহিত কেবল লুকোচুরি খেলিতে থাক, নববধূ যখন মন্দ বাত সহিত প্রাসাদোপরি একাকিনী দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে থাকে, তখন তুমি নারিকেলকুঞ্জান্তরাল হইতে অতি ধীরে ধীরে তাহার হৃদয় ভরিয়া অমৃত বর্ষণ করিয়া তাহাকে ক্রমে শীতল কর; যখন তরঙ্গিণী আশা-তরঙ্গিত-হৃদয়ে ধীরে প্রবাহে মন্দগতিতে সিন্ধু-অভিগামিনী হয়, তখন তুমিই তাহাকে স্বর্ণ-ভূষণে ভূষিত করিয়া পথ প্রদর্শন করিয়া থাক; গোলাপ যখন বসন্ত রাগে এক বৃন্তে চারিদিক দেখিয়া হেলিতে দুলিতে থাকে, তখন তুমিই তাহাকে মালতী লতাকে চুম্বন করিতে কানে কানে পরামর্শ দেও। আবার সেই তুমিই অসদভিসন্ধিৎসু নর যখন কুলকামিনীর ধর্ম্মনাশে প্রবৃত্ত হও, তখন তোমার কোমল মুখমণ্ডলে এমনি ভ্রূকুটি করিতে থাক যে, সে তোমার মুখপানে আর দৃষ্টিক্ষেপ করিতে সমর্থ হয় না; তুমিই নরহত্যাকারীর তরবারিফলকে বিদ্যুৎ চমকাইয়া দেও, তাহার পাপ শোণিতবিন্দুতে চৌর্যাট্ট রৌরব প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়া দেও।

তুমি ক্রীড়াশীল শিশুর চলৎ স্বর্ণস্থালী, তরুণের আশা-প্রদীপ, যুবক যুবতীর যামিনীযাপনের প্রধান সম্ভোগ-পদার্থ; এবং স্থবিরের স্মৃতি-দর্পণ। তুমি অনাথার প্রহরী, স্থির দীপধারী; তুমি পথিকের পথ-প্রদর্শক; গৃহীর নৈশ সূর্য্য; তুমি পাপীর পাপের সাক্ষী; পুণ্যাত্মার চক্ষে তাহার যশঃপতাকা। তুমি গগনের উজ্জ্বল মণি; জগতের শোভা। আর এই শ্মশানবিহারী শ্রীকমলাকান্তের একমাত্র সম্বল; তুমি ভালর ভাল, মন্দের মন্দ; রসে রস, বিরসে বিষ। তুমি কমলাকান্তের সহধর্ম্মিণী; শশী, আমি তোমায় বড় ভালবাসি, আমি তোমাকেই বিবাহ করিব। সকলে হরি হরি বল, ভাই! আজ এইখানে বাসর যাপন—সকলে একবার হরি হরি বল, ভাই!

বম্ ভোলানাথ! চন্দ্র যে পুরুষ! তবে ডবল মাত্রা চড়াইতে হইল!

চন্দ্র আমাদিগের আর্য্য মতে পুরুষ বটে, কিন্তু বিলাতীয় শর্ম্মাদিগের মতে ইনি

কোমলাঙ্গী। আমাদিগের মতে চন্দ্র হি,* ইংরাজি মতে চন্দ্র শী। এখন উপায়? হি কি শী, তাহা স্থির হইবে কি প্রকারে?

বাস্তবিক এই বিষয়ে সংসারের লোকের সঙ্গে আমার কখন মতের ঐক্য হইল না। আমার এ বিষয়ে নানা সন্দেহ হয়। যে ওয়াজিদালিশাহা লক্ষৌ নগরী হইতে স্বচ্ছন্দে চতুর্দ্দোলারোহণে মুচিখোলায় আগমন করিয়া, হংস-হংসী, কপোত-কপোতী লইয়া ক্রীড়া করেন, গোলাপ সহিত বারি-হ্রদে নিত্য স্নান করিয়া, স্বীয়ানুরূপী পিঞ্জরস্থ বুলবুলিকে সঘৃত পলান্ন প্রদান করেন, তিনি হি না শী? এবং যে মহিষী দেশবাৎসল্যে ঐহিক সুখ-সম্পত্তি বিসর্জ্জন করিয়া—রাজপুরুষগণের শরণাপন্ন হওয়াপেক্ষা ভিক্ষান্ন শ্রেয়ঃ বোধে, নেপালের পার্ব্বতীয় প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছেন, তিনি শী না হি? তবে ত সাহসকে হি-শীর প্রভেদক করা যায় না। তবে যুদ্ধ-নৈপুণ্যে হি-শীর প্রভেদ হইবে? যে জোয়ান ওর্লিয়ান্স দুর্গ আক্রমণকালে সর্ব্বপ্রথমে পদার্পণ করিয়াছিল, যে ফ্রান্সের পুনরুদ্ধার করিয়াছিল, তাহাকে শী বলিব, না হি বলিব? আর যে বেড্‌ফোর্ড—তাহাকে পাকচক্রে ফেলিবার জন্য সেই জোয়ানের কারাগারে পুরুষের বস্ত্র সংরক্ষণ করিয়াছিল, তাহাকেই বা হি বলিব না শী বলিব? না, যুদ্ধ-কৌশলে বুঝিতে পারিলাম না। তবে শুন্য যায়, যে বলীয়ান্, সেই পুরুষ, আর যে জাতি দুর্ব্বল, তাহারাই স্ত্রীলোক। ভাল—কোমৎ আপনাকে নীতিরাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা স্থির করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট কর যাচঞা করিয়াছিলেন, সেই অতুল প্রতাপশালীকে যে মাদম ক্লোতিলড দেবো স্বীয় প্রত্যাপের আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাকে শী বলিব, না হি বলিব? রোমক পত্তনের কৈসরগণ এক একজন পৃথিবীর রাজা, যে মৈসরী রাজ্ঞী ক্লিওপেটরা এরূপ তিনজন কৈসরের উপর রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহাকে শী বলিব, না হি বলিব? বাস্তবিক জগতে কে হি, কে শী, তাহা স্থির করা যায় না। সেদিন কীর্ত্তন হইতেছিল, যখন কীর্ত্তন-গায়িকা বলিল—"সিংহিনী হইয়া শিবপদ সেবিব?" এবং বঙ্গ নব্য-সম্প্রদায়েরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ, চিত্তপুত্তলিকার ন্যায় তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, আমার বাস্তবিক সেই কীর্ত্তন-গায়িকাকে সিংহবৎ বোধ হইয়াছিল এবং সেই সমস্ত বাঙ্গালি যুবককেই আমি শিবাস্বরূপ মনে করিয়াছিলাম। তখন যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিত, এর কোন্‌গুলি হি, আর কোন্‌গুলিই বা শী; তাহা হইলে আমি অবশ্য বলিতাম যে, সেই কীর্ত্তনকারিণীই হি এবং তাঁহার জড়বৎ শ্রোতৃবর্গই শী। বাস্তবিক বঙ্গীয় যুবকেরা কোথাও হি, কোথাও শী, এবং সর্ব্বত্র বিকল্পে ইট্ হন। তাহার নিত্যাবিধিও আছে। যথা—ইয়ারকিতে হি, শয্যাগৃহে শী, এবং বিষয়কর্ম্মে ইট্। তাঁহারা বক্তৃতায় সময় হন নি, সাহেবের কাছে শী, মদ খাইলে হন ইট্। ফলে ইট্ যাহা হউক, হি, শীর বিষয়ে আমার আপনা-আপনি অনেক সন্দেহ হয়। মধু চাটুয্যে আমার নাম সংযোগ করিয়া কি বিদ্রূপ করিয়াছিল বলিয়া, যে প্রসন্ন, স্বচ্ছন্দে পূর্ণদুগ্ধ-কুম্ভ তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া, চাটুয্যের বক্ষ-কবাটের বল পরীক্ষা করণার্থ কোনরূপ বিশেষ

* হি শী কাহাকে বলে? শুনিয়াছি, দুইটি ইংরাজি সর্ব্বনাম—হি পুংলিঙ্গ—শী স্ত্রীলিঙ্গ।
—শ্রীভীষ্মদেব

আয়ুষ প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, সে প্রসন্ন সংসারের মতে হইল শী—আর আমি—নসীবাবু কি না এক দিন বলিয়াছিলেন যে—"চক্রবর্ত্তী ঝিমুতে ঝিমুতে আজ বিছানাটা পোড়ালে, একদিন একটা লঙ্কাকাণ্ড করিবে দেখ্‌ছি"—সেই ভয়ে আফিমের মাত্রা কমাইয়া দিলাম, সেই আমি হইলাম হি ? এইরূপ বিচারের জন্যই সংসারের সঙ্গে আমার বিবাদ বিসম্বাদ। ফল কথা যখন আমি নিজে হি, কি শী, তাহা নিশ্চয় করা দুষ্কর, তখন চন্দ্র হি, কিম্বা শী, তাহার স্থিরতা কি প্রকারে হইবে ? যদি চন্দ্র হি হয়েন, ত আমি শী—কেন না, আমার সহিত চন্দ্রের ভালবাসা জন্মিয়াছে। এবং আমার চন্দ্রকে বিবাহ করিতেই হইবে। আর আমি যদি প্রকৃত একজন কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী হই, তাহা হইলে চন্দ্র শী। চন্দ্র বিলাতীয় মতে শী। আমি তাহা হইলে চন্দ্রকে বিলাতীয় মতে পাণিগ্রহণ করিব।

এখন নানা মতে নানা কার্য্য হইতেছে; আমি বিজাতীয় মতে বিবাহ করিব। এখন দশাবতার দশকর্ম্মান্বিত হইয়াছেন। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ টেবিলের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছেন। নৃসিংহরাম কমলাকান্তরূপে দৈত্যকুলের প্রহ্লাদগণের আশ্রয়ীভূত হইয়াছেন। বামনাবতারে বঙ্গীয় যুবকগণ, আমার সোনারচাঁদ শশীকে স্পর্শ করিতে স্পর্দ্ধা করে। প্রথম রামের স্থানে ইঁহারা মাতৃ-সেবা, দ্বিতীয় রামের স্থানে পত্নীসেবা, এবং শেষ রামের নিকটে বারুণী-সেবা শিক্ষা করিয়াছেন। ইঁহারা বৌদ্ধ-মতে সংসারের অনিত্যতা স্থির করিয়া, কল্কিমতে সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। এখনকার কালে শাক্ত-মতে ভোজ্য প্রস্তুত হইয়া, তাহা শৈব-ত্রিশূলে বিদ্ধ করিয়া গলাধঃকরণ করিতে হয়; তাহার পর সৌর পান সেবনীয়। আবার জিরুশালমের প্রথম গৌরাঙ্গের উপদেশ মত ভজনশালা করিতে হয়। মেজো গৌরাঙ্গ নবদ্বীপবাসীর মত হরিসংকীর্ত্তন করিতে হয়, রাধানগরের ছোট গৌরাঙ্গের মত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিতে হয়।

সুতরাং শশী, পূর্ণশশী, আজি আমি তোমাকে ইংরাজি মতে, শী স্থির করিয়া, খোস্ বাহালে সুস্থ শরীরে, খোস্ তবিয়তে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিবাহ করিলাম। আমি পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে অন্যের বিনা সরিকতে তোমাতে ভোগ দখল করিতে থাকিব। ইহাতে তুমি কিম্বা তোমার স্থলাভিষিক্ত কেহ কখন কোন আপত্তি কর বা করে, তাহা নামঞ্জুর হইবে। তোমার সাতাইশটিতে আজ হইতে আমার সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার হইল।

আর অমন করিয়া, পা টিপিয়া, পা টিপিয়া, ঢলে পড়িয়া রোহিণীর সঙ্গে কথা কহিলে কি হইবে ? আর অমন করে মুচ্‌কে হেসে পাতলা মেঘের ঘোমটা টেনে তর্ তর্ করিয়া কত দূর চলিয়া যাইবে ? ইতি কোর্টশিপ সমাপ্ত :—

এক্ষণে গান্ধর্ব্ব বিবাহ। আমি বরমাল্য প্রদান করিলাম, তুমি বরমাল্য প্রদান কর।

কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা, বরকর্ত্তা বর।
নিজ মন পুরোহিত, শ্মশানে বাসর ॥

এক বার হরি বল, ভাই! হরি হরি বোল।

আজ অবধি আর চন্দ্রকে দেখিয়া কমল মুদিত হইবে না। কমল ফুল্ল হইতে দেখিলে আর চন্দ্র ম্লান হইবে না। এই বার ভারতবর্ষীয় কবিগণের কবিত্ব লোপ হইল—পূর্বে

কমল মুদিত আঁখি চন্দ্রেরে হেরিলে,

এখন

চন্দ্রেরে দেখিতে দেখ কমল আঁখি মিলে।

চন্দ্রের হৃদয়ে কালি কলঙ্ক কেবল,

কিন্তু

কমল হৃদয়ে চন্দ্র কেবল উজ্জ্বল।

আহা! আমি আমার চন্দ্রকে হারাইয়া দিয়াছি। বর বড়, না ক'নে বড়, এই দেখ, বর বড়—

চন্দ্রে সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়,

চক্রবর্ত্তী পরিপূর্ণ এক কাঁদি কলায়।

সেই কলা কভু লুপ্ত কভু বর্ত্তমান।

কমলের বাগানের সব মর্ত্তমান।

দেখ শশী, এখন নির্জ্জন হইল। তোমাকে গোটাকত কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

তুমি তোমার রূপ-গৌরবে গর্ব্বিতা হইয়া যেখানে সেখানে ও রূপের ছড়াছড়ি করিও না। যখন পুত্র-শোকাতুরা মাতা বক্ষে করাঘাত করিয়া তোমার দিকে লক্ষ্য করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে, তখন তুমি তাহার কাছে রূপ দেখাইয়া কি করিবে? তখন কলঙ্কিনি! তোমার রূপরাশি গাঢ় মেঘান্তরালে লুক্কায়িত করিয়া রাখিও। যখন সংসারজ্বালাজালে লোকে দগ্ধ হইয়া তোমার দরবারে আসিয়া অভিযোগ করিবে, তখন তোমার সৌন্দর্য্য-বিকাশ তাহার কাছে করিও না; যে সংসারদগ্ধ, তাহার পক্ষে সে সৌন্দর্য্য তীব্র বিষক্ষেপরূপ হইবে। বরং রক্ত রাগে তাহার সহিত আলাপ করিও। যে সকলকে ঘৃণা করিয়াছে, কাহারও প্রীতি সে সহ্য করিতে পারে না। আর যে ঐহিক চরম সুখের সীমা উপলব্ধি করিয়া আত্মবিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাকে আর বৃথা আশা দিয়া সান্ত্বনা করিও না। তুমি এক্ষণে আমার এক-ভোগ্যা, তুমি আর কি দেখাইয়া অপরকে সান্ত্বনা করিবে? কিন্তু কমলাকান্তের সময় অসময় নাই, ঘটন বিঘটন নাই, সুখ দুঃখ নাই। তুমি সর্ব্বদাই আমার নিকট আসিবে; তোমার নিজকথা আমাকে বলিবে, আমার কথা শুনিয়া যাইয়া, আপনার অন্তরে আপনার অস্থি-মজ্জার সহিত সেই কথা মিশাইয়া, রাখিয়া দিবে। তুমি জ্যোৎস্না রাত্রিতে আমার সহিত দেখা করিতে আসিও, ও কোমল কান্তি লইয়া অন্ধকারে বিচরণ করিও না। অদ্য আমাদের যে সুখের দিন, তাহা তুমি আমি ব্যতীত কে বুঝিতে পারিবে? অদ্য হইতে মাস গণনা করিয়া, প্রতি মাসের শেষে আমরা এই গঙ্গাতীরে শষ্প-বাসর সমাপন করিব। সকল পূর্ণ মাসেই তুমি হঠাৎ আমার কাছে আগমন করিও না; পঞ্জিকাকারগণের সহিত দিন ক্ষণের পরামর্শ করিয়া কমলাভিসারিণী হইও, নচেৎ একদিন রাহু তোমাকে

পথিমধ্যে হঠাৎ মসীময়ী করিয়া ক্লিষ্ট করিবে। আর এই বিবাহ-রাত্রিতে নববধূকে অধিক উপদেশ প্রদান করিতে গেলে ধর্ম্ম-যাজকতার ভাণ হয়। সুতরাং অলমতি-বিস্তরেণ।

এখন একবার,

কমল শশীর বাসর ঘরে,
ডাক রে কোকিল পঞ্চম স্বরে।

এখন শশী, একবার এই মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া তরঙ্গের উপর অপ্সরা-ছাঁদে নৃত্য কর দেখি। একবার কাল মেঘের ভিতর বেগে দৌড়াইয়া গিয়া, একবার অনন্ত গগনের অনন্ত পথে উল্টাইয়া পড় দেখি! একবার গভীর মেঘে ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া রন্ধ্রপথে একচক্ষু দিয়া আমার দিকে মধুর দৃষ্টিপাত কর দেখি! একবার নক্ষত্রে নক্ষত্রে কলহ বাধাইয়া দিয়া, তাহারা যেমন পরস্পর সংগ্রাম করিতে আসিবে, অমনি তাহাদের উভয় দলের ব্যূহ বিদীর্ণ করিয়া বেগে ধাবিত হও দেখি! একবার দ্রুত সঞ্চালনে শ্রান্তি বোধ করিয়া মুক্তাবিনিন্দিত স্বেদবিন্দুসিক্ত কপালে ঘোমটা তুলিয়া দিয়া গগনগবাক্ষে স্থির দৃষ্টিতে বসিয়া বায়ু সেবন কর দেখি! একবার অজস্র সুধাবর্ষণ করিয়া চকোরচক্রের অপরিতৃপ্ত রসনার তৃপ্তি সাধন কর দেখি; একবার শুভক্ষণে কমলাকান্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হও, কমলাকান্ত শয়ন করিল।

শশী, তুমি ক্ষীরোদ-সাগরজা ত্রিভুবন-বিহারিণী হইয়াও বালিকা-স্বভাব-সুলভ অভিমানের ভজনা করিলে? কমলাকান্ত কোন্ দোষে দোষী বলিতে পারি না—কখন একবার স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ-জটিলতা-জাল-ছেদনার্থ উদাহরণচ্ছলে প্রসন্নর নাম করিয়াছিলাম বলিয়া এত অভিমান আজিকার রজনীতে ভাল দেখায় না। দেখ, তুমি কলঙ্কিনী, তবু আমি তোমাকে গ্রহণ করিলাম। তোমাকে বিবাহ করিয়াছি বলিয়া অদ্যাবধি Lunatic* নাম ধরিলাম। জ্যোতির্ব্বিদেরা বলিয়া থাকেন, তুমি পাষাণী—তবু আমি তোমাকে বিবাহ করিলাম। তাঁহারা বলেন, তোমাতে মনুষ্যত্ব নাই, তবু আমি তোমাকে বিবাহ করিলাম। তবু রাগ?—তবে এই সংসার-গরল-খণ্ডন, এই গিরি-তরু-শিরসি-মণ্ডন, ঐ কর-লেখা আমার মাথায় তুলিয়া দাও। পার যদি, ঐ অনন্তনীল বৃন্দাবনে, মেঘের ঘোমটা একবার টানিয়া, একবার রাই মানিনী হইয়া বসো। আমি একবার স্ত্রীলোকের পায়ে ধরিয়া এ জড়জীবন সার্থক করিয়া লই।‡ আমি যদি শত দোষে দোষী হইলেও তোমা হইতেই আমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। তুমি আমার চান্দ্রায়ণের চন্দ্র-ফলক! আমার বৈতরণীর নবীন বৎস।

অমন করিলে আমি শত সহস্র বিবাহ করিব। এখন কমলাকান্ত নূতন বিবাহের রীতিপদ্ধতি শিক্ষা করিয়াছে। কমল এখন স্বয়ং বর, কর্ত্তা, পুরোহিত, ঘটক হইতে শিখিয়াছে। কমল এখন যেখানে সেখানে বিবাহ করিতে পারে। যখন দেখিব, নব

* চন্দ্রগ্রস্ত, চাঁদে পাওয়া বা পাগল।

‡ আমি জানি, কমলাকান্ত একদিন প্রসন্ন গোয়ালার পায়ে ধরিয়াছে। কিন্তু সে দুধের জন্য।
—শ্রীভীষ্মদেব

পল্লবিকা শাখা-স্কন্ধ হইতে মুখ বাড়াইয়া করপত্র সঞ্চালনে আহ্বান করিতেছে, তখনই আমি তাহাকে বিবাহ করিব। যখন দেখিব, পদ্মমুখী স্বচ্ছ সরসী-দর্পণে আপনার মুখ বঙ্কিম গ্রীবায় নিরীক্ষণ করিয়া হাসিতেছে, তখনই আমি স্থলকমলে, জলকমল মিশাইয়া দিব। যখন দেখিব, নির্ঝরিণী রামধনুক ধরিয়া আনিয়া তাহাই লোফালুফি করিয়া খেলা করিতেছে, তখনই তাহাকে সেই ধনুর স্পর্শ করাইয়া শপথ দিয়া আমার সঙ্গিনী করিয়া লইব। যখন দেখিব, অনন্ত শয্যায় স্বর্ণাদি মণিভূষায় শ্বেতাম্বরে ভূষিত হইয়া উত্তর-দক্ষিণ শয়নে নিদ্রা যাইতেছে, তখনই তাহাকে পাণিগ্রহণে ধীরে ধীরে জাগরিত করিয়া অর্দ্ধাঙ্গের ভাগিনী করিব। যখন দেখিব, কুন্তলতা কানে ঝুমকা দোলাইয়া শ্যাম চিকুররাশি চারিদিকে ছড়াইয়া নিস্তব্ধভাবে মৃদু সৌর কিরণে ঈষত্তপ্ত হইতেছে, তখনই তাহার কেশগুচ্ছমধ্যে মস্তক সন্নিবেশিত করিয়া তাহার ঝুমকা সরাইয়া দিয়া তাহার বরকে চিনাইয়া দিব। কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী এখন বিবাহ করিতে শিখিল, ঘটকালী শিখিল, আর কাহারও উপাসনা করিবে না। যদি তোমরা আমার পরামর্শে শ্রদ্ধা কর, ত আমার মত বিবাহ কর—আমি বেশ ঘটকালী জানি, তোমাদের মনের মত সামগ্রী মিলাইয়া দিব।

সপ্তম সংখ্যা

বসন্তের কোকিল

তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফুটে, দক্ষিণ বাতাস বহে, এ সংসার সুখের স্পর্শে শিহরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ কর। আর যখন দারুণ শীতে জীবলোকে থরহরি কম্প লাগে, তখন কোথায় থাক, বাপু? যখন শ্রাবণের ধারায় আমার চালাঘরে নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে কাক চিল ভিজিয়া গোময় হয়, তখন তোমার মাজা মাজা কালো কালো দুলালী ধরণের শরীরখানি কোথায় থাকে? তুমি বসন্তের কোকিল, শীত বর্ষার কেহ নও।

রাগ করিও না—তোমার মত আমাদের মাঝখানে অনেকে আছেন। যখন নসীবাবুর তালুকের খাজনা আসে, তখন মানুষ-কোকিলে তাঁহার গৃহকুঞ্জ পুরিয়া যায়—কত টিকি, ফোঁটা, তেড়ি চসমার হাট লাগিয়া যায়, কত কবিতা, শ্লোক, গীত, হেটো ইংরেজী, মেঠো ইংরেজি, চোরা ইংরেজি, ছেঁড়া ইংরেজিতে নসীবাবুর বৈঠকখানা পারাবত-কাকলি-সঙ্কুল গৃহসৌধবৎ বিকুত হইয়া উঠে। যখন তাঁহার বাড়ীতে নাচ, গান, যাত্রা, পর্ব্ব উপস্থিত হয়, তখন দলে দলে মানুষ-কোকিল আসিয়া তাঁহার ঘর বাড়ী আঁধার করিয়া তুলে—কেহ খায়, কেহ গায়, কেহ হাসে, কেহ কাশে, কেহ তামাক পোড়ায়, কেহ হাসিয়া বেড়ায়, কেহ মাত্রা চড়ায়, কেহ টেবিলের নীচে গড়ায়। যখন নসীবাবু বাগানে যান, তখন মানুষ-কোকিল, তাঁহার সঙ্গে পিপীড়ার সারি দেয়। আর যে রাত্রে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল, আর নসীবাবুর পুত্রটির অকালে মৃত্যু হইল, তখন তিনি একটি লোক

পাইলেন না। কাহারও "অসুখ", এজন্য আসিতে পারিলেন না ; কাহারও বড় সুখ—একটি নাতি হইয়াছে, এজন্য আসিতে পারিলেন না ; কাহারও সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, এজন্য আসিতে পারিলেন না ; কেহ সমস্ত রাত্রি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, এজন্য আসিতে পারিলেন না। আসল কথা, সেদিন বর্ষা, বসন্ত নহে, বসন্তের কোকিল সেদিন আসিবে কেন ?

তা ভাই বসন্তের কোকিল, তোমার দোষ নাই, তুমি ডাক। ঐ অশোকের ডালে বসিয়া রাঙ্গা ফুলের রাশির মধ্যে কালো শরীর, জ্বলন্ত আগুনের মধ্যগত কালো বেগুনের মত, লুকাইয়া রাখিয়া, একবার তোমার ঐ পঞ্চম স্বরে, কু—উ বলিয়া ডাক। তোমার ঐ কু—উ রবটি আমি বড় ভালবাসি। তুমি নিজে কালো—পরান্নপ্রতিপালিত, তোমার চক্ষে সকলই "কু"—তবে যত পার, ঐ পঞ্চম স্বরে ডাকিয়া বল, "কু—উ।" যখন এ পৃথিবীতে এমন কিছু সুন্দর সামগ্রী দেখিবে যে, তাহাতে আমার দ্বেষহিংসা, ঈর্ষ্যার উদয় হয়, তখনই উচ্চ ডালে বসিয়া ডাকিয়া বলিও, "কু—উ"—কেন না, তুমি সৌন্দর্য্যশূন্য, পরান্নপ্রতিপালিত। যখনই দেখিবে, লতা সন্ধ্যার বাতাস পাইয়া, উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত পুষ্প-স্তবক লইয়া দুলিয়া উঠিল, অমনি সুগন্ধের তরঙ্গ ছুটিল - তখনই ডাকিয়া বলিও, "কু—উঃ।" যখনই দেখিবে, অসংখ্য গন্ধরাজ এককালে ফুটিয়া আপনাদিগের গন্ধে আপনারা বিভোর হইয়া, এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে, তখনই তোমার সেই ডাল হইতে ডাকিয়া বলিও, "কু - উঃ।" যখন দেখিবে, বকুলের অতি ঘন-বিন্যস্ত মধুরশ্যামল স্নিগ্ধোজ্জ্বল পত্ররাশির শোভা আর গাছে ধরে না—পূর্ণযৌবনা সুন্দরীর লাবণ্যের ন্যায় হাসিয়া হাসিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া, হেলিয়া দুলিয়া ভাসিয়া, গলিয়া, উছলিয়া উঠিতেছে, তাহার অসংখ্য প্রস্ফুট কুসুমের গন্ধে আকাশ মাতিয়া উঠিতেছে—তখন তাহারই আশ্রয়ে বসিয়া, সেই পাতার স্পর্শে অঙ্গ শীতল করিয়া, সেই গন্ধে দেহ পবিত্র করিয়া, সেই বকুলকুঞ্জ হইতে ডাকিও, এ "কু উঃ। যখন দেখিবে, শুভ্র-মুখী, শুদ্ধশরীরা, সুন্দরী নব-মল্লিকা-সন্ধ্যা-শিশিরে সিক্ত হইয়া, আলোক-প্রাখর্য্যের হ্রাস দেখিয়া, ধীরে ধীরে মুখখানি খুলিতে সাহস করিতেছে স্তরে স্তরে অসংখ্য অকলঙ্ক দল-রাজি বিকসিত করিবার উপক্রম করিতেছে, যখন দেখিবে যে, ভ্রমর সে রূপ দেখিয়া—"আদরেতে আগুসারি"—কণ্ঠভরা গুনগুন্ মধু ঢালিয়া দিতেছে—তখন, হে কালামুখ! আবার "কু—উঃ" বলিয়া ডাকিয়া মনের জ্বালা নিবাইও! আর যখনই গৃহস্থের গৃহপ্রাঙ্গণস্থ দাড়িম্বশাখায় বসিয়া দেখিবে, সেই গৃহপুষ্পরূপিণী কন্যাগণে সেই লতার দোলনি, সেই গন্ধরাজের প্রস্ফুটতা, সেই বকুলের রূপোচ্ছ্বাস, সেই মল্লিকার অমলতা, একাধারে মিলিত করিয়াছে, তখনই তাহাদের মুখের উপর, ঐ পঞ্চম-স্বরে, গৃহপ্রাচীর প্রতিধ্বনিত করিয়া, সবাইকে ডাকিয়া বলিও, এত রূপ, এত সুখ, এত পবিত্রতা—এ "কু—উঃ!" ঐটি তোমার জিত—ঐ পঞ্চম-স্বর! নহিলে তোমার ও কু—উ কেহ শুনিত না। এ পৃথিবীতে গ্লাডষ্টোন, ডিস্রেলি প্রভৃতির ন্যায়, তুমি কেবল গলাবাজিতে জিতিয়া গেলে—নহিলে অত কালো চলিত না ; তোমার চেয়ে হাঁড়িচাচা ভাল। গলাবাজির এত গুণ না থাকিলে, যিনি বাজে নবেল লিখিয়াছেন,

তিনি রাজমন্ত্রী হইবেন কেন? আর জন ষ্টুয়ার্ট মিল পার্লিয়ামেণ্টে স্থান পাইলেন না কেন?

তবে, কোকিল, তুমি প্রকৃতির মহা-পার্লিয়ামেণ্টে দাঁড়াইয়া নক্ষত্রের নীল-চন্দ্রাতপমণ্ডিত, গিরিনদনগরকুঞ্জাদি বেঞ্চে সুসজ্জিত, ঐ মহাসভা-গৃহে, তোমার এ মধুর পঞ্চম-স্বরে—কু—উঃ বলিয়া ডাক—সিংহাসন হইতে হষ্টিংস পর্য্যন্ত সকলেই কাঁপিয়া উঠুক। "কু—উঃ!" ভাল, তাই; ও কলকণ্ঠে কু বলিলে কু মানিব, সু বলিলে সু মানিব। কু বৈ কি? সব কু। লতায় কণ্টক আছে; কুসুমে কীট আছে; গন্ধে বিষ আছে; পত্র শুষ্ক হয়, রূপ বিকৃত হয়, স্ত্রীজাতি বঞ্চনা জানে। কু—উঃ বটে—তুমি গাও। কিন্তু তুমি ঐ পঞ্চম-সুরে কু বলিলেই কু মানিব—নচেৎ কুঁকড়ো বাবাজি "কু ক্কু কু কু" বলিয়া আমার সুখের প্রভাত নিদ্রাকে কু বলিলে আমি মানিব না? তার গলা নাই। গলাবাজিতে সংসার শাসিত হয় বটে, কিন্তু কেবল চেঁচাইলে হয় না; যদি শব্দ-মন্ত্রে সংসার জয় করিবে, তবে তোমার স্বরে পঞ্চম লাগে—বে-পর্দা বা কড়িমধ্যমের কাজ নয়। 'সর্ জেমস্' মাকিণ্টশ্, তাঁহার বক্তৃতায় ফিলজফির* কড়িমধ্যম মিশাইয়া হারিয়া গেলেন—আর মেকলে রেটরিকের† পঞ্চম লাগাইয়া জিতিয়া গেলেন। ভারতচন্দ্র আদিরস পঞ্চমে ধরিয়া জিতিয়া গিয়াছেন—কবিকঙ্কণের ঋষভ-স্বর কে শুনে? দেখ, লোকের বৃথা পিতামাতার বেসুরো বকবকিতে কোন্ ফল দর্শে? আর যখন বাবুর গৃহিণী বাবুর সুর বাঁধিয়া দিবার জন্য বাবুর কান টিপিয়া ধরিয়া পঞ্চমে গলার আওয়াজ দেন, তখন বাবু পিড়িং পিড়িং বলেন, কি না?

তবে তোমার স্বরকে পঞ্চম স্বর কেন বলে তাহা বুঝি না। যাহা মিষ্ট, তাহাই পঞ্চম? দুইটি পঞ্চম মিষ্ট বটে, সুরের পঞ্চম, আলতাপরা ছোট পায়ের গুজরী পঞ্চম। তবে, সুর, পঞ্চমে উঠিলেই মিষ্ট; পায়ের পঞ্চম, পা হইতে নামাইলেই মিষ্ট।

কোন্ স্বর পঞ্চম, কোন্ স্বর সপ্তম, কে মধ্যম, কে গান্ধার, আমাকে কে বুঝাইয়া দিবে? এটি হাতীর ডাক, ওটি ঘোড়ার ডাক, সেটি ময়ূরের কেকা, ওটি বানরের কিচিমিচি, এ বলিলে ত কিছু বুঝিতে পারি না। আমি আফিংখোর—বেসুরো শুনি, বেসুরো বুঝি, বেসুরো লিখি—ধৈবত গান্ধার নিষাদ পঞ্চমের কি ধার ধারি? যদি কেহ পাখোয়াজ তানপুরা দাড়ী দাঁত লইয়া আমাকে সপ্ত সুর বুঝাইতে আসে, তবে তাহার গর্জ্জন শুনিয়া মঙ্গলা গাইয়ের সদ্যঃপ্রসূত বৎসের ধ্বনি আমার মনে পড়ে—তাহার পীতাবশিষ্ট নির্জ্জল দুগ্ধের অনুধ্যানে মন ব্যস্ত হয়—সুর বুঝা হয় না। আমি গায়কের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি, যেন তিনি জন্মান্তরে মঙ্গলার বৎস হন।

এখন আয়, পাখি! তোতে আমাতে একবার পঞ্চম গাই। তুইও যে, আমিও সে—সমান দুঃখের দুঃখী, সমান সুখের সুখী। তুই এই পুষ্পকাননে, বৃক্ষে বৃক্ষে

* দর্শন

† অলঙ্কার।

আপনার আনন্দে গাইয়া বেড়াস—আমিও এই সংসার-কাননে, গৃহে-গৃহে, আপনার আনন্দে এই দপ্তর লিখিয়া বেড়াই—আয়, ভাই, তোতে আমাতে মিলেমিশে পঞ্চম গাই। তোরও কেহ নাই—আনন্দ আছে, আমারও কেহ নাই—আনন্দ আছে। তোর পুঁজিপাটা ঐ গলা; আমারও পুঁজিপাটা এই আফিঙ্গের ভেলা; তুই এ সংসারে পঞ্চম-স্বর ভালবাসিস—আমিও তাই; তুই পঞ্চম-স্বরে কারে ডাকিস্? আমিই বা কারে? বল্ দেখি, পাখী, কারে?

যে সুন্দর, তাকেই ডাকি; যে ভাল, তাকেই ডাকি। যে আমার ডাক শুনে, তাকেই ডাকি। এই যে আশ্চর্য্য ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া আছি, ইহাকেই ডাকি। এই অনন্ত সুন্দর জগৎ-শরীরে যিনি আত্মা, তাঁহাকে ডাকি। আমিও ডাকি, তুইও ডাকিস। জানিয়া ডাকি, না জানিয়া ডাকি, সমান কথা; তুইও কিছু জানিস না, আমিও জানি না; তোরও ডাক পোঁছিবে, আমারও ডাক পোঁছিবে। যদি সর্ব্বশব্দগ্রাহী কোন কর্ণ থাকে, তবে তোর আমার ডাক পোঁছিবে না কেন? আয়, ভাই, একবার মিলে মিশে দুইজনে পঞ্চম-স্বরে ডাকি।

তবে, কুহুরবে সাধা গলায়, কোকিল একবার ডাক্ দেখি রে! কণ্ঠ নাই বলিয়া আমার মনের কথা কখন বলিতে পাইলাম না। যদি তোরও ভুবন-ভুলান স্বর পাইতাম, ত বলিতাম। তুই আমার সেই মনের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া এই পুষ্পময় কুঞ্জবনে একবার ডাক দেখি রে! কি কথাটি বলিব বলিব মনে করি, বলিতে জানি না, সেই কথাটি তুই বল দেখি রে। কমলাকান্তের মনের কথা, এজন্মে বলা হইল না—যদি কোকিলের কণ্ঠ পাই—অমানুষী ভাষা পাই, আর নক্ষত্রদিগকে শ্রোতা পাই, তবে মনের কথা বলি। ঐ নীলাম্বরমধ্যে প্রবেশ করিয়া, ঐ নক্ষত্রমণ্ডলীমধ্যে উড়িয়া, কখন কি কুহু বলিয়া ডাকিতে পাইব না? আমি না পাই, তুই কোকিল আমার হয়ে একবার ডাক্ দেখি রে?

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

অষ্টম সংখ্যা

স্ত্রীলোকের রূপ

অনেক ভামিনী রূপের গৌরবে পা মাটিতে দেন না। ভাবেন, যে দিক দিয়া অঙ্গ দোলাইয়া চলিয়া যান, লাবণ্যের তরঙ্গে সে দিকের সংজ্ঞা ডুবিয়া যায়; নূতন জগতের সৃষ্টি হয়। তাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের রূপের ঝড় যে দিকে বয়, সেদিকে সকলের ধৈর্য্য-চালা উড়িয়া যায়, ধর্ম্ম-কোটা ভাঙ্গিয়া পড়ে; যখন পুরুষের মন-চড়ায় তাঁহাদের রূপের বান ডাকে, তখন তাঁহাদের কর্ম্ম-জাহাজ, ধর্ম্ম-পান্সী, বুদ্ধি-ডিঙ্গি, সব ভাসিয়া যায়। কেবল সৌন্দর্য্যাভিমানিনী কামিনীকুলেরই এইরূপ প্রতীতি নহে; পুরুষেরাও যখন মহিলাগণের মোহিনী শক্তির বশীভূত হইয়া তাঁহাদিগের রূপের মহিমা বর্ণনারম্ভ

করেন, তখন যে তাঁহারাও কি বলেন, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তখন গগনের জ্যোতিষ্ক, পৃথিবীর পর্ব্বত, পশু, কীট, পতঙ্গ, লতা, গুল্মাদি সকলকেই লইয়া উপমার জন্য টানাটানি পাড়ান—আবার অনেককেই অপমানিত করিয়া পাঠান। রূপসীর মুখমণ্ডলের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহারা পূর্ণশশীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আবার মসীবৎ ম্লান বলিয়া ফেরত পাঠান; গরিব চাঁদ, আপনার কলঙ্ক আপনি বুকে করিয়া রাতারাতি আকাশের কাজ সারিয়া পলায়ন করে। সুন্দরীর ললাটের সিন্দূরবিন্দু দেখিয়া তাঁহারা উষার সীমন্ত-শোভা তরুণ তপনের নিন্দা করেন; রাগে সূর্য্যদেব, পৃথিবী দগ্ধ করিয়া চলিয়া যান। রসময়ীর আস্যের হাস্যরাশি অবলোকন করিয়া প্রফুল্ল কমলে সৌর-রশ্মির লাস্য বা বিকসিত কুমুদে কৌমুদীর নৃত্য তাঁহারা আর ভালবাসেন না; সেই অবধি কমল কুমুদে কীট পতঙ্গের অধিকার। কামিনীর কণ্ঠহার নিরীক্ষণ করিয়া তাহারা নিশার তারকামালার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন; বোধ করি, ভবিষ্যতে জ্যোতিষের অনুশীলন ত্যাগ করিয়া, তাঁহারা স্বর্ণকারের বিদ্যায় মন দিবেন। রঙ্গিণীর শরীর-সঞ্চালনে তাঁহারা এত লাবণ্যলীলা বিলোকন করেন যে, জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে মন্দ মন্দ আন্দোলিত বৃক্ষপত্রে বা নিয়ত কম্পিত সিন্ধু-হিল্লোলে চন্দ্রিকার খেলায় তাঁহাদিগের আর মন উঠে না। এইজন্যই বা, রাত্রে নিদ্রা যান, এবং নদীকে কলসী কলসী করিয়া শুষিতে থাকেন। আবার যখন রমণীর নয়ন বর্ণন করেন, তখন সরোবরের মলয়-মারুতে দোদুল্যমান নীলোৎপল দূরে থাকুক, বিশ্বমণ্ডলের কিছুই তাঁহাদিগের ভাল লাগে না।

এই নারীমূর্ত্তির স্তাবককুলের উপমানুভবশক্তির কিছু প্রশংসা করিতে হয়। এক চক্ষু, তাঁহাদিগের কল্পনাপ্রভাবে কখন পক্ষী, যথা খঞ্জন, চকোর; কখন মৎস্য, যথা সফরী; কখন উদ্ভিদ্ যথা পদ্ম, পদ্মপলাশ, ইন্দীবর; কখন জড় পদার্থ, যথা আকাশের তারা। এক চন্দ্র, কখনও রমণীর মুখমণ্ডল, কখনও তাহার পায়ের নখর।* উচ্চ কৈলাস-শিখর, এবং ক্ষুদ্র কোমল কোরক, একেবারেই উপমাস্থল; কিন্তু ইহাতেও কুলায় না বলিয়া দাড়িম্ব, কদম্ব, করিকুম্ভ এই বিষম উপমাশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছে। জলচর ক্ষুদ্র পক্ষী হংস, এবং স্থলচর প্রকাণ্ড চতুষ্পদ হস্তী, ইহাদিগের গমনে বৈষম্য থাকাই স্বাভাবিক উপলব্ধি; কিন্তু কবিদিগের চক্ষে উভয়েই রমণী-কুল-চরণ-বিন্যাসের অনুকারী। আবার যে সে হাতীর গমনের সহিত, এই হংসগামিনীদিগের গমনসাদৃশ্য নির্দ্দেশ করা বিধেয় নহে, যে হাতী হাতীর রাজা, সেই হাতীর সঙ্গেই গজেন্দ্র-গামিনীগণের গতি তুলনীয়। শুনিয়াছি হাতী একদিনে অনেক দূর যাইতে পারে; অশ্বাদি কোন পশু তত পারে না। যাঁহাদিগকে দূরে যাইতে হয়, তাঁহারা এই গজেন্দ্রগামিনীদিগের পিঠে চড়িয়া যান কেন? যেদিকে রেলওয়ে হয় নাই, সে দিকে বাছিয়া বাছিয়া গজগামিনী মেয়ের ডাক বসাইলে কেমন হয়?

* আমার বিবেচনায় চন্দ্রের সহিত নখরেরই তুলনা অতি সুন্দর—কেন না, উত্তম পদবিন্যাস হইতে পারে—যথা, নখর-নিকর হিমকর-করাঞ্চিত কৌমুদ-চুম্বিত কুঞ্জকুটীরে।—এটি আমার নিজের রচনা।

আমিও এককালে কামিনীভক্ত কবিদলভুক্ত ছিলাম। আমি তখন এই অখিল সংসারে রমণীর ন্যায় সুন্দর বস্তু আর দেখিতে পাইতাম না। চম্পক, কমল, কুন্দ, বন্ধুজীব, শিরীষ, কদম্ব, গোলাপ প্রভৃতি পুষ্পচয় তখন কামিনী-কান্তি-গ্রথিত কুসুম-মালিকার ন্যায় মনোহর বোধ হইত না। বলিতে কি, বসন্তের কুসুমবতী বসুমতী অপেক্ষাও আমি কুসুমেষুী মহিলাকে ভালবাসিতাম; বর্ষার উচ্ছ্বসিত-সলিলা চির-রঙ্গিণী তরঙ্গিণী অপেক্ষাও রসবতী যুবতীর পক্ষপাতী ছিলাম। কিন্তু এক্ষণে আর আমার সে ভাব নাই। আমার দিব্যজ্ঞান হইয়াছে। আমি মায়াময়ী মানবীমণ্ডলের কুহক-জাল ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া পলায়ন করিয়াছি। জালিয়ার পচা জালে রাঘব বোয়াল পড়িলে, যেমন জাল ছিঁড়িয়া পলায়ন করে, আমি তেমনি পলায়ন করিয়াছি; ক্ষুদ্র মাকড়সার জালে যেমন গুব্‌রে পোকা পড়িলে জাল ছিঁড়িয়া পলায়ন করে আমি তেমনি পলায়ন করিয়াছি; দুরন্ত গোরু একবার দাঁড় ছিঁড়িতে পারিলে যেমন ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করে, আমি তেমনি দৌড় মারিয়া পলায়ন করিয়াছি। সকলই আফিমের প্রসাদে। হে মাতঃ আফিম দেবি! তোমার কৌটা অক্ষয় হউক; তুমি বৎসর বৎসর সোণার জাহাজে চড়িয়া চীনদেশে পূজা খাইতে যাও! জাপান, সাইবিরিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা সকলই তোমার অধিকারভুক্ত হউক; তোমার নামে দেশে দেশে দুর্গোৎসব হউক। কমলাকান্তকে পায়ে রাখিও। আমি তোমার কৃপায় সাধারণের উপকারার্থে নিজের মন খুলিয়া দুই চারিটি কথা বলিব।

কথা শুনিয়া কেবল স্ত্রীলোক কেন, অনেক পুরুষেও আমাকে পাগল বলিবেন। বলুন, ক্ষতি নাই। নূতন কথা যে বলে, সেই পাগল বলিয়া গণ্য হয়। গ্যালিলিও* বলিলেন, পৃথিবী ঘুরিতেছে। ইতালীয় ভদ্র সমাজ, ধার্ম্মিক সমাজ, বিদ্বান্ সমাজ শুনিয়া হাসিলেন; শুনিয়া স্থির করিলেন, গ্যালিলিওর মতিভ্রম হইয়াছে। কালের স্রোত বহিয়া গেল। ইতালীয় ভদ্র সমাজ, ধার্ম্মিক সমাজ, বিদ্বান্ সমাজ আর পৃথিবী ঘুরিতেছে শুনিলে হাসেন না; গ্যালিলিওকে আর মতিভ্রান্ত জ্ঞান করেন না।

সকলে সৌন্দর্য্য বিষয়ে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য স্বীকার করেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, বলে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার পাইয়াও, রূপের টীকা স্ত্রীলোকের মস্তকে দেন। আমার বিবেচনায় এটি মস্ত ভুল। আমি দিব্য চক্ষে দেখিয়াছি যে, পুরুষের রূপ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের রূপ অনেক দূরে নিকৃষ্ট। হে মানময়ী মোহিনীগণ! কুটিল কটাক্ষে কালকূট বর্ষণ করিয়া আমাকে এই দোষে দগ্ধ করিও না; কালসর্পী-বিনিন্দিত বেণী-দ্বারা আমাকে বন্ধন করিও না, ভ্রূ-ধনুতে কোপে তীক্ষ্ণ শর যোজনা করিয়া আমাকে বিদ্ধ করিও না। বলিতে কি, তোমাদের নিন্দা করিতে ভয় করে। পথ বুঝিয়া যদি তোমরা নথ-ফাঁদ পাতিয়া রাখ, তবে কত হস্তী বন্ধচরণ হইয়া, তোমাদের নাকে ঝুলিতে পারে—কমলাকান্ত কোন্ ছার! তোমাদের নথের নোলক খসিয়া পড়িলে, মানুষ খুন হইবার অনেক সম্ভাবনা; চন্দ্রহারের একখানি চাঁদ যদি স্থানচ্যুত হইয়া কাহারও গায়ে

* কোপার্নিকস্ P. D.

লাগে, তবে তাহার হাত-পা ভাঙ্গা বিচিত্র নহে! অতএব তোমরা রাগ করিও না। আর হে রমণীপ্রিয়, কল্পনাপ্রিয়, উপমাপ্রিয় কবিগণ, তোমাদিগের স্ত্রীদেবীর সুখময়ী সুবর্ণময়ী প্রতিমা ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া, তোমরা আমাকে মারিতে উদ্যত হইও না। আমি সপ্রমাণ করিয়া দিব যে, তোমরা কুসংস্কারাবিষ্ট পৌত্তলিক। তোমার উপাস্য দেবতার প্রকৃত মূর্ত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রতিমূর্ত্তির পূজা করিতেছ।

যাহার সুন্দর কেশপাশ আছে সে আর পরচুলা ব্যবহার করে না। যাহার উজ্জ্বল ভাল দাঁত আছে তাহার কৃত্রিম দন্তের প্রয়োজন হয় না। যাহার বর্ণে লোকের মন হরণ করে, তাহার আর রং মাখিয়া লাবণ্য বৃদ্ধি করিতে হয় না। যাহার নয়ন আছে, তাহার আর কাচের চক্ষুর আশ্রয় লইতে হয় না। যাহার চরণ আছে, তাহাকে আর কাষ্ঠপদ অবলম্বন করিতে হয় না। এইরূপ যাহার যে বস্তু আছে সে তাহার জন্য লালায়িত হয় না। যে বুঝিতে পারে যে, প্রকৃতি কোন্ পদার্থে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন, সেই তদ্বিষয়ে আপনার অভাব মোচনার্থে যত্ন করিয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি স্থির করিয়াছি যে, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সৌন্দর্য্যের অত্যন্ত অভাব। তাহারা সর্ব্বদা আপন আপন রূপ বাড়াইতে ব্যস্ত; কি উপায়ে আপনাকে সুন্দরী দেখাইবে, ইহা লইয়াই উন্মাদিনী; ভাল ভাল অলঙ্কার কিসে পাইবে, নিয়ত ইহাই তাহাদিগের ভাবনা, ইহাই তাহাদিগের চেষ্টা; এমন কি বলা যাইতে পারে যে, অলঙ্কারই তাঁহাদিগের জপ, অলঙ্কারই তাহাদিগের তপ, অলঙ্কারই তাহাদিগের ধ্যান, অলঙ্কারই তাহাদিগের জ্ঞান। স্বীয় দেহ সজ্জিত করিতে এত যাহাদিগের যত্ন, তাহাদিগের প্রকৃত সৌন্দর্য্য যে অধিক আছে এরূপ বোধ হয় না। যাহার নাক সুন্দর নহে, সেই নাকে নথরূপ রজ্জুতে নোলক জগন্নাথকে দোলায়; যাহার কান সুন্দর নহে, সেই ঢাকাই-কানরূপে নানা ফলফুল পশুপক্ষীবিশিষ্ট বাগানের যোড়া কানে ঝুলাইয়া দেয়। যাহার হৃদয় ভাল নহে, সেই সেখানে সাতনর ফাঁসির দড়ি টাঙ্গাইয়া পুরুষজাতির, বিশেষতঃ স্তন্যপায়ী বালকদিগের ভীতি বিধান করে। যে অলঙ্কার বিনাও আপনাকে সুন্দরী বলিয়া জানে, সে কখন অলঙ্কারের বোঝা বহিতে এত ব্যগ্র হয় না। পুরুষে ভূষণ বিনা সন্তুষ্ট থাকে; স্ত্রীলোক ভূষণ বিনা মনুষ্যসমাজে মুখ দেখাইতে লজ্জা পায়। অতএব স্ত্রীলোকদিগের নিজের ব্যবহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীজাতি সৌন্দর্য্য বিষয়ে নিকৃষ্ট।

স্ত্রীজাতি অপেক্ষা যে পুরুষজাতির সৌন্দর্য্য অধিক, প্রকৃতির সৃষ্টি-পদ্ধতি সমালোচনা করিয়া দেখিলে আরও স্পষ্ট প্রতীতি হইবে। যে বিস্তীর্ণ চন্দ্রকলাপ দেখিয়া জলদমুকুট ইন্দ্রধনু হারি মানে, সে চন্দ্রকলাপ ময়ূরের আছে; ময়ূরীর নাই। যে কেশরে সিংহের এত শোভা, তাহা সিংহীর নাই। যে ঝুঁটিতে বৃষভের কান্তি বৃদ্ধি করে, গাভীর তাহা নাই। কুক্কুটের যেমন সুন্দর তাম্রচূড়া ও পক্ষ সকল আছে, কুক্কুটীর তেমন নাই। এইরূপ দেখিতে পাইবে যে, উচ্চ শ্রেণীর জীবদিগের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ সুশ্রী। মনুষ্য সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন, এমন বোধ হয় না। হে মূলে 'বিদ্যাসুন্দর'-কার!

তোমার মনে কি এই তত্ত্বটি উদিত হইয়াছিল? এইজন্যই কি তুমি নায়কের নাম সুন্দর রাখিয়াছিলে? তুমি বুঝিয়াছিলে যে, স্ত্রীলোক যত কেন বিদ্যাবতী হউক না পুরুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও বুদ্ধির নিকটে তাহাকে পরাভব স্বীকার করিতে হইবে।

সৌন্দর্যের বাহার যৌবনকালে। কিন্তু, রূপান্ধ ভামিনীগণ; তোমাদিগের যৌবন কতক্ষণ থাকে? জোয়ারের জলের মত আসিতে আসিতেই যায়। কুড়ি হইলেই তোমরা বুড়ী হইলে। অল্পদিনের মধ্যেই তোমাদের সকল অঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে; বয়স আসিয়া শীঘ্রই তোমাদিগের গলার লাবণ্য মালা ছিঁড়িয়া লয়। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশে পুরুষের যে শ্রী থাকে, বিশ পঁচিশের ঊর্দ্ধে তোমাদিগের তাহা থাকে না। তোমাদিগের রূপের স্থিতি সৌদামিনীর ন্যায়, ইন্দ্রধনুর ন্যায়, মুহূর্তের জন্য না হউক, অত্যল্পকালের জন্য সন্দেহ নাই। যাহারা রূপোপভোগে উন্মত্ত, আমি আহারে বসিলেই তাহাদের যন্ত্রণা অনুভূত করতে পারি; আমার জীবনে ঘোর দুঃখ এই যে, অন্নব্যঞ্জন পাতে দিতে দিতেই ঠাণ্ডা হইয়া যায়। তেমনি স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যরূপ বুকুড়ি চালের ভাত, প্রণয়-কলাপাতে ঢালিতে ঢালিতে ঠাণ্ডা হইয়া যায়—আর কাহার সাধ্য খায়? শেষে বেশভূষারূপ তেঁতুল মাখিয়া, একটু আদর-লবণের ছিটা দিয়া, কোনরূপে গলাধঃকরণ করিতে হয়।

হে সৌন্দর্য্যগর্ব্বিত কামিনীকুল! সত্য করিয়া বল দেখি, এইরূপ ক্ষণস্থায়ী বলিয়াই কি তোমাদিগের রূপের এত আদর? ভাল করিয়া দেখিতে না দেখিতে, ভাল করিয়া উপভোগ করিতে না করিতে অন্তর্হিত হইয়া যায় বলিয়া তোমাদিগের রূপের জন্য কি পুরুষেরা পিপাসিত চাতকের ন্যায় উন্মত্ত? অপরিজ্ঞাত হারাধন বলিয়াই কি তোমরা উহার প্রকৃত মূল্য নির্ণয়ে অশক্ত? কেবল ক্ষণস্থায়ী পদার্থ বলিয়া নয়, অপর কারণেও স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করে! যে সকল গ্রন্থকার-দিগের মত ভূমণ্ডলে গ্রাহ্য হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই পুরুষ, এ কারণে আমার বিবেচনায় অনুরাগনেত্রে কামিনীকুলের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কথাই আছে, "যার যাতে মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম।" যে রমণীগণ প্রণয়ের পদার্থ, তাহাদিগকে কে সহজ চক্ষুতে দেখিবে? সুন্দর মুকুরের প্রভাবে দৃষ্ট বস্তু কুৎসিত হইলেও সুন্দর দেখাইবে। মনোমোহিনীর রূপ নিরীক্ষণকালে তাহাকে প্রীতির অঞ্জনে মাখাইয়া দেখিব। পুরুষাপেক্ষা তাহার মাধুর্য্য কেন না অধিক বোধ হইবে?

হে প্রণয়দেব, পাশ্চাত্ত্য কবিরা তোমাকে অন্ধ বলিয়াছেন। কথাটা মিথ্যা নয়। তোমার প্রভাবে লোক প্রিয়বস্তুর দোষ দেখিতে পায় না। তোমার অঞ্জনে যাহার নেত্র রঞ্জিত হইয়াছে, সে বিশ্ববিমোহন পদার্থ-পরম্পরায় পরিবৃত থাকে। বিকট মূর্ত্তিকে সে মনোহর দেখে। কর্কশ স্বরকে সে মধুময় ভাবে। প্রেতিনীর অঙ্গ-ভঙ্গীতে মৃদু-মন্দ মলয়-মারুতে দোদুল্যমানা ললিতলবঙ্গলতার লাবণ্যলীলা অপেক্ষাও সুখকরী জ্ঞান করে। এইজন্যই চীনদেশে খাঁদা নাকের আদর। এইজন্যই বিলাতী বিবিদের রাঙ্গা চুল ও বিড়াল চোখের আদর। এইজন্যই কাফ্রিদেশে স্থূল ওষ্ঠাধরের

আদর। এজন্যই বাঙ্গালাদেশের উল্কি-চিত্রিত মিশি কলঙ্কিত চাঁদবদনের আদর। এজন্যই মানবসমাজে স্ত্রীরূপের আদর। আর যদি স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় মনের কথা মুখে আনিতেন, তাহা হইলে হে প্রণয়দেব, নিজের গুণে হউক না হউক, অন্ততঃ তোমার গুণেও আমরা শুনিতে পাইতাম যে, পুরুষের সৌন্দর্য্যের কাছে স্ত্রীলোকের রূপ কিছুই নয়। যদিও অন্তরের গুপ্ত ভাব বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করিতে মহিলাগণ অত্যন্ত সঙ্কুচিতা তথাপি কার্য্যদ্বারা তাহাদিগের আন্তরিক গূঢ় তত্ত্বগুলি কিয়ৎ-পরিমাণে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কে না দেখিয়াছে যে, সুন্দরীরা পরস্পরের সৌন্দর্য্য স্বীকার করিতে চাহেন না, অথচ পুরুষের ভক্ত হইয়া বসেন ? ইহাতে কি বুঝাইতেছে না যে, মনে মনে তাঁহারা স্ত্রীলোকের রূপাপেক্ষা পুরুষের রূপ পক্ষপাতিনী ?

রূপ, রূপ করিয়া স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সকলেই ভাবে রূপই কামিনী-কুলের মহামূল্য ধন, রূপই কামিনীকুলের সর্ব্বস্ব। সুতরাং মহিলাগণ যাহা কিছু কাম্য বস্তুর প্রার্থনা করেন, লোকে কেবল রূপের বিনিময়েই দিতে চায়। ইহাতেই মনুষ্যসমাজের কলঙ্ক বারাঙ্গনা-বর্গের সৃষ্টি। ইহাতেই পরিবারমধ্যে স্ত্রীলোকের দাসীত্ব।

অস্থায়ী সৌন্দর্য্যই যোষিদ্‌মণ্ডলীর একমাত্র সম্বল, সংসার সাগর পার হইবার একমাত্র কাণ্ডারী, একথা আর আমি শুনিতে চাহি না। অনেকদিন শুনিয়াছি। শুনিয়া কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে। শুনিতে আর পারি না। আমি শুনিতে চাই যে, নারীজাতির রূপাপেক্ষা শত গুণে, সহস্র গুণে, লক্ষ গুণে, কোটি গুণে মহত্ত্বের গুণ আছে। আমি শুনিতে চাই যে, তাঁহারা মূর্তিমতী সহিষ্ণুতা, ও ভক্তি ও প্রীতি। যাঁহারা দেখিয়াছেন যে, কত সহ্য করিয়া জননী সন্তানের লালন পালন করেন, যাঁহারা দেখিয়াছেন যে, কত যত্নে মহিলাগণ পীড়িত আত্মীয়বর্গের সেবা-শুশ্রূষা করেন, তাঁহারা কামিনীকুলের সহিষ্ণুতার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন। যাঁহারা কখন কোন সুন্দরীকে পতি-পুত্রের জন্য জীবন বিসর্জ্জন, ধর্ম্মের জন্য বাহ্য সুখ বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা কিয়দ্দূর বুঝিয়াছেন যে, কিরূপ প্রীতি ও ভক্তি স্ত্রীহৃদয়ে বসতি করে।

যখন আমি উৎকৃষ্টা যোষিদ্বর্গের বিষয়ে চিন্তা করিতে যাই, তখনই আমার মানস-পটে, সহমরণপ্রবৃত্তা সতীর মূর্ত্তি জাগিয়া উঠে। আমি দেখিতে পাই যে, চিতা জ্বলিতেছে, পতির পদ সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনমধ্যে সাধ্বী বসিয়া আছেন। আস্তে আস্তে বহ্নি বিস্তৃত হইতেছে, এক অঙ্গ দগ্ধ করিয়া অপর অঙ্গে প্রবেশ করিতেছে ? অগ্নিদগ্ধ স্বামিচরণ ধ্যান করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে হরিবোল বলিতে বলিতেছেন বা সংকেত করিতেছেন। দৈহিক ক্লেশ পরিচায়ক লক্ষণ নাই। আনন প্রফুল্ল। ক্রমে পাবকশিখা বাড়িল, জীবন ছাড়িল, কায়া ভস্মীভূত হইল। ধন্য সহিষ্ণুতা ! ধন্য প্রীতি ! ধন্য ভক্তি !

যখন আমি ভাবি যে, কিছুদিন হইল, আমাদিগের দেশীয়া অবলা অঙ্গনাগণ কোমলাঙ্গী হইয়াও এইরূপে মরিতে পারিত, তখন আমার মনে নূতন আশার সঞ্চার হয়,

তখন আমার বিশ্বাস হয় যে, মহত্ত্বের বীজ আমাদিগের অন্তরেও নিহিত আছে। কাজেও কি আমরা মহত্ত্ব দেখাইতে পারিব না ? হে বঙ্গপৌরাঙ্গনাগণ—তোমরা এ বঙ্গদেশের সার রত্ন। তোমাদের মিছা রূপের বড়াইয়ের কাজ কি ?

নবম সংখ্যা

ফুলের বিবাহ

বৈশাখ মাস বিবাহের মাস। আমি ১লা বৈশাখে নসীবাবুর ফুলবাগানে বসিয়া একটি বিবাহ দেখিলাম। ভবিষ্যৎ বরকন্যাদিগের শিক্ষার্থ লিখিয়া রাখিতেছি।

মল্লিকা ফুলের বিবাহ। বৈকাল-শৈশব অবসানপ্রায়, কলিকা-কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়া আসিল। কন্যার পিতা বড় লোক নহে, ক্ষুদ্র বৃক্ষ, তাহাতে আবার অনেকগুলি কন্যাভারগ্রস্ত। সম্বন্ধের অনেক কথা হইতেছিল, কিন্তু কোনটা স্থির হয় নাই। উদ্যানের রাজা স্থলপদ্ম নির্দ্দোষ পাত্র বটে, ঘর বড়, উঁচু স্থলপদ্ম অত দূর নামিল না। জবা এ বিবাহে অসম্মত ছিল না, কিন্তু জবা বড় রাগী, কন্যাকর্ত্তা পিছাইলেন। গন্ধরাজ পাত্র ভাল, কিন্তু বড় দেমাগ, প্রায় তাঁহার বার পাওয়া যায় না। এইরূপ অব্যবস্থার সময়ে ভ্রমররাজ ঘটক হইয়া মল্লিকা-বৃক্ষসদনে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন, "গুণ্ ! গুণ্ ! গুণ্ ! মেয়ে আছে ?"

মল্লিকাবৃক্ষ পাতা নাড়িয়া সায় দিলেন, "আছে।" ভ্রমর পত্রাসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "গুণ্ গুণ্ গুণ্ ! গুণ্ গুণাগুণ্ ! মেয়ে দেখিব !"

বৃক্ষ, শাখা নত করিয়া, মুদিতনয়না অবগুণ্ঠনবতী কন্যা দেখাইলেন।

ভ্রমর একবার বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া বলিলেন, "গুণ্ ! গুণ্ ! গুণ্ ! গুণ দেখিতে চাই। ঘোমটা খোল।"

লজ্জাশীলা কন্যা কিছুতেই ঘোমটা খুলে না। বৃক্ষ বলিলেন, "আমার মেয়েগুলি বড় লাজুক। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি মুখ দেখাইতেছি।"

ভ্রমর ভোঁ করিয়া স্থলপদ্মের বৈঠকখানায় গিয়া রাজপুত্রের সঙ্গে ইয়ারকি করিতে বসিলেন। এদিকে মল্লিকার সন্ধ্যাঠাকুরাণী-দিদি আসিয়া তাহাকে কত বুঝাইতে লাগিল—বলিল, "দিদি, একবার ঘোমটা খোল—নইলে, বর আসিবে না—লক্ষ্মী আমার, চাঁদ আমার, সোণা আমার" ইত্যাদি। কলিকা কত বার ঘাড় নাড়িল, কতবার রাগ করিয়া মুখ ঘুরাইল, কত বার বলিল, "ঠান্দিদি, তুই যা !" কিন্তু শেষে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া মুখ খুলিল। তখন ঘটক মহাশয় ভোঁ করিয়া রাজবাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া ঘটকালীতে মন দিলেন। কন্যার পরিমলে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "গুণ্ গুণ্ গুণ্, গুণ্ গুণাগুণ ! কন্যা গুণবতী বটে। ঘরে মধু কত ?"

কন্যাকর্তা বৃক্ষ বলিলেন, "ফর্দ্দ দিবেন, কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিব।" ভ্রমর বলিলেন, "গুণ্ গুণ্, আপনার অনেক গুণ—ঘটকালীটা ?"

কন্যাকর্ত্তা শাখা নাড়িয়া সায় দিল, "তাও হবে।"

ভ্রমর—"বলি ঘটকালীর কিছু আগাম দিলে হয় না ? নগদ দান বড় গুণ—গুণ্ গুণ্ গুণ্।"

ক্ষুদ্র বৃক্ষটি তখন বিরক্ত হইয়া, সকল শাখা নাড়িয়া বলিল, "আগে বরের কথা বল—বর কে ?"

ভ্রমর—"বর অতি সুপাত্র !—তাঁর অনেক গুণ্—ন—ন্।"

"কে তিনি ?"

"গোলাবলাল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর অনেক—গুণ্-ন—ন্।"

এ সকল কথোপকথন মনুষ্যে শুনিতে পায় না, আমি কেবল আফিমপ্রসাদাৎ দিব্য কর্ণ পাইয়াই এ সকল শুনিতেছিলাম। আমি শুনিতে লাগিলাম, কুলাচার্য্য মহাশয়, পাখা ঝাড়িয়া ছয় পা ছড়াইয়া গোলাবের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন যে, গোলাব বংশ বড় কুলীন ; কেন না, ইহারা "ফুলে" মেল। যদি বল, সকল ফুলই ফুলে, তথাপি গোলাবের গৌরব অধিক ; কেন না, ইহারা সাক্ষাৎ বাঙ্গা-মালীর সন্তান ; তাহার স্বহস্তরোপিত। যদি বল, এ ফুলে কাঁটা আছে, কোন্ কুলে বা কোন্ ফুলে নাই ?

যাহা হউক, ঘটকরাজ কোনরূপে সম্বন্ধ স্থির করিয়া, বোঁ করিয়া উড়িয়া গিয়া, গোলাব বাবুর বাড়ীতে খবর দিলেন। গোলাব, তখন বাতাসের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, লাফাইয়া লাফাইয়া খেলা করিতেছিল, বিবাহের নাম শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া কন্যার বয়স জিজ্ঞাসা করিল। ভ্রমর বলিল, "আজি কালি ফুটিবে।"

গোধূলি লগ্ন উপস্থিত, গোলাব বিবাহে যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। উচ্চিঙ্গড়া নহবৎ বাজাইতে আরম্ভ করিল ; মৌমাছি সানাইয়ের বায়না লইয়াছিল, কিন্তু রাতকানা বলিয়া সঙ্গে যাইতে পারিল না। খদ্যোতেরা ঝাড় ধরিল ; আকাশে তারাবাজি হইতে লাগিল। কোকিল আগে আগে ফুকরাইতে লাগিল। অনেক বরযাত্র চলিল ; স্বয়ং রাজকুমার স্থলপদ্ম দিবাবসানে অসুস্থকর বলিয়া আসিতে পারিলেন না, কিন্তু জবাগোষ্ঠী—শ্বেত জবা, রক্ত জবা, জরদ জবা প্রভৃতি সবংশে আসিয়াছিল। কবরীদের দল, সেকেলে রাজাদিগের মত বড় উচ্চ ডালে চড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সেঁউতি নীতবর হইবে বলিয়া, সাজিয়া আসিয়া দুলিতে লাগিল। গরদের জোড় পরিয়া চাঁপা আসিয়া দাঁড়াইল—বেটা ব্রাণ্ডি টানিয়া আসিয়াছিল, উগ্র গন্ধ ছুটিতে লাগিল। গন্ধরাজেরা বড় বাহার দিয়া দলে দলে আসিয়া, গন্ধ বিলাইয়া দেশ মাতাইতে লাগিল। অশোক নেশায় লাল হইয়া আসিয়া উপস্থিত ; সঙ্গে এক পাল পিপ্ড়া মোসয়েব হইয়া আসিয়াছে ; তাহাদের গুণের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, কিন্তু দাঁতের জ্বালা বড়—কোন বিবাহে না এরূপ বরযাত্র জোটে,

আর কোন্ বিবাহে না তাহারা হুল ফুটাইয়া বিবাদ বাধায়? কুরুবক, কুটজ প্রভৃতি আরও অনেক বরযাত্র আসিয়াছিলেন, ঘটক মহাশয়ের কাছে তাঁহাদের পরিচয় শুনিবেন। সর্ব্বত্রই তিনি যাতায়াত করেন এবং কিছু কিছু মধু পাইয়া থাকেন।

আমারও নিমন্ত্রণ ছিল, আমিও গেলাম। দেখি, বরপক্ষের বড় বিপদ্। বাতাস বাহকের বায়না লইয়াছিলেন; তখন হুঁহু—হুম্ করিয়া অনেক মর্দ্দানি করিয়াছিলেন কিন্তু কাজের সময় কোথায় লুকাইলেন, কেহ খুঁজিয়া পায় না। দেখিলাম, বর বরযাত্র সকলে অবাক্ হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। মল্লিকাদিগের কুল যায় দেখিয়া আমিই বাহকের কার্য্য স্বীকার করিলাম। বর, বরযাত্র সকলকে তুলিয়া লইয়া মল্লিকাপুরে গেলাম।

সেখানে দেখিলাম, কন্যাকুল, সকল ভগিনী, আহ্লাদে ঘোমটা খুলিয়া, মুখ ফুটাইয়া, পরিমল ছুটাইয়া, সুখের হাসি হাসিতেছে। দেখিলাম, পাতায় পাতায় জড়াজড়ি; গন্ধের ভাণ্ডারে ছড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছে—রূপের ভরে সকলে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। যূথি, মালতী, বকুল, রজনী গন্ধা প্রভৃতি এয়োগণ স্ত্রী-আচার করিয়া বরণ করিল। দেখিলাম, পুরোহিত উপস্থিত; নসীবাবুর নবমবর্ষীয়া কন্যা (জীবন্ত কুসুমরূপিণী) কুসুমলতা সূচ সুতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; কন্যাকর্ত্তা কন্যা সম্প্রদান করিলেন; পুরোহিত মহাশয় দুই জনকে এক সুতায় গাঁথিয়া গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিলেন।

তখন বরকে বাসর-ঘরে লইয়া গেল। কত যে রসময়ী মধুময়ী সুন্দরী সেখানে বরকে ঘেরিয়া বসিল, তাহা কি বলিব। প্রাচীনা ঠাকুরাণীদিদি টগর সাদা প্রাণে বাঁধা রসিকতা করিতে করিতে শুকাইয়া উঠিলেন। রঙ্গণের রাঙ্গামুখে হাসি ধরে না। যুই, কন্যের সই, কন্যের কাছে গিয়া শুইল; রজনীগন্ধাকে বর তাড়কা রাক্ষসী বলিয়া কত তামাসা করিল; বকুল একে বালিকা, তাতে যত গুণ, তত রূপ নহে; এক কোণে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; আর ঝুমকা ফুল বড় মানুষের গৃহিণীর মত মোটা মাগী নীল শাড়ী ছড়াইয়া জমকাইয়া বসিল। তখন—

"কমলকাকা—ওঠ বাড়ী যাই—রাত হয়েছে, ও কি ঢুলে পড়্‌বে যে?

কুসুমলতা এই কথা বলিয়া আমার গা ঠেলিতেছিল; চমক হইলে দেখিলাম, কিছুই নাই। সেই পুষ্পবাসর কোথায় মিশিল?—মনে করিলাম, সংসার অনিত্যই বটে—এই আছে, এই নাই। সে রম্যবাসর কোথায় গেল—সেই হাস্যমুখী, শুভ্রস্মিতসুধাময়ী পুষ্পসুন্দরীসকল কোথায় গেল? যেখানে সব যাইবে, সেইখানে—স্মৃতির দর্পণতলে, ভূতসাগরগর্ভে। যেখানে রাজা প্রজা, পর্ব্বত সমুদ্র, গ্রহ নক্ষত্রাদি গিয়াছে বা যাইবে, সেইখানে ধ্বংসপুরে। এই বিবাহের ন্যায় সব শূন্যে মিশাইবে, সব বাতাসে গলিয়া যাইবে—কেবল থাকিবে—কি? ভোগ? না, ভোগ্য না থাকিলে ভোগ থাকিতে পারে না। তবে কি? স্মৃতি?

কুসুম বলিল, "ওঠ না—কি কচ্চো?"

আমি বলিলাম, "দূর পাগলি, আমি বিয়ে দিচ্ছিলাম।"

কুসুম ঘেঁষে এসে, হেসে হেসে কাছে দাঁড়াইয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার বিয়ে, কাকা?"

আমি বলিলাম, "ফুলের বিয়ে।"

ওঃ পোড়া কপাল, ফুলের? আমি বলি কি! আমিও যে এই ফুলের বিয়ে দিয়েছি।"

"কই?"

"এই যে মালা গাঁথিয়াছি।" দেখিলাম, সেই মালায় আমার বর কন্যা রহিয়াছে।

দশম সংখ্যা

বড় বাজার

প্রসন্ন গোয়ালিনীর সঙ্গে আমার চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখিতেছি। আমি নসীরাম বাবুর গৃহে আসিয়া অবধি তাহার নিকট ক্ষীর, সর, দধি, দুগ্ধ এবং নবনীত খাইতেছি। আহারকালে মনে করিতাম, প্রসন্ন কেবল পরলোকে সদ্গতির কামনায় অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় করিতেছে;—জানিতাম, সংসারারণ্যে যাহারা পুণ্যরূপ মৃগ ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া বেড়ায়, প্রসন্ন তন্মধ্যে সুচতুরা; ভোজনান্তে নিত্যই প্রসন্নের পরকালে অক্ষয় স্বর্গ, এবং ইহকালে মৌতাত বৃদ্ধির জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতাম। কিন্তু এক্ষণে হায়! মানব চরিত্র কি ভীষণ স্বার্থপরতায় কলঙ্কিত! এক্ষণে সে মূল্য চাহিতেছে।

সুতরাং তাহার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা। প্রথম দিন সে যখন মূল্য চাহিল, রসিকতা করিয়া উড়াইয়া দিলাম—দ্বিতীয় দিনে বিস্মিত হইলাম—তৃতীয় দিনে গালি দিয়াছি। এক্ষণে সে দুধ দই বন্ধ করিয়াছে। কি ভয়ানক। এত দিনে জানিলাম, মনুষ্যজাতি নিতান্ত স্বার্থপর; এত দিনে জানিয়াছি যে, যে সকল আশা ভরসা সযত্নে হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া বিশ্বাস-জলে পুষ্ট কর, সকলই বৃথা। এক্ষণে জানিয়াছি যে, ভক্তি প্রীতি স্নেহ প্রণয়াদি সকলই বৃথা গল্প—আকাশ-কুসুম! ছায়াবাজি! হায়! মনুষ্যজাতির কি হইবে! হায়, অর্থলুব্ধ গোয়ালা জাতিকে কে নিস্তার করিবে! হায়! প্রসন্ন নামে গোয়ালার কবে গোরু চুরি যাইবে!

প্রসন্নের দুগ্ধ দধি আছে, সে দিবে, আমার উদর আছে, খাইব, তাহার সঙ্গে এই সম্বন্ধ, ইহাতে সে মূল্য চাহে কোন্ অধিকারে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। প্রসন্ন বলে, আমি অধিকার অনধিকার বুঝি না; আমার গোরু, আমার দুধ, আমি মূল্য লইব। সে বুঝে না যে, গোরু কাহারও নহে; গোরু গোরুর নিজের; দুধ, যে খায় তারই।

তবে এ সংসারে মূল্য লওয়া একটা রীতি আছে, স্বীকার করি। কেবল খাদ্য সামগ্রী কেন, সকল সামগ্রীই মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়। দুধ দই, চাল দাল, খাদ্য পেয়, পরিধেয় প্রভৃতি পণ্য দ্রব্য দূরে থাকুক, বিদ্যা-বুদ্ধিও মূল্যে দিয়া কিনিতে হয়। কালেজে মূল্য দিয়া বিদ্যা কিনিতে হয়। অনেকে ভাল কথা মূল্য দিয়া কিনিয়া থাকেন। হিন্দুরা সচরাচর মূল্য দিয়া ধর্ম্ম কিনিয়া থাকেন। যশঃ, মান অতি অল্প মূল্যেই ক্রীত হইয়া থাকে। ভাল সামগ্রী মূল্য দিয়া কিনিতে হইবে, ইহাও কতক বুঝিতে পারি, কিন্তু মনুষ্য এমনই মূল্যপ্রিয় যে, বিনামূল্যে মন্দ সামগ্রীও কেহ কাহাকে দেয় না। যে বিষ খাইয়া মরিবার বাসনা কর, তাহাও তোমাকে বাজার হইতে মূল্য দিয়া কিনিয়া খাইতে হইবে।

অতএব এই বিশ্বসংসার একটি বৃহৎ বাজার—সকলেই সেখানে আপনাপন দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে। সকলেরই উদ্দেশ্য মূল্যপ্রাপ্তি। সকলেই অনবরত ডাকিতেছে, "আমার দোকানে ভাল জিনিষ—খরিদ্দার চলে আয়"—সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য, খরিদ্দারের চোকে ধূলা দিয়া বদ মাল পাচার করিবে। দোকানদার খরিদ্দারে কেবল যুদ্ধ, কে কাকে ফাঁকি দিতে পারে। সস্তা খরিদের অবিরত চেষ্টাকে মনুষ্য-জীবন বলে।

ভাবিয়া চিন্তিয়া, মনের দুঃখে আফিমের মাত্রা চড়াইলাম। তখন জ্ঞাননেত্র ফুটিল। সম্মুখে ভাবের বাজার সুবিস্তৃত দেখিলাম। দেখিলাম, অসংখ্য দোকানদার দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে—অসংখ্য খরিদ্দারে খরিদ করিতেছে—দেখিলাম, সেই অসংখ্য দোকানদারের অসংখ্য খরিদ্দারে পরস্পরকে অসংখ্য অঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছে। আমি গামছা কাঁধে করিয়া, বাজার করিতে বাহির হইলাম। প্রথমেই রূপের দোকানে গেলাম। যে জিনিষ ঘরে নাই, সেই দোকানে আগে যাইতে হয়। দেখিলাম যে, সংসারে সেই মেছো হাটা। পৃথিবীর রূপসিগণ মাছ হইয়া ঝুড়ি চুপড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন। দেখিলাম, ছোট বড় রুই, কাতলা, মৃগেল, ইলিস, চুনো পুঁটি, মাগুর খরিদ্দারের জন্য লেজ আছড়াইয়া ধড়ফড় করিতেছে; যত বেলা বাড়িতেছে, তত বিক্রয়ের জন্য খাবি খাইতেছে।—মেছুনীরা ডাকিতেছে, "মাছ নেবে গো! কুল পুকুরের সস্তা মাছ, অমনি ছাড়্‌বো, বোঝা বিক্রি হলেই বাঁচি।" কেহ ডাকিতেছে, "মাছ নেবে গো—ধন সাগরের মিঠা মাছ—যে কেনে, তার পুনর্জ্জন্ম হয় না—ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিবির মুণ্ডে পরিণত হইয়া তার ঘর দ্বারে ছড়াছড়ি যায়, যার সাধ্য থাকে কিনিবে। সোনার হাঁড়িতে চোখের জলে সিদ্ধ করিয়া, হৃদয়-আগুনে কড়া জ্বাল দিয়া রাঁধিতে হয়—কে খরিদ্দার সাহস করিস—আয়। সাবধান! হীরার কাঁটা—নাতি ঝাঁটা—গলায় বাধ্‌লে শাশুড়ীরূপী বিড়ালের পায়ে পড়িতে হয়—কাঁটার জ্বালায়, খরিদ্দার হলে কি পলায়!" কেহ ডাকিতেছে, "ওরে আমার সরস পুঁটি, বিক্রি হলেই উঠি। ঝোলে ঝালে অম্বলে, তেলে ঘিয়ে জলে, যাতে দিবে ফেলে, রান্না যাবে চলে,—সংসারের দিন সুখে কাটাবে, আমার এই সরস পুঁটির বলে।" কেহ বলিতেছে, "কাদা ছেঁদে চাঁদা এনেছি—দেখে খরিদ্দার পাগল হয়! কিনে নিয়ে ঘর আলো কর।"

এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া মাছ কিনিতে প্রবৃত্ত হইলাম কেন না, আমার নিরামিষ ঘরকর্না। দেখিলাম, মাছের দালাল আছে; নামে পুরোহিত। দালাল খাড়া হইলে দর জিজ্ঞাসা করিলাম—শুনিলাম, দর "জীবন সর্ব্বস্ব।" যে মাছ ইচ্ছা, সেই মাছ কেন, একই দর, "জীবন সর্ব্বস্ব।" জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল, এ মাছ কত দিন থাইব?" দালাল বলিল, "দুই দিন চারি দিন, তারপর পচিয়া গন্ধ হইবে।" তখন "এত চড়া দরে এমন নশ্বর সামগ্রী কেন কিনিব?" ভাবিয়া আমি মেছো হাটা হইতে পলায়ন করিলাম। দেখিয়া মেছনীরা গামছা কাঁধে মিন্সেকে গালি পাড়িতে লাগিল।

রূপের বাজার ছাড়িয়া বিদ্যার বাজারে গেলাম। দেখিলাম, এখানে ফলমূল বিক্রয় হয়। এক স্থানে দেখিলাম, কতবগুলি ফোঁটা-কাটা টিকিওয়ালা ব্রাহ্মণ তসর গরদ পরিয়া, নামাবলী গায়ে, ঝুনা নারিকেলের দোকান খুলিয়া বসিয়া খরিদ্দার ডাকিতেছেন—"বেচি আমরা ঘটত্ব পটত্ব ষত্ব ণত্ব—ঘরে চাল থাকিলেই স্ব-ত, নইলে ন-ত্ব। দ্রব্যত্ব জাতিত্ব গুণত্ব পদার্থ—বাপের শ্রাদ্ধে বিদায় না দিলেই তুমি বেটা অপদার্থ। পদার্থতত্ত্ব নামে ঝুনা নারিকেল—খাইতে বড় কঠিন—তাহার প্রথম ছোবড়ায় লেখে যে, ব্রাহ্মণই পরম পদার্থ! অভাব নামে নারিকেল চতুর্ব্বিধ*—তোমার ঘরে ধন আছে, আমার ঘরে নাই, ইহা অন্যোন্যাভাব। যতক্ষণ না পাই, ততক্ষণ প্রাগভাব; খরচ হইয়া গেলেই ধ্বংসাভাব; আর আমাদের ঘরে সর্ব্বদাই অত্যন্ত অভাব। অভাব নিত্য কি অনিত্য, যদি সংশয় থাকে তবে আমাদের ভাণ্ডারে উঁকি মার—দেখিবে, নিত্যই অভাব। অতএব আমাদের ঝুনা নারিকেল কেন। ব্যাপ্য, ব্যাপক, ব্যাপ্তি, এ নারিকেলের শাঁস, ব্রাহ্মণের হস্ত হইল ব্যাপ্য, রজত হইল ব্যাপক; আর তুমি দিলেই ঘটিল ব্যাপ্তি; এই ঝুনা নারিকেল কেন, এখনই বুঝিবে। দেখ বাপু, কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বড় গুরুতর কথা; টাকা দাও, এখনই একটা কার্য্য হইবে, কম দিলেই অকার্য্য। আর কারণ বুঝাইব কি, এই দুই যে প্রহর রৌদ্রে ঝুনা নারিকেল বেচিতে আসিয়াছি, ব্রাহ্মণই তাহার কারণ—কিছু যদি না কেন, তবে নারিকেল বহা,—অকারণ। অতএব নারিকেল কেন, নহিলে এই ঝুনা নারিকেল মাথায় ঠুকিয়া মারিব।"

ব্রাহ্মণদিগের সেই প্রখর তপনতপ্ত ঘর্ম্মাক্ত ললাট এবং বাগ্‌বিতণ্ডাজনিত অধরসুধাবৃষ্টি দেখিয়া দয়া হইল—জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাঁ ভট্টাচার্য্য মহাশয়! ঝুনা নারিকেল কিনিতে আপত্তি নাই, কিন্তু দোকানে দা আছে? ছুলিবে কি প্রকারে?"

"না বাপু, দা রাখি না।"

"তবে নারিকেল ছোল কিসে?"

"আমরা ছুলি না আমরা কামড়াইয়া ছোবড়া খাই।"

শুনিয়া, আমি ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া পাশের দোকানে গেলাম।

দেখিলাম, ইহাদিগের সম্মুখেই এক্সপেরিমেণ্টাল সায়েন্সের দোকান। কতকগুলি

* নৈয়ায়িকেরা বলেন, অভাব চতুর্ব্বিধ; অন্যোন্যাভাব, প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব আর অত্যন্তাভাব।
শ্রীকমলাকান্ত।

সাহেব দোকানদার, ঝুনা নারিকেল, বাদাম, পেস্তা, সুপারি প্রভৃতি ফল বিক্রয় করিতেছেন। ঘরের উপরে বড় বড় পিতলের অক্ষরে লেখা আছে।

MESSERS BROWN JONES AND ROBINSON

NUT SUPPLIERS

ESTABLISHED 1757

ON THE FIELD OF PLASSEY

MESSERS BROWN JONES AND ROBINSON
offer to the Indian Public
A Large Assortment of
NUTS

PHYSICAL, METAPHYSICAL,
LOGICAL, ILLOGICAL,
AND
SUFFICIENT TO BREAK THE JAWS
AND
DISLOCATE THE TEETH OF
ALL INDIAN YOUTHS
WHO STAND IN NEED OF HAVING THEIR
DENTAL SUPERFLUITIES CURTAILED

দোকানদার ডাকিতেছেন—"আয় কালা বালক, Experimental Science খাবি আয়। দেখ, ১ নম্বর এক্সপেরিমেণ্ট—ঘুসি; ইহাতে দাঁত উপড়ে, মাথা ফাটে এবং হাড় ভাঙ্গে। আমরা এ সকল এক্সপেরিমেণ্ট বিনামূল্যে দেখাইয়া থাকি—পরের মাথা বা নরম হাড় পাইলেই হইল। আমরা স্থূল পদার্থের সংযোগ বিয়োগ সাধনে পটু—রাসায়নিক বলে বা বৈদ্যুতীয় বলে বা চৌম্বিক বলে, জড়পদার্থের বিশ্লেষণেই সুদক্ষ—কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মুষ্ট্যাঘাতের বলে মস্তকাদির বিশ্লেষণেই আমরা কৃতকার্য্য। মাধ্যাকর্ষণ, যৌগিকাকর্ষণ, চৌম্বিকাকর্ষণ প্রভৃতি নানাবিধ আকর্ষণের কথা আমরা অবগত আছি, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কেশাকর্ষণেই আমরা কৃতবিদ্য। এই সংসারে জড়-পদার্থের নানাবিধ যোগ দেখা যায়; যথা বায়ুতে অম্লজান ও যবক্ষারজানের সামান্য যোগ, জলে জলজান ও অম্লজানের রাসায়নিক যোগ, আর তোমাদিগের পৃষ্ঠে, আমাদের হস্তে, মুষ্টিযোগ। অতএব এই সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিবে যদি, মাথা বাড়াইয়া দাও; এক্সপেরিমেণ্ট করিব। দেখিবে, গ্র্যাবিটেশ্যানের বলে এই সকল

নারিকেলাদি তোমাদের মস্তকে পড়িবে ; পর্কশন নামক অদ্ভুত শাব্দিক রহস্যেরও পরিচয় পাইবে, এবং দেখিবে, তোমার মস্তিষ্কস্থিত স্নায়ব পদার্থের গুণে তুমি বেদনা অনুভূত করিবে।

অগ্রিম মূল্য দিও ; তাহা হইলে চ্যারিটিতে এক্সপেরিমেণ্ট খাইতে পারিবে।"

আমি এই সকল দেখিতে শুনিতেছিলাম, এমত সময়ে সহসা দেখিলাম যে, ইংরেজ দোকানদারেরা, লাঠি হাতে, দ্রুতবেগে ব্রাহ্মণদিগের ঝুনা নারিকেলের গাদার উপর গিয়া পড়িলেন, দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা নারিকেল ছাড়িয়া দিয়া নামাবলি ফেলিয়া, মুক্তকচ্ছ হইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন সাহেবেরা সেই সকল পরিত্যক্ত নারিকেল দোকানে উঠাইয়া লইয়া আসিয়া, বিলাতী অস্ত্রে ছেদন করিয়া, সুখে আহার করিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "এ কি হইল ?" সাহেবেরা বলিলেন, "ইহাকে বলে, Asiatic Researches." আমি তখন ভীত হইয়া আত্মশরীরে কোন প্রকার Anatomical Researches আশঙ্কা করিয়া, সেখান হইতে পলায়ন করিলাম।

সাহিত্যের বাজার দেখিলাম। দেখিলাম, বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণ অমৃত ফল বেচিতেছেন ; বুঝিলাম, ইহা সংস্কৃত সাহিত্য। দেখিলাম আর কতকগুলি মনুষ্য নিচু পীচ পেয়ারা আনারস আঙ্গুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফল বিক্রয় করিতেছেন—বুঝিলাম এ পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য। আরও একখানি দোকান দেখিলাম—অসংখ্য শিশুগণ এবং অবলাগণ তাহাতে ক্রয় বিক্রয় করিতেছে—ভিড়ের জন্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না—জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কিসের দোকান ?"

বালকেরা বলিল, "বাঙ্গালা সাহিত্য।"

"বেচিতেছে কে ?"

"আমরাই বেচি। দুই একজন বড় মহাজনও আছেন। তদ্ভিন্ন বাজে দোকান-দারের পরিচয় পুস্তাবলী নামক গ্রন্থে পাইবেন।"

"কিনিতেছে কে ?"

"আমরাই।"

বিক্রেয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল। দেখিলাম—খবরের কাগজ জড়ান কতকগুলি অপক্ক কদলী।

তাহার পর কলুপটিতে গেলাম ; দেখিলাম, যত উমেদার, মোসায়েব সকলে কলু সাজিয়া তেলের ভাঁড় লইয়া সারি সারি বসিয়া গিয়াছে। তোমার ট্যাঁকে চাকরি আছে, শুনিতে পাইলেই পা টানিয়া লইয়া, ভাঁড় বাহির করিয়া, তেল মাখাইতে বসে। চাকরি না থাকিলেও—যদি থাকে এই ভরসায়, পা টানিয়া লইয়া তেল লেপিতে বসে। তোমার কাছে চাকরি নাই—নাই নাই—নগদ টাকা আছে ত— আচ্ছা, তাই দাও—তেল দিতেছি। কাহারও প্রার্থনা, তোমার বাগানে বসিয়া তুমি যখন ব্রাণ্ডি খাইবে, আমি তোমার চরণে তৈল মাখাইব আমার কন্যার বিবাহটি যেন হয়। কাহারও অব্দার, তোমার কানে অবিরত খোসামোদের গন্ধ

তৈল ঢালিব—বাড়ীর প্রাচীরটা যেন দিতে পারি। কাহারও কামনা, তোমার তোষাখানার বাতি জ্বালিয়া দিব—আমার খবরের কাগজখানি যেন চলে। শুনিয়াছি, কলুদিগের টানাটানিতে অনেকের পা খোঁড়া হইয়া গিয়াছে। আমার শঙ্কা হইল, পাছে কোন কলু আফিঙ্গের প্রার্থনায় আমার পায়ে তেল দিতে আরম্ভ করে। আমি পলায়ন করিলাম।

তারপরে যশের ময়রাপটী। সম্বাদপত্রলেখক নামে ময়রাগণ, গুড়ে সন্দেশের দোকান পাতিয়া, নগদ মূল্যে বিক্রয় করিতেছে—রাস্তার লোক ধরিয়া সন্দেশ গতাইয়া দিয়া, হাত পাতিতেছে মূল্য না পাইলেই কাপড় কাড়িয়া লইতেছে। এদিকে তাঁহাদের বিক্রেয় যশের দুর্গন্ধে পথিক নাসিকা আবৃত করিয়া পালায়ন করিতেছে। দোকানদারগণ বিনা ছানায় শুধু গুড়ে, আশ্চর্য্য সন্দেশ করিয়া, সস্তা দরে বিক্রয় করিতেছেন। কেহ টাকাটা সিকেটায়, আনা দু আনায়, কেহ কেবল খাতিরে—কেহ বা এক সাজ ফলাহার পেলেই ছাড়েন—কেহ বা বাবুর গাড়িতে চাড়তে পেলেই যশোবিক্রয় করেন। অন্যত্র রাজপুরুষগণ মিঠাইওয়ালা সাজিয়া, রায়বাহাদুর, রাজাবাহাদুর খেতাব, খেলাত, নিমন্ত্রণ, ধন্যবাদ প্রভৃতি মিঠাই লইয়া দোকান পাতিয়া বসিয়া আছেন,—চাঁদা, সেলাম, খোসামোদ, ডাক্তারখানা, রাস্তাঘাট, মূল্য লইয়া মিঠাই বেচিতেছেন। বিক্রয়ের বড় বেবন্দোবস্ত—কেহ সর্ব্বস্ব দিয়া এক ঠোঙ্গা পাইতেছে না কেহ শুধু সেলামে দেড় মণ লইয়া যাইতেছে। এইরূপ অনেক দোকান দেখিলাম—কিন্তু সর্ব্বত্রই পচা মাল আধা দরে বিক্রয় হইতেছে—খাঁটি দোকান দেখিলাম না। কেবল একখানি দোকান দেখিলাম—তাহা অতি চমৎকার।

দেখিলাম, দোকানের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না। ডাকিয়া দোকানদারের উত্তর পাইলাম না—কেবল এক সর্ব্বপ্রাণিভীতিসাধক অনন্ত গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম—অল্পালোকে দ্বারে ফলক-লিপি পড়িলাম।

যশের পণ্যশালা।
বিক্রেয়—অনন্ত যশ।
বিক্রেতা—কাল।
মূল্য—জীবন।
জীয়ন্তে কেহ এখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না।
আর কোথাও সুযশ বিক্রয় হয় না।

পড়িয়া ভাবিলাম—আমার যশে কাজ নাই—কমলাকান্তের প্রাণ বাঁচিলে অনেক যশ হইবে।

বিচারের বাজারে গেলাম—দেখিলাম, সেটা কসাইখানা। টুপি মাথায়, শামলা মাথায় ছোট বড় কসাইসকল, ছুরি হাতে গোরু কাটিতেছে। মহিষাদি বড় বড় পশুসকল শৃঙ্গ নাড়িয়া ছুটিয়া পলাইতেছে;—ছাগ, মেষ এবং গোরু প্রভৃতি ক্ষুদ্র পশুসকল ধরা পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া গোরু বলিয়া এক জন কসাই বলিল, "এও গোরু, কাটিতে হইবে।" আমি সেলাম করিয়া পলাইলাম।

আর বড় বাজার বেড়াইবার সাধ রহিল না—তবে প্রসন্নের উপর রাগ ছিল বলিয়া একবার দইয়েহাটা দেখিতে লাগিলাম—গিয়া প্রথমেই দেখিলাম যে, সেখানে খোদ কমলাকান্ত চক্রবর্তী নামে গোয়ালা—দপ্তররূপ পচা ঘোলের হাঁড়ি হইয়া বসিয়া আছে—আপনি ঘোল খাইতেছে, এবং পরকে খাওয়াইতেছে।

তখন চমক হইল চক্ষু চাহিলাম—নসীবাবুর বাড়ীতেই আছি। ঘোলের হাঁড়ি কাছে আছে বটে। প্রসন্ন এক হাঁড়ি ঘোল আনিয়া আমাকে সাধিতেছে "চক্রবর্ত্তী মশাই—রাগ করিও না। আজ আর দুধ দই নাই এই ঘোলটুকু আনিয়াছি—ইহার দাম দিতে হইবে না।"

একাদশ সংখ্যা

আমার দুর্গোৎসব

সপ্তমীপূজার দিন কে আমাকে অত আফিঙ্গ চড়াইতে বলিল! আমি কেন আফিঙ্গ খাইলাম! আমি কেন প্রতিমা দেখিতে গেলাম! যাহা কখনও দেখিব না, তাহা কেন দেখিলাম! এ কুহক কে দেখাইল!

দেখিলাম—অকস্মাৎ কালের স্রোত, দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে—আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি। দেখিলাম—অনন্ত, অকূল, অন্ধকারে, বাত্যা-বিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোত—মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে—নিবিতেছে আবার উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা—একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—মা! মা! করিয়া ডাকিতেছি! আমি এই কাল-সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা! কই আমার মা? কোথায় কমলা-কান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! এই কি মা? হাঁ, এই মা! চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশ ভুজ—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণপ্রহারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্র পৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।

কোথায় ফুল পাইলাম, বলিতে পারি না—কিন্তু সেই প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম—ডাকিলাম, "সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে, শিবে, আমার সর্ব্বার্থসাধিকে! অসংখ্যসন্তানকুলপালিকে! ধর্ম্ম, অর্থ, সুখ, দুঃখদায়িকে! আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর। এই ভক্তি প্রীতি বৃত্তি শক্তি করে লইয়া তোমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি, তুমি এই অনন্তজনমণ্ডল ত্যাগ করিয়া এই বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তি একবার জগৎসমীপে প্রকাশ কর। এসো মা! নবরাগরঙ্গিণি নববলধারিণি, নবদর্পে দর্পিণি, নবস্বপ্নদর্শিনি! —এসো মা, গৃহে এসো—ছয় কোটি সন্তানে একত্রে, এক কালে, দ্বাদশ কোটি কর যোড় করিয়া, তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয় কোটি মুখে ডাকিব, মা প্রসূতি অম্বিকে! ধাত্রি ধরিত্রি ধনধান্যদায়িকে! নগাঙ্কশোভিনি নগেন্দ্রবালিকে! শরৎ-সুন্দরি চারুপূর্ণচন্দ্রভালিকে! ডাকিব,—সিন্ধুসেবিকে সিন্ধু-পূজিতে সিন্ধুমথনকারিণি! শত্রুবধে দশভুজে দশপ্রহরণধারিণি! অনন্তশ্রী অনন্তকালস্থায়িনি! শক্তি দাও সন্তানে, অনন্তশক্তিপ্রদায়িনি! তোমাকে কি বলিয়া ডাকিব মা? ঐ ছয় কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব—এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব,—এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব—না পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব। এসো মা, গৃহে এসো—যাঁহার ছয় কোটি সন্তান তাঁহার ভাবনা কি?

দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না—সেই অনন্ত কাল-সমুদ্রে এই প্রতিমা ডুবিল! অন্ধকারে সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি ব্যাপিল, জলকল্লোলে বিশ্বসংসার পূরিল! তখন যুক্ত করে, সজল নয়নে, ডাকিতে লাগিলাম, উঠ হিরণ্ময়ি বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবারে সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব, তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবি, দেবানু-গৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব, ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা—একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা! উঠ উঠ, উঠ মা বঙ্গজননি!

মা উঠিলেন না। উঠিবেন না কি?

এস, ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্রসকল মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে—চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কাল-সমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া, আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব; মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি? আইস, প্রতিমা তুলিয়া আনি, বড় পূজার ধুম বাধিবে। দেবষক ছাগকে হাড়িকাটে ফেলিয়া সৎকীর্ত্তি খড়্গে মায়ের কাছে বলি দিব—কত পুরাবৃত্তকার ঢাকী, ঢাক ঘাড়ে করিয়া, বঙ্গের বাজনা বাজাইয়া আকাশ ফাটাইবে—কত ঢোল, কাঁসি, কাড়া, নাগরায় বঙ্গের জয় বাদিত হইবে। কত সানাই পোঁ ধরিয়া গাইবে "কত নাচ গো—" বড় পূজার ধুম বাধিবে। কত ব্রাহ্মণপণ্ডিত লুচি মণ্ডার লোভে বঙ্গপূজায় আসিয়া পাতড়া মারিবে—কত দেশী বিদেশী ভদ্রাভদ্র আসিয়া মায়ের চরণে প্রণামী দিবে—কত দীন দুঃখী প্রসাদ খাইয়া উদর

পুরিবে। কত নর্ত্তকী নাচিবে, কত গায়কে মঙ্গল গায়িবে, কত কোটি ভক্তে ডাকিবে, মা! মা! মা!—

জয় জয় জয় জয়া জয়দাত্রি।
জয় জয় জয় বঙ্গজগদ্ধাত্রি॥
জয় জয় জয় সুখদে অন্নদে।
জয় জয় জয় বরদে শর্ম্মদে॥
জয় জয় জয় শুভে শুভঙ্করি।
জয় জয় জয় শান্তি ক্ষেমঙ্করি॥
দ্বেষকদলনি, সন্তানপালিনি।
জয় জয় দুর্গে দুর্গতিনাশিনি॥
জয় জয় লক্ষ্মি বারীন্দ্রবালিকে।
জয় জয় কমলাকান্তপালিকে॥
জয় জয় ভক্তিশক্তিনায়িকে।
পাপতাপভয়শোকনাশিকে॥
মৃদুল গম্ভীর ধীর ভাষিকে।
জয় মা কালি করালি অম্বিকে॥
জয় হিমালয়নগবালিকে।
অতুলিত পূর্ণচন্দ্রভালিকে॥
শুভে শোভনে সর্ব্বার্থসাধিকে।
জয় জয় শান্তি শক্তি কালিকে॥
জয় মা কমলাকান্তপালিকে॥
নমোঽস্তু তে দেবি বরপ্রদে শুভে।
নমোঽস্তু তে কামচরে সদা ধ্রুবে॥
ব্রহ্মাণীন্দ্রাণি রুদ্রানি ভূতভব্যে যশস্বিনি।
ত্রাহি মাং সর্ব্বদুঃখেভ্যো দানবানাং ভয়ঙ্করি॥
নমোঽস্তু তে জগন্নাথে জনার্দ্দনি নমোঽস্তু তে।
প্রিয়দান্তে জগন্মাতঃ শৈলপুত্রি বসুন্ধরে॥
ত্রায়স্ব মাং বিশালাক্ষি ভক্তানামার্ত্তিনাশিনি।
নমামি শিরসা দেবীং বন্ধনোঽস্তু বিমোচিতঃ॥*

* আর্য্যাস্তোত্র দেখ।

দ্বাদশ সংখ্যা

একটি গীত

"শোন্ প্রসন্ন, তোকে একটি গীত শুনাইব।"

প্রসন্ন গোয়ালিনী বলিল, "আমার এখন গান শুনিবার সময় নয়—দুধ যোগাবার বেলা হলো।"

কমলাকান্ত। "এসো এসো বঁধু এসো।"

প্রসন্ন। "ছি ছি ছি! আমি কি তোমার বঁধু ?"

কমলাকান্ত। "বালাই! ষাট, তুমি কেন বঁধু হইতে যাইবে ? আমার গীতে আছে"—

"এসো এসো, বঁধু এসো আধ আঁচরে বসো,

সুর করিয়া আমি কীর্ত্তন ধরাতে প্রসন্ন দুধের কেঁড়ে রাখিয়া বসিল, আমি গীতটি আদ্যপান্ত গায়িলাম।

"এসো এসো বঁধু এসো আধ আঁচরে বসো,
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।
অনেক দিবসে মনের মানসে,
তোমা ধনে মিলাইল বিধি।
মণি নও মাণিক নও যে হার ক'রে গলে পরি
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥
বঁধু তোমার যখন পড়ে মনে,
আমি চাই বৃন্দাবন পানে,
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই,
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।"

মিল ত চমৎকার, "দেখি" আর "বিধি" মিলিল ? কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায়, এইরূপ মোহ মন্ত্র আর একটি শুনিব, মনে বড় সাধ রহিয়াছে। যখনই এই গান প্রথম কর্ণ ভরিয়া শুনিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল, নীলাকাশতলে ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া এই গীত গাই—মনে হইয়াছিল, সেই বিচিত্র সৃষ্টিকুশলী কবির সৃষ্টি দৈববংশী লইয়া, মেঘের উপর যে বায়ুস্তর—শব্দশূন্য, দৃশ্যশূন্য, পৃথিবী যেখান হইতে দেখা যায় না, সেইখানে বসিয়া, সেই মুরলীতে, একা এই গীত গাই—এ গীত কখন ভুলিতে পারিলাম না ; কখন ভুলিতে পারিব না।

"এসো এসো বঁধু এসো"।*

---

* পাঠককে গীতের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে হইবে।

লোকের মনে কি আছে বলিতে পারি না, কিন্তু আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, বুঝিতে পারি না যে, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিতে কিছু সুখ আছে। যে পশু ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির জন্য পরসন্দর্শনের আকাঙ্ক্ষী, সে যেন কখন কমলাকান্ত শর্ম্মার দপ্তর-মুক্তাবলী পড়িতে বসে না। আমি বিলাসপ্রিয়ের মুখে "এসো এসো বঁধু এসো" বুঝিতে পারি না। কিন্তু ইহা বুঝিতে পারি যে, মনুষ্য মনুষ্যের জন্য হইয়াছিল—এক হৃদয় অন্য হৃদয়ের জন্য হইয়াছিল—সেই হৃদয়ে হৃদয়ে সংঘাত, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন, ইহা মনুষ্য-জীবনের সুখ। ইহজন্মে মনুষ্যহৃদয়ে একমাত্র তৃষা, অন্যহৃদয়কামনা। মনুষ্য-হৃদয় অনবরত হৃদয়ান্তরকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবৃত্তিসকল শরীর রক্ষার্থ—মহতী প্রবৃত্তিসকলের উদ্দেশ্য, "এসো এসো বঁধু এসো।" তুমি চাকরি কর, খাইবার জন্য—কিন্তু যশের আকাঙ্ক্ষা কর, পরের অনুরাগ লাভ করিবার জন্য, জন-সমাজের হৃদয়কে তোমার হৃদয়ের সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য। তুমি যে পরোপকার কর, সে পরের হৃদয়ের ক্লেশ আপন হৃদয়ে অনুভব কর বলিয়া। তুমি যে রাগ কর, সে তোমার মনোমত কার্য্য হইল না বলিয়া; হৃদয় হৃদয়ে আসিল না বলিয়া। সর্ব্বত্র এই রব—"এসো এসো বঁধু এসো।" সর্ব্বকর্ম্মের এই মন্ত্র, "এসো এসো বঁধু এসো।" জড়জগতের নিয়ম আকর্ষণ। বৃহৎ গ্রহ উপগ্রহকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" সৌর পিণ্ড বৃহৎ গ্রহকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" জগৎ জগদন্তরকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" পরমাণু পরমাণুকে অবিরত ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" জড়পিণ্ডসকল গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু—সকলেই এই মোহমন্ত্রে বাঁধা পড়িয়া ঘুরিতেছে। প্রকৃতি পুরুষকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" জগতের এই গম্ভীর অবিশ্রান্ত ধ্বনি—'এসো এসো বঁধু এসো।" কমলাকান্তের বঁধু কি আসিবে?

"আধ আঁচরে বসো।"

এই তৃণশষ্পসমাচ্ছন্ন, কণ্টকাদিতে কর্কশ সংসারারণ্যে, হে বাঞ্ছিত! তোমাকে আর কি আসন দিব, আমার এই হৃদয়াবরণের অর্দ্ধেকে উপবেশন কর। কুশকণ্টকাদি হইতে তোমার আচ্ছাদন জন্য, আমি এই আপন অঙ্গ অনাবৃত করিতেছি—আমার আঁচরে বসো। যাহাতে আমার লজ্জারক্ষা, মানরক্ষা, যাহাতে আমার শোভা, হে মিলিত! তুমিও তাহার অর্দ্ধেক গ্রহণ কর—আধ আঁচরে বসো। হে পরের হৃদয়, হে সুন্দর, হে মনোরঞ্জন, হে সুখদ! কাছে এসো, আমাকে স্পর্শ কর, আমি তোমাতে সংলগ্ন হইব,—দূরে আসন গ্রহণ করিও না—এই আমার শরীরলগ্ন অঞ্চলার্দ্ধে বসো। হে কমলাকান্ত! হে দুর্ব্বিনীত! হে আজন্মবিবাহশূন্য! তুমি এতদর্থে শান্তিপুরে কল্কাদার আঁচলের আধখানা বুঝিও না। তুমি যে অঞ্চলার্দ্ধে বসিবে, তাহার তাঁতি আজও জন্মে নাই, মনের নমস্ত জ্ঞান-বস্ত্রে আবৃত; অর্দ্ধেকে তোমার হৃদয় আবৃত রাখ, অর্দ্ধেকে বাঞ্ছিতকে বসাও। তুমি মূর্খ—তথাপি তোমার অপেক্ষা মূর্খ যদি কেহ থাকে, তাহাকে ডাক—"এসো এসো বঁধু এসো—আধ আঁচরে বসো।"

"নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।"

কেহ কখন দেখিয়াছ? তুমি অনেক ধন উপার্জ্জন করিয়াছ—কখন নয়ন ভরিয়া আত্মধন দেখিতে পাইয়াছ? তুমি যশস্বী হইবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছ—কিন্তু আত্মযশোরাশি দেখিয়া কবে তোমার নয়ন ভরিয়াছে? রূপতৃষ্ণায় তুমি ইহজীবন অতিবাহিত করিলে—যেখানে ফুলটি ফুটে, ফলটি দোলে, যেখানে পাখীটি উড়ে, যেখানে মেঘ ছুটে, গিরিশৃঙ্গ উঠে, নদী বহে, জল ঝরে, তুমি সেইখানে রূপের অনুসন্ধানে ফিরিয়াছ—যেখানে বালক, প্রফুল্ল মুখমণ্ডল আন্দোলিত করিয়া হাসে, যেখানে যুবতী ব্রীড়াভাবে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া শঙ্কিতগমনে যায়, যেখানে প্রৌঢ়া নিতান্তস্ফুটিতা মধ্যাহ্নপদ্মিনীবৎ অকাতরে রূপের বিকাশ করে, তুমি সেইখানেই রূপের সন্ধানে ফিরিয়াছ, কখন নয়ন ভরিয়া রূপ দেখিয়াছ? দেখ নাই কি যে, কুসুম দেখিতে দেখিতে শুকায়, ফল দেখিতে দেখিতে পাকে, পড়ে, পচে, গলে; পাখী উড়িয়া যায়, মেঘ চলিয়া যায়, গিরি ধূমে লুকায়, নদী শুকায়, চাঁদ ডুবে, নক্ষত্র নিবিয়া যায়। শিশুর হাসি রোগে হরণ করে, যুবতীর ব্রীড়া কিসে না যায়? প্রৌঢ়া বয়সে শুকাইয়া যায়। ইহা সংসারের দুরদৃষ্ট—কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পায় না। অথবা এই সংসারের শুভাদৃষ্ট—কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পায় না। গতিই সংসারে সুখ—চাঞ্চল্যই সংসারের সৌন্দর্য্য। নয়ন ভরে না। সে নয়ন আমরা পাই নাই। পাইলেই সংসার দুঃখময় হইত, পরিতৃপ্তি-রাক্ষসী আমাদের সকল সুখকে গ্রাস করিত। যে কারিগর এই পরিবর্ত্তনশীল সংসার, আর এই অতৃপ্য নয়ন সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার কারিগরির উপর কারিগরি এই বাসনা, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, নয়নও অতৃপ্য· অথচ বাসনা—নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।

হে রূপ! হে বাহ্য সৌন্দর্য্য! হে অন্তঃপ্রকৃতির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট! কাছে আইস· নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি। দূরে বসিলে দেখা হইবে না; কেন না, দেখা কেবল নয়নে নহে। সংস্পর্শে বা নৈকট্য ব্যতীত মনের বৈদ্যুতী বহে না—আমরা সর্ব্ব শরীরে দেখিয়া থাকি! মন হইতে মনে বৈদ্যুতী চলিলে তবে নয়ন ভরিবে। হায়! কিসেই বা নয়ন ভরিবে! নয়নে যে পলক আছে!

"অনেক দিবসে, মনের মানসে
তোমা ধনে মিলাইল বিধি হে!"

আমি কখন কখন মনে করিয়া থাকি, কেবল দুঃখের পরিমাণ জন্যই দয়া করিয়া বিধাতা দিবসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নহিলে কাল অপরিমেয়, মনুষ্য-দুঃখ অপরিমিত হইত। আমরা এখন বলিতে পারি যে, আমি দুই দিন, দুই মাস বা দুই বৎসর দুঃখভোগ করিতেছি; কিন্তু দিন রাত্রির পরিবর্ত্তন না থাকিলে, কালের পথ চিহ্নশূন্য হইলে, কে না বুঝিত যে, আমি অনন্ত কাল দুঃখভোগ করিতেছি? আশা তাহা হইলে দাঁড়াইবার স্থান পাইত না—এত দিন পরে আবার দুঃখান্ত হইবে, এ কথা কেহ ভাবিতে পারিত না—বৃক্ষাদিশূন্য অনন্ত প্রান্তরবৎ জীবনের পথ অনুত্তীর্য্য হইত—জীবনযাত্রা দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণাস্বরূপ হইত। অতএব এই বৃহৎ জগৎকেন্দ্র সূর্য্যের পথ আমাদের সুখ-দুঃখের মানদণ্ড। দিবস-গণনায় সুখ আছে। সুখ

আছে বলিয়াই দুঃখী জন দিবস গণিয়া থাকে। দিবস-গণনা দুঃখীবিনোদ। কিন্তু এমন দুঃখীও আছে যে, সে দিবস গণে না; দিবস-গণনা তাহার পক্ষে চিত্তবিনোদন নহে। আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী—পৃথিবীতে ভুলিয়া মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়াছি—সুখহীন, আশাহীন, উদ্দেশ্যশূন্য, আকাঙ্ক্ষাশূন্য আমি কি জন্য দিবস গণিব? এই সংসার-সমুদ্রে আমি ভাসমান তৃণ সংসার-বাত্যায় আমি ঘূর্ণ্যমান ধূলিকণা, সংসারারণ্যে আমি নিষ্ফল বৃক্ষ—সংসারাকাশে আমি বারিশূন্য মেঘ—আমি কেন দিবস গণিব?

গণিব। আমার এক দুঃখ, এক সন্তাপ, এক ভরসা আছে। ১২০৩ সাল হইতে দিবস গণি। যে দিন বঙ্গে হিন্দুনাম লোপ পাইয়াছে, সেই দিন হইতে দিন গণি। যে দিন সপ্তদশ অশ্বারোহী বঙ্গজয় করিয়াছিল, সেই দিন হইতে দিন গণি। হায়! কত গণিব! দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয়, বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়, শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া সাত বার গণি। কই, অনেক দিবসে মনের মানসে বিধি মিলাইল, কই? যাহা চাই, তাহা মিলাইল কই? মনুষ্যত্ব মিলিল কই? একজাতীয়ত্ব মিলিল কই? ঐক্য কই? বিদ্যা কই? গৌরব কই? শ্রীহর্ষ কই? ভট্টনারায়ণ কই? হলায়ুধ কই? লক্ষ্মণসেন কই? আর কি মিলিবে না? হায়! সবারই ঈপ্সিত মিলে, কমলাকান্তের মিলিবে না?

"মণি নও মাণিক নও, যে হার ক'রে গলে পরি"—

বিধাতা জগৎ জড়ময় করিয়াছেন কেন? রূপ জড়পদার্থ কেন? সকলই অশরীরী হইল না কেন? হইলে হৃদয়ে হৃদয়ে কেমন মিলিত। যদি রূপের শরীরে প্রয়োজন ছিল, তবে তোমার আমার বিধাতা এক শরীর করেন নাই কেন? তাহা হইলে আর ত বিচ্ছেদ হইত না। এখন কি এক শরীর হয় না? আমার শরীরে এত স্থান আছে—তোমাকে তাহাতে কোথাও কি রাখিতে পারি না? তোমাকে কণ্ঠলগ্ন করিয়া হৃদয়ে বিলম্বিত করিয়া রাখিতে পারি না? হায়! তুমি মণি নও, মাণিক নও যে, হার করিয়া গলে পরি।

আর বঙ্গভূমি! তুমিই বা কেন মণি-মাণিক্য হইলে না, তোমায় কেন আমি হার করিয়া, কণ্ঠে পরিতে পারিলাম না। তোমায় যদি কণ্ঠে পরিতাম, মুসলমান আমার হৃদয়ে পদাঘাত না করিলে তাহার পদরেণু তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। তোমায় সুবর্ণের আসনে বসাইয়া, হৃদয়ে দোলাইয়া দেশে দেশে দেখাইতাম। ইওরোপে, আমেরিকে, মিসরে, চীনে, দেখিত, তুমি আমার কি উজ্জ্বল মণি!

"আমায় নারী না করিত বিধি,
তোমা হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ!"

প্রথমে আহ্বান, "এসো এসো বঁধু এসো" পরে আদর, "আধ আঁচরে বসো," পরে ভোগ, "নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।" তখন সুখভোগকালীন পূর্ব্বদুঃখস্মৃতি

অনেক দিবসে, মনের মানসে, তোমা ধনে মিলাইল বিধি।" সুখ দ্বিবিধ, সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ সুখ যথা,

"মণি নও মাণিক নও, যে হার ক'রে গলে পরি।"

পরে সম্পূর্ণ সুখ,

"আমায় নারী না করিত বিধি,
তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ!"

সম্পূর্ণ অসহ্য সুখের লক্ষণ, শারীরিক চাঞ্চল্য, মানসিক অস্থৈর্য্য। এ সুখ কোথায় রাখিব, লইয়া কি করিব, আমি কোথায় যাইব, এ সুখের ভার লইয়া কোথায় ফেলিব? এ সুখের ভার লইয়া আমি দেশে দেশে ফিরিব; এ সুখ এক স্থানে ধরে না; যেখানে যেখানে পৃথিবীতে স্থান আছে, সেইখানে সেইখানে এ সুখ লইয়া যাইব, এ জগৎ সংসার এই সুখে পূরাইব। সংসার এ সুখের সাগরে ভাসাইব; মেরু হইতে মেরু পর্য্যন্ত সুখের তরঙ্গ নাচাইব, আপনি ডুবিয়া, উঠিয়া, ভাসিয়া, হেলিয়া ছুটিয়া বেড়াইব। এ সুখে কমলাকান্তের অধিকার নাই—এ সুখে বাঙ্গালির অধিকার নাই। সুখের কথাতেই বাঙ্গালির অধিকার নাই। গোপীর দুঃখ, বিধাতা গোপীকে নারী করিয়াছেন কেন—আমাদের দুঃখ, বিধাতা, আমাদের নারী করেন নাই কেন—তাহা হইলে এ মুখ দেখাইতে হইত না।

সুখের কথায় বাঙ্গালির অধিকার নাই—কিন্তু দুঃখের কথায় আছে। কাতরোক্তি যত গভীর, যতই হৃদয়বিদারক হউক না কেন, তাহা বাঙ্গালির মর্ম্মোক্তি।—আর কাতরোক্তি, কোথায় বা নাই? নবপ্রসূত পক্ষিশাবক হইতে মহাদেবের শৃঙ্গধ্বনি পর্য্যন্ত সকলই কাতরোক্তি। সম্পূর্ণসুখে সুখীও সুখকালে পূর্ব্বদুঃখ স্মরণ করিয়া কাতরোক্তি করে। নহিলে সুখের সম্পূর্ণতা কি? দুঃখস্মৃতি ব্যতীত সুখের সম্পূর্ণতা কোথায়? সুখও দুঃখময়—

"তোমায় যখন পড়ে মনে,
আমি চাই বৃন্দাবন পানে,
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।"

এই কথা সুখ-দুঃখের সীমারেখা! যাহার নষ্ট সুখের স্মৃতি জাগরিত হইলে সুখের নিদর্শন এখনও দেখিতে পায়, সে এখনও সুখী—তাহার সুখ একেবারে লুপ্ত হয় নাই। তাহার বন্ধু, তাহার প্রিয়, বাঞ্ছিত—গিয়াছে, কিন্তু তাহার বৃন্দাবন আছে—মনে করিলে, সে সেই সুখভূমি পানে চাহিতে পারে। যাহার সুখ গিয়াছে—সুখের নিদর্শন গিয়াছে—বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে, এখনও আর চাহিবার স্থান নাই—সেই দুঃখী, অনন্ত দুঃখে দুঃখী। বিধবা যুবতী, মৃত পতির যত্নরক্ষিত পাদুকা হারাইলে, যেমন দুঃখে দুঃখী হয়, তেমনই দুঃখে দুঃখী।

আমার এই বঙ্গদেশের সুখের স্মৃতি আছে—নিদর্শন কই? দেবপালদেব, লক্ষ্মণসেন, জয়দেব, শ্রীহর্ষ,—প্রয়াগ পর্য্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বর নাম, গৌড়ী

রীতি. এ সকলের স্মৃতি আছে, কিন্তু নিদর্শন কই? সুখ মনে পড়িল, কিন্তু চাহিব কোন্ দিকে? সে গৌড় কই? সে যে কেবল যবনলাঞ্ছিত ভগ্নাবশেষ! আর্য্য রাজধানীর চিহ্ন কই? আর্য্যের ইতিহাস কই? জীবনচরিত কই? কীর্ত্তি কই? কীর্ত্তিস্তম্ভ কই? সমরক্ষেত্র কই? সুখ গিয়াছে—সুখ-চিহ্নও গিয়াছে, বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে চাহিব কোন্ দিকে?

চাহিবার এক শ্মশান-ভূমি আছে,—নবদ্বীপ। সেইখানে সপ্তদশ যবনে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে, আমি সেই শ্মশান-ভূমি প্রতি চাই। যখন দেখি সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বেড়িয়া অদ্যাপি সেই কলধৌতবাহিনী গঙ্গা তর তর রব করিতেছেন, তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি - তুমি আছ, সে রাজলক্ষ্মী কোথায়? তুমি যাঁহার পা ধুয়াইতে, সে মাতা কোথায়? তুমি যাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে, সেই আনন্দরূপিণী কোথায়? তুমি যাঁহার জন্য সিংহল, বালী আরব, সুমাত্রা হইতে বুকে করিয়া ধন বহন করিয়া আনিতে, সে ধনেশ্বরী কোথায়? তুমি যাঁহার রূপের ছায়া ধরিয়া রূপসী সাজিতে, সে অনন্তসৌন্দর্য্যশালিনী কোথায়? তুমি যাঁহার প্রসাদি ফুল লইয়া ঐ স্বচ্ছ হৃদয়ে মালা পরিতে, সে পুষ্পাভরণা কোথায়? সে রূপ, সে ঐশ্বর্য্য কোথায় ধুইয়া লইয়া গিয়াছ? বিশ্বাসঘাতিনি, তুমি কেন আবার শ্রবণ-মধুর কল কল তর তর রবে মন ভুলাইতেছ? বুঝি তোমারই অতল গর্ভমধ্যে, যবন-ভয়ে ভীতা সেই লক্ষ্মী ডুবিয়াছেন, বুঝি কুপুত্রগণের আর মুখ দেখিবেন না বলিয়া ডুবিয়া আছেন। মনে মনে আমি সেই দিন কল্পনা করিয়া কাঁদি। মনে মনে দেখিতে পাই, মার্জ্জিত বর্শাফলক উন্নত করিয়া, অশ্বপদশব্দমাত্রে নৈশ নীরবতা বিঘ্নিত করিয়া, যবনসেনা নবদ্বীপে আসিতেছে। কাল পূর্ণ দেখিয়া নবদ্বীপ হইতে বাঙ্গালার লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইতেছেন। সহসা আকাশ অন্ধকারে ব্যাপিল; রাজপ্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। পথিক ভীত হইয়া পথ ছাড়িল; নগরীর অলঙ্কার খসিয়া পড়িল; কুঞ্জবনে পক্ষিগণ নীরব হইল; গৃহময়ূর কণ্ঠে অর্দ্ধব্যক্ত কেকার অপরার্দ্ধ আর ফুটিল না। দিবসে নিশীথ উপস্থিত হইল, পণ্যবীথিকার দীপমালা নিবিয়া গেল, পূজাগৃহে বাজাইবার সময়ে শঙ্খ বাজিল না; পণ্ডিতে অশুদ্ধ মন্ত্র পড়িল; সিংহাসন হইতে শালগ্রামশিলা গড়াইয়া পড়িল। যুবার সহসা বলক্ষয় হইল, যুবতী সহসা বৈধব্য আশঙ্কা করিয়া কাঁদিল: শিশু বিনারোগে মাতার ক্রোড়ে শুইয়া মরিল। গাঢ়তর, গাঢ়তর, গাঢ়তর অন্ধকারে দিক ব্যাপিল; আকাশ, অট্টালিকা, রাজধানী, রাজবর্ত্ম, দেবমন্দির, পণ্যবীথিকা, সেই অন্ধকারে ঢাকিল—কুঞ্জতীরভূমি, নদীসৈকত, নদীতরঙ্গ সেই অন্ধকারে—আঁধার, আঁধার, আঁধার হইয়া লুকাইল। আমি চক্ষে সব দেখিতেছি—আকাশ মেঘে ঢাকিতেছে—ঐ সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রাজলক্ষ্মী জলে নামিতেছেন। অন্ধকারে নির্ব্বাণোন্মুখ আলোকবিন্দুবৎ, জলে ক্রমে ক্রমে সেই তেজোরাশি বিলীন হইতেছে। যদি গঙ্গার অতল-জলে না ডুবিলেন, তবে আমার সেই দেশলক্ষ্মী কোথায় গেলেন?

ত্রয়োদশ সংখ্যা

বিড়াল

আমি শয়ন গৃহে, চারপায়ীর উপর বসিয়া, হুঁকা হাতে, ঝিমাইতেছিলাম। একটু মিট্ মিট্ করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে—দেওয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই—এজন্য হুঁকা হাতে, নিমীলিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন্ হইতাম, তবে ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কি না। এমত সময়ে একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল, "মেও।"

চাহিয়া দেখিলাম—হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার নিকট আফিঙ্গ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে, পাষাণবৎ কঠিন হইয়া বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্ব্বে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপরিমিত লোভ ভাল নহে। ডিউক বলিল, "মেও!"

তখন চক্ষু চাহিয়া ভাল করিয়া দেখিলাম যে, ওয়েলিংটন নহে। একটি ক্ষুদ্র মার্জ্জার; প্রসন্ন আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে, আমি তখন ওয়াটার্লুর মাঠে ব্যূহ-রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই। এক্ষণে মার্জ্জারসুন্দরী, নির্জ্জল দুগ্ধপানে পরিতৃপ্ত হইয়া, আপন মনের সুখ এ জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে, অতি মধুর স্বরে বলিতেছেন, "মেও!" বলিতে পারি না, বুঝি? তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল; বুঝি, মার্জ্জার মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, "কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই।" শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায় ছিল। বুঝি, বিড়ালের মনের ভাব—"তোমার দুধ ত খাইয়া বসিয়া আছি—এখন বল কি?"

বলি কি? আমি ত ঠিক করিতে পারিলাম না। দুধ আমার বাপের নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই; সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে, বিড়ালেও দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি যে সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গারস্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। কি জানি, এই মার্জ্জারী যদি স্বজাতিমণ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া সকাতরচিত্তে, হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া, অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্ব্বে মার্জ্জারী প্রতি ধাবমান হইলাম।

মার্জ্জারী কমলাকান্তকে চিনিত; সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া, একটু সরিয়া বসিল। বলিল, "মেও!" প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায়

আসিয়া হুঁকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া, মার্জ্জারের বক্তব্য সকল বুঝিতে পারিলাম।

বুঝিলাম যে, বিড়াল বলিতেছে, "মারপিট কেন? স্থির হইয়া, হুঁকা হাতে করিয়া, একটু বিচার করিয়া দেখ দেখি? এ সংসারের ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস, সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কি? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে—আমাদের কি নাই? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু আমরা খাইলেই তোমরা কোন্ শাস্ত্রানুসারে ঠেঙ্গা লাঠি লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ গ্রহণ কর। বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্যালয়সকল দেখিয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এত দিনে এ কথাটি বুঝিতে পারিয়াছ।

"দেখ, শয্যাশায়ী মনুষ্য! ধর্ম্ম কি? পরোপকারই পরম ধর্ম্ম। এই দুগ্ধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহরিত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল—অতএব তুমি সেই পরম ধর্ম্মের ফলভোগী—আমি চুরিই করি, আর যাই করি, আমি তোমার ধর্ম্মসঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ। অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা কর। আমি তোমার ধর্ম্মের সহায়।

"দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্ম্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়া চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম্ম চোরের নহে—চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?

"দেখ, আমি প্রাচীরে প্রাচীরে মেও মেও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত, নরদামায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা আমার পেটের ক্ষুধা কি প্রকারে জানিবে! হায়! দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হইলে তোমাদের কি কিছু অগৌরব আছে? আমার মত দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া, লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখন অন্ধকে মুষ্টি-ভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড় রাজা ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না—সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোটলোকের দুঃখের কাতর! ছি! কে হইবে?

"দেখ, যদি অমুক শিরোমণি কি অমুক ন্যায়ালঙ্কার, আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি কি তাঁহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং যোড়হাত

করিয়া বলিতে, আর একটু কি আনিয়া দিব? তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাঁহারা অতি পণ্ডিত, বড় মান্য লোক। পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশী? তা ত নয়—তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ—দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর—আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর—ছি! ছি!

"দেখ, আমাদিগের দশা দেখ প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে প্রাসাদে প্রাসাদে মেও মেও করিয়া আমরা চারিদিক্ দৃষ্টি করিতেছি—কেহ আমাদিগকে মাছের কাঁটাখানা ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল—গৃহমার্জ্জার হইয়া, বৃদ্ধের নিকট যুবতী ভার্য্যার সহোদর বা মূর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলওয়াড়ের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল তবেই তাহার পুষ্টি। তাহার লেজ ফুলে, গায়ে লোম হয়, এবং তাহাদের রূপের ছটা দেখিয়া, অনেক মার্জ্জার কবি হইয়া পড়ে।

"আর আমাদিগের দশা দেখ—আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে—জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে—অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, 'মেও! মেও! খাইতে পাই না!—" আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না! এ পৃথিবীর মৎস্য-মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও—নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দ্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী; কেনা না, আফিংখোর; তুমিও কি দেখিতে পাও না যে, ধনীর দোষেই দরিদ্রে চোর হয়? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া এক জনে পাঁচ শত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে খাইয়া তাহার যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেন না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।"

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম, "থাম! থাম মার্জ্জারপণ্ডিতে! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিষ্টিক! সমাজবিশৃঙ্খলার মূল! যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধনসঞ্চয় করিতে না পায় অথবা সঞ্চয় করিয়া চোখের জ্বালায় নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায় তবে কেহ আর ধনসঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না।"

মার্জ্জার বলিল, "না হইল ত আমার কি? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কি ক্ষতি?"

আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, "সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।" বিড়াল রাগ করিয়া বলিল যে, "আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব?"

বিড়ালকে বুঝান দায় হইল! যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিন্ কালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না। এ মার্জ্জার সুবিচারক, এবং সুতার্কিকও বটে, সুতরাং না বুঝিবার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম, "সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন, অতএব চোরের দণ্ডবিধান কর্ত্তব্য।"

মার্জ্জারী মহাশয়া বলিলেন, "চোরকে ফাঁসি দাও তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিন দিবস উপবাস করিয়া দেখ। তুমি যদি ইতিমধ্যে নসীরামবাবুর ভাণ্ডারঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও, আমি আপত্তি করিব না।"

বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মার্জ্জারকে বলিলাম যে, "এ সকল অতি নীতি বিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। তুমি এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাচরণে মন দাও। তুমি যদি চাহ, তবে পাঠার্থে তোমাকে আমি নিউমান ও পার্কারের গ্রন্থ দিতে পারি। আর কমলাকান্তের দপ্তর পড়িলেও কিছু উপকার হইতে পারে—আর কিছু হউক বা না হউক, আফিঙ্গের অসীম মহিমা বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর, প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে বলিয়াছে, জলযোগের সময় আসিও, উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীরা হও তবে পুনর্ব্বার আসিও, এক সরিষাভোর আফিঙ্গ দিব।"

মার্জ্জার বলিল, 'আফিঙ্গের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা, ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে।"

মার্জ্জার বিদায় হইল। একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছি, ভাবিয়া কমলাকান্তের বড় আনন্দ হইল।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

চতুর্দ্দশ সংখ্যা

ঢেঁকি

আমি ভাবি কি, যদি পৃথিবীতে ঢেঁকি না থাকিত, তবে খাইতাম কি? পাখীর মত দাঁড়ে বসিয়া ধান খাইতাম? না, লাঙ্গুলকর্ণদুল্যমানা গজেন্দ্রগামিনী গাভীর মত মরাইয়ে মুখ দিতাম? নিশ্চয় তাহা আমি পারিতাম না—নবযুবা কৃষ্ণকায় বস্ত্রশূন্য কৃষাণ আসিয়া আমার পঞ্জরে যষ্টিপাত করিত, আর আমি ফোঁস করিয়া নিঃশ্বাস

ফেলিয়া শৃঙ্গ-লাঙ্গুল লইয়া পলাইতাম। আর্য্যসভ্যতার অনন্ত মহিমায় সে ভয় নাই—ঢেঁকি আছে—ধান চাল হয়। আমি এই পরোপকার-নিরত ঢেঁকিকে আর্য্যসভ্যতার এক বিশেষ ফল মনে করি—আর্য্যসাহিত্য, আর্য্যদর্শন আমার মনে ইহার কাছে লাগে না—রামায়ণ, কুমারসম্ভব, পাণিনি, পতঞ্জলি, কেহ ধানকে চাল করিতে পারে না। ঢেঁকিই আর্যসভ্যতার মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র,—শ্রাদ্ধাধিকারী, নিত্য পিণ্ডদান করিতেছে। শুধু কি ঢেঁকিশালে? সমাজে, সাহিত্যে, ধর্ম্মসংস্কারে, রাজসভায়—কোথায় না ঢেঁকি আর্যসভ্যতার মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র, শ্রাদ্ধাধিকারী, নিত্য পিণ্ডদান করিতেছে। দুঃখের মধ্যে ইহাতেও আর্য্যসভ্যতা মুক্তিলাভ করিল না—আজিও ভূত হইয়া রহিয়াছে। ভরসা আছে কোন ঢেঁকি অচিরাৎ তাহার গয়া করিবে।

ঢেঁকির এই অপরিমেয় মাহাত্ম্যের কারণানুসন্ধানে আমি বড় সমুৎসুক হইলাম। এ ঊনবিংশ শতাব্দী বৈজ্ঞানিক সময়—অবশ্য কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়। কোথা হইতে ঢেঁকির এই কার্য্যদক্ষতা! এই পরোপকারে মতি! এই Public spirit? নাবস্তুনা বস্তুসিদ্ধিঃ?—বিনা কারণে কি ইহা জন্মে? অনুসন্ধানার্থ আমি ঢেঁকিশালে গেলাম।

দেখিলাম, ঢেঁকি খানায় পড়িতেছে। বিন্দুমাত্র মদ্যপান করে নাই, তথাপি পুনঃ পুনঃ খানায় পড়িতেছে, উঠিতেছে বিরতি নাই। ভাবিলাম, মুহুর্ম্মুহুঃ খানায় পড়াই কি এত মাহাত্ম্যের কারণ? ঢেঁকি খানায় পড়ে বলিয়াই কি এত পরোপকারে মতি? এতটা Public spirit? ভাবিলাম—না কখনই হইতে পারে না। কেন না আমার রামচন্দ্র ভায়াও দুই বেলা খানায় পড়িয়া থাকেন—কিন্তু কই, তাঁহার ত কিছুমাত্র Public spirit নাই। শৌণ্ডিকালয়ের বাহিরে ত তাঁহার পরোপকার কিছু দেখি না। আরও—মনের কথা লুকাইলে কি হইবে? আমিও—আমি শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী স্বয়ং, এক দিন খানায় পড়েছিলাম। দ্রাক্ষারসের বিকারবিশেষের সেবনে আমার সেই গর্ত্তলোক প্রাপ্তি ঘটে নাই—কারণান্তরে। প্রসন্ন গোয়ালিনী—গোপাঙ্গনাকুল-কলঙ্কিনী,—এক দিন তাহার মঙ্গলা গাইকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। ছাড়িবামাত্র মঙ্গলা, ঊর্দ্ধ্বপুচ্ছে প্রণতশৃঙ্গে ধাবমানা! কি ভাবিয়া মঙ্গলা ছুটিল, তা বলিতে পারি না, স্ত্রীজাতি ও গোজাতির মনের কথা কি প্রকারে বলিব? কিন্তু আমি ভাবিলাম, আমিই তাহার উভয় শৃঙ্গের একমাত্র লক্ষ্য। তখন আমি কটিদেশ দৃঢ়তর বন্ধ করিয়া, সদর্পে বদ্ধপরিকর হইয়া, ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে পলায়মান! পশ্চাতে সেই ভীষণা ঘটোধ্নী রাক্ষসী! আমিও যত দৌড়াই, সেও তত দৌড়ায়। কাজেই, দৌড়ের চোটে ওচট খাইয়া, গড়াইতে গড়াইতে গড়াইতে, চন্দ্রসূর্য্য গ্রহনক্ষত্রের ন্যায় গড়াইতে গড়াইতে গড়াইতে—বিবরলোক প্রাপ্তি! "আলু থালু কেশপাশ, মুখে না বহিছে শ্বাস"—হায়! তখন কি আমার হৃদয়-আকাশ মধ্যে Public spirit রূপ পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছিল? না হইয়াছিল, এমত নহে। তখন আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, বসুন্ধরা যদি গোশূন্যা হয়েন, আর নারিকেল, তাল,

খর্জুর প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে দুগ্ধনিঃসরণ হয়, তবে এই দুগ্ধপোষ্য বাঙ্গালিজাতির বিশেষ উপকার হয়। তাহারা শৃঙ্গভীতিশূন্য হইয়া দুগ্ধ পান করিতে থাকে। সে দিন সেই বিবরপ্রাপ্তি হেতু আমার পরহিতকামনা এত দূর প্রবল হইয়াছিল যে, আমি প্রসন্নকে সময়ান্তরে বলিয়াছিলাম,—"অয়ি দধিদুগ্ধক্ষীরনবনীত-পরিবেষ্টিতা গোপকন্যে! তুমি গোরুগুলি বিক্রয় করিয়া স্বয়ং লাউ ভুসি খাইতে থাক, তুমি স্বয়ং ঘটোধ্নী হইয়া বহুতর দুগ্ধপোষ্য প্রতিপালন করিতে পারিবে,—কাহাকেও গুঁতাইও না।" প্রত্যুত্তরে প্রসন্ন হঠাৎ সম্মার্জ্জনী হস্তে গ্রহণ করায় সে দিন আমাকে পরহিতব্রত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

অতএব পরহিতেচ্ছা, দেশবাৎসল্য 'সাধারণ আত্মা' অর্থাৎ Public spirit, বিশেষতঃ কার্য্যদক্ষতা, এ সকল থানায় পড়িলে হয় কি না? যদি না হয়, তবে ঢেঁকির এ কার্য্যদক্ষতা, এ মহাবল কোথা হইতে আসিল? আমি এই কূটতর্কের মীমাংসার জন্য সন্দিহানচিত্তে ভাবিতেছিলাম, এমত সময়ে মধুরকণ্ঠে কে বলিল, "চক্রবর্ত্তী মহাশয়! হাঁ করিয়া কি ভাবিতেছ? ঢেঁকি কখনও দেখ নাই?"

চাহিয়া দেখিলাম, তরঙ্গিণী মাতঙ্গিণী দুই ভগিনী ঢেঁকিতে পাড় দিতেছে। সে দিকে এতক্ষণ চাহিয়া দেখি নাই। হাতী দেখিতে গিয়া অন্ধ কেবল শুণ্ড দেখিয়াছিল, আমিও ঢেঁকি দেখিতে গিয়া কেবল ঢেঁকির শুঁড় দেখিতেছিলাম। পিছনে যে দুই জনের দুইখানি রাঙ্গা পা ঢেঁকির পিঠে পড়িতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখি নাই। দেখিবামাত্র যেন কে আমার চোখের ঠুলি খুলিয়া লইল।

আমার দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল—কার্য্যকারণসম্বন্ধপরম্পরা আমার চক্ষে প্রখর সূর্য্যকিরণে প্রভাসিত হইল—ঐ ত ঢেঁকির বল! ঐ ত ঢেঁকির মাহাত্ম্যের মূল কারণ!—ঐ রমণীপাদপদ্ম! ধপাধপ পাদপদ্ম পিঠে পড়িতেছে, আর ঢেঁকি ধান ভানিয়া চাল করিতেছে। উঠিয়া পড়িয়া—ঢক ঢক কচ কচ! কত পরোপকারই করিতেছে! হায় ঢেঁকি! ও পায়ের কি এত গুণ! পিঠে পাইয়া তুমি এই সাত কোটি বাঙ্গালিকে অন্ন দিতেছ—তার উপর আবার দেবতার ভোগ দিতেছ! এস, মেয়ে মানুষের শ্রীচরণ! তুমি ভাল করিয়া ঢেঁকির পিঠে পড়, আমি কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়া তোমায়—হায়! কি করিব?—কাঁসার মল পরাই!

আর ভাই, ঢেঁকির দল। তোমাদের বিদ্যাবুদ্ধি বুঝিয়াছি। যখনই পিঠে রমণী-পাদপদ্ম ওরফে মেয়ে লাথি পড়ে, তখনই তোমরা ধান ভান—নহিলে কেবল কাঠ—দারুময়—গর্ত্তে শুঁড় লুকাইয়া, লেজ উঁচু করিয়া, ঢেঁকিশালে পড়িয়া থাক। বিদ্যার মধ্যে খানায় পড়া, আনন্দের মধ্যে "ধান্য"; পুরুস্কারের মধ্যে সেই রাঙ্গা পা। আবার শুনিতে পাই তোমাদের একটি বিশেষ গুণ আছে নাকি?—ঘরে থাকিয়া নাকি মধ্যে মধ্যে কুমীর হও? আর ভাই ঢেঁকি, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—মধ্যে মধ্যে স্বর্গে যাওয়া হয় শুনিয়াছি, সত্য সত্যই কি সেখানে গিয়াও ধান ভানিতে হয়? দেবতারা সকলে অমৃত খায়, পারিজাত লোফে অপ্সরা লইয়া ক্রীড়া করে, মেঘে চড়ে, বিদ্যুৎ ধরে, রতি রতিপতির সঙ্গে লুকোচুরি খেলে—তুমি নাকি ততক্ষণ কেবল ঘেচর ঘেচর করিয়া ধান ভান? ধন্য সাধ্য ভাই তোমার!

ঢেঁকি কোন উত্তর দিল না, কেবলই ধান ভানে। রাগ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলাম—একেবারে কমলাশ্রমে। কমলাশ্রমটা কি? ৺ননীবাবু সম্প্রতি ধান ভানিতে গিয়াছেন। নিপ্রত্যাশী নাপিতানী একখানি ভাঙ্গা চালা ঘর রাখিয়া উত্তরাধিকারি-বিরহিতা হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছে—ঘরখানির এমনি অবস্থা যে, আর কেহ তাহার কামনা করিল না—সুতরাং আমি তাহাতে কমলাশ্রম করিয়াছি—কেবল কমলাকান্তের আশ্রম নহে—সাক্ষাৎ কমলার আশ্রম। আমি সেইখানে চারপাইর উপর পড়িয়া আফিঙ্গ চড়াইলাম। তখন চক্ষু বুঝিয়া আসিল। জ্ঞাননেত্র উদয় হইল। দেখিলাম, এ সংসার কেবল ঢেঁকিশাল। বড় বড় ইমারত, বৈঠকখানা, রাজপুরী সব ঢেঁকিশালা—তাহাতে বড় বড় ঢেঁকি, গড়ে নাক পুরিয়া খাড়া হইয়া রহিয়াছে। কোথাও জমিদার-রূপ ঢেঁকি, প্রজাদিগের হৃৎপিণ্ড গড়ে পিষিয়া, নূতন নিরিখ-রূপ চাউল বাহির করিয়া সুখে সিদ্ধ করিয়া অন্ন ভোজন করিতেছেন। কোথাও আইনকারক ঢেঁকি, মিনিট রিপোর্টের রাশি গড়ে পিষিয়া, ভানিয়া বাহির করিতেছেন—আইন; বিচারক ঢেঁকি সেই আইনগুলি গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন—দারিদ্র্য, কারাবাস—ধনীর ধনান্ত—ভাল মানুষের দেহান্ত। বাবু ঢেঁকি বোতল গড়ে পিতৃধন পিষিয়া বাহির করিতেছেন—পিলে যকৃৎ; তাঁর গৃহিণী ঢেঁকি একাদশীর গড়ে বাজার খরচ পিষিয়া বাহির করিতেছেন—অনাহার। সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক দেখিলাম লেখক ঢেঁকি—সাক্ষাৎ মা সরস্বতীর মুণ্ড ছাপার গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন—স্কুলবুক!

দেখিতে দেখিতে দেখিলাম—আমিও একটা মস্ত ঢেঁকি—কমলাশ্রমে লম্ববান হইয়া পড়িয়া আছি; নেশার গড়ে মনোদুঃখ ধান্য পিষিয়া দপ্তর চাউল বাহির করিতেছি। মনে মনে অহঙ্কার জন্মিল—এমন চাউল ত কাহারও গড়ে হইতেছে না। তখন ইচ্ছা হইল—এ চাউল মনুষ্য-লোকের উপযুক্ত নহে, আমি স্বর্গে গিয়া ধান ভানিব। তখনই স্বর্গে গেলাম—"অশ্বমনোরথে।" স্বর্গে গিয়া, দেবরাজকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "হে দেবেন্দ্র! আমি শ্রীকমলাকান্ত ঢেঁকি—স্বর্গে ধান ভানিব।"

দেবেন্দ্র বলিলেন, "আপত্তি কি—পুরস্কার চাই কি?"

আমি। উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা।

দেবরাজ। উর্ব্বশী মেনকা পাইবে না—আর যাহা চাহিলে, তাহা ত মর্ত্ত্যলোকেও তুমি পাইয়া থাক, আটটার হিসাবে।

আমি দুর্ম্মুখ—"বলিলাম, কি ঠাকুর, অষ্টরম্ভা! সে কি আজকাল নরলোকের পাবার যো আছে? সে আজকাল দেবতাদেরই একচেটে।"

সন্তুষ্ট হইয়া দেবরাজ আমাকে বক্‌শিশ হুকুম করিলেন,—এক সের অমৃত, আর এক ঘণ্টার জন্য উর্ব্বশীর সঙ্গীত। চৈতন্য হইয়া দেখিলাম, পাশে ঘটিতে এক সের দুগ্ধ,—আর প্রসন্ন, দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে—"নেশাখোর!" 'বিট্‌লে!" "পেটার্থী!" ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি উর্ব্বশীকে বলিলাম, "বাইজি! এক ঘণ্টা হইয়াছে—এখন বন্ধ কর।"

কমলাকান্তের পত্র

প্রথম সংখ্যা

কি লিখিব ?

পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত বঙ্গদর্শন* সম্পাদক মহাশয়

শ্রীচরণকমলেষু

আমার নাম শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, সাবেক নিবাস শ্রীশ্রী৺নসিধাম, আপনাকে আমি প্রণাম করি। আপনার নিকট আমার সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচয় নাই কিন্তু আপনি নিজগুণে আমার বিশেষ পরিচয় লইয়াছেন, দেখিতেছি। ভীষ্মদেব খোষনবীস জুয়াচোর লোক, আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম—আমি দপ্তরটি তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া তীর্থদর্শনে যাত্রা করিয়াছিলাম; তিনি সেই অবসর পাইয়া সেইটি আপনাকে বিক্রয় করিয়াছেন। বিক্রয় কথাটি আপনি স্বীকার করেন নাই, কিন্তু আমি জানি, ভীষ্মদেব ঠাকুর বিনামূল্যে শালগ্রামকে তুলসী দেন না, বিনামূল্যে যে আপনাকে শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত দপ্তর দিবেন, এমত সম্ভাবনা অতি বিরল। এই জুয়াচুরির কথা আমি এত দিন জানিতাম না। দৈবাধীন একটি যোড়া জুতা কিনিয়া এ সন্ধান পাইলাম। একখানি ছাপার কাগজে জুতা যোড়াটি বান্ধা ছিল, দেখিয়া ভাবিতেছিলাম যে, কাহার এমন সৌভাগ্যের উদয় হইল যে, তাহার রচনা শ্রীমৎ কমলাকান্ত শর্ম্মার চরণযুগলের ব্যবহার্য্য পাদুকাদ্বয় মণ্ডন করিতেছে! মনে করিলাম, সার্থক তাহার লেখনীধারণ! সার্থক তাহার নিশীথ-তৈলদাহ! মূর্খের দ্বারা তাহার রচনা পঠিত না হইয়া সাধু জনের চরণের সঙ্গে যে কোন প্রকার সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে, ইহা বঙ্গীয় লেখকের সৌভাগ্য। এই ভাবিয়া কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পড়িয়া দেখিলাম যে, কাগজখানি কি। পড়িলাম, উপরে লেখা আছে, "বঙ্গদর্শন।" ভিতরে লেখা আছে, "কমলাকান্তের দপ্তর।" তখন বুঝিলাম যে, আমারি এ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফল।

আরও একটু কৌতূহল জন্মিল। বঙ্গদর্শন কি, তাহা জানিবার ইচ্ছা হইল। এক জন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "মহাশয়, বঙ্গদর্শনটা কি, তাহা বলিতে পারেন?" তিনি অনেকক্ষণ ভাবিলেন। অনেকক্ষণ পরে মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "বোধ হয় বঙ্গদেশ দর্শন করাই বঙ্গদর্শন।" আমি তাঁহার পাণ্ডিত্যের অনেক প্রশংসা করিলাম, কিন্তু অগত্যা অন্য বন্ধুকেও ঐ প্রশ্ন করিতে হইল। অন্য বন্ধু সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শকারের উপর যে রেফটি আছে, বোধ হয়, তাহা মুদ্রাকরের ভ্রম; শব্দটি "বঙ্গদশন," অর্থাৎ বাংলার দাঁত। আমি তাহাকে চতুষ্পাঠী খুলিতে

---

* "কমলাকান্তের দপ্তর" বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হয়। যখন এই পত্রগুলি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় তখন সঞ্জীববাবু ইহার সম্পাদক।

পরামর্শ দিয়া অন্য এক সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বঙ্গ শব্দে পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, "ইহার অর্থ পূর্ব্ব-বাঙ্গালা দর্শন করিবার বিধি," অর্থাৎ "A Guide to Eastern Bengal." এইরূপ বহু প্রকার অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে জানিতে পারিলাম যে, বঙ্গদর্শন একখানি মাসিক পত্রিকা এবং তাহাতে কমলাকান্ত শর্ম্মার মাসিক পিণ্ডদান হইয়া থাকে। এক্ষণে আবার শুনিতেছি, কোন ধনুর্দ্ধর ঐ দপ্তরগুলি নিজ প্রণীত বলিয়া প্রচারিত করিয়াছেন। আরও কত হবে!

অতএব হে বঙ্গদর্শন-সম্পাদক মহাশয়! অবগত হউন যে, আমি শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মা সশরীরে ইহজগতে অদ্যাপি অধিষ্ঠান করিতেছি এবং আপনাদিগের বিশেষ আপত্তি থাকিলেও আরও কিছুদিন অধিষ্ঠান করিব এমত ইচ্ছা রাখি।

এক্ষণে কি জন্য আপনাকে অদ্য পত্র লিখিতেছি, তাহা অবগত হউন। উপরে দেখিতে পাইবেন, "শ্রীশ্রী৺নসিধাম" লিখিয়াছি। অর্থাৎ আমার নসিবাবু শ্রীশ্রী৺ ঈশ্বরে বিলীন হইয়াছেন! ভরসা করি যে, তিনি সর্ব্বাশ্রয় শ্রীপাদপদ্মে পোঁছিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার গতি কোন্ পথে হইয়াছে, তাহার নিশ্চিত সম্বাদ আমি রাখি না। কেবল ইহাই জানি যে, ইহলোকে তিনি নাই। অতএব আমারও আশ্রয় নাই! অহিফেনের কিছু গোলযোগ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কিছু বন্দোবস্ত করিতে পারেন? আমার দপ্তরের জন্য আপনি খোশনবীস মহাশয়কে কি দিয়াছিলেন বলিতে পারি না; কিন্তু আমাকে এক আধ পোয়া আফিঙ্গ পাঠাইলেই (আমার মাত্রা কিছু বেশী) আমি এক একটি প্রবন্ধ পাঠাইতে পারিব। আপনার মঙ্গল হউক। আপনি ইহাতে দ্বিরুক্তি করিবেন না।

কিন্তু আপনার সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত পাকাপাকি করিবার আগে, গোটা কত কথা জিজ্ঞাসা আছে। এ কমলাকান্ত কলে, ফরমায়েস মত সকল রকমের রচনা প্রস্তুত হয়—আপনার চাই কি? নাটক-নভেল চাই, না পলিটিক্সের দরকার? কিছু ঐতিহাসিক গবেষণা পাঠাইব, না সংক্ষিপ্ত সমালোচনার বাহার দিব? বিজ্ঞানশাস্ত্রে আপনার প্রসক্তি, না ভৌগোলিকতত্ত্ব রসে আপনি সুরসিক? স্থূল কথাটা, গুরু বিষয় পাঠাইব, না লঘু বিষয় পাঠাইব? আমার রচনার মূল্য, আপনি গজ দরে দিবেন, না মণ দরে দিবেন? আর যদি গুরু বিষয়েই আপনার অভিরুচি হয়, তবে বলিবেন, তাহার কি প্রকার অলঙ্কার সমাবেশ করিব। আপনি কোটেশ্যন ভালবাসেন, না ফুটনোটে আপনার অনুরাগ? যদি কোটেশ্যন বা ফুটনোটের প্রয়োজন হয়, তবে কোন্ ভাষা হইতে দিব, তাহাও লিখিবেন। ইওরোপ ও আশিয়ার সকল ভাষা হইতেই আমার কোটেশ্যন সংগ্রহ করা হইয়াছে—আফ্রিকা ও আমেরিকার কতকগুলি ভাষার সন্ধান পাই নাই। কিন্তু সেই সকল ভাষার কোটেশ্যন, আমি অচিরাৎ প্রস্তুত করিব, আপনি চিন্তিত হইবেন না!

যদি গুরু বিষয়ক রচনা আপনার নিতান্ত মনোনীত হয়, তবে কি প্রকার গুরু বিষয়ে আপনার আকাঙ্ক্ষা তাহাও জানাইবেন। আমি স্বয়ং সে দিকে কিছু করিতে

পারি না পারি, আমার এক বড়-সহায় জুটিয়াছে। ভীষ্মদেব খোশনবীস মহাশয়ের পুত্র যিনি ইউটিলিটি শব্দের আশ্চর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন*, তাঁহাকে আপনার স্মরণ থাকিতে পারে। তিনি এক্ষণে কৃতবিদ্য হইয়াছেন। এম. এ. পাস করিয়া বিদ্যার ফাঁস গলায় দিয়াছেন। গুরু বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার। ইস্কুলের বহি চাই কি ? তিনি বর্ণপরিচয় হইতে রোমদেশের ইতিহাস পর্য্যন্ত সকলই লিখিতে পারেন। ন্যাচরল্ হিষ্টরির একশেষ করিয়া রাখিয়াছেন ; পুরাতন পেনি মেগেজিন্ হইতে অনেক প্রবন্ধের অনুবাদ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং গোল্ডস্মিথ কৃত এনিমেটেড্ নেচরের সারাংশ সঙ্কলন করিয়া রাখিয়াছেন। সে সব চাই কি ? গুরুর মধ্যে গুরু যে পাটী-গণিত এবং জ্যামিতি, তাহাতেও সাহসশূন্য নহেন। জ্যামিতি এবং ত্রিকোণমিতি চুলোয় যাক চতুষ্কোণমিতিতেও তাঁহার অধিকার—দৈববিদ্যাবলে তিনি আপনার পৈতৃক চতুষ্কোণ পুকুরটিও মাপিয়া ফেলিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে. শুনিয়া লোকে ধন্য ধন্য করিয়াছিল। তাঁহার ঐতিহাসিক কীর্ত্তির কথা কি বলিব ? তিনি চিতোরের রাজা আলফ্রেড দি গ্রেটের একখানি জীবন-চরিত দশ পনের পৃষ্ঠা লিখিয়া রাখিয়াছেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্য-সমালোচন-বিষয়ক একখানি গ্রন্থ মহাভারত হইতে সঙ্কলিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে কোমত ও হর্বর্ট স্পেন্সরের মত খণ্ডন আছে ; এবং ডারুইন যে বলেন, যে মাধ্যাকর্ষণের বলে পৃথিবী স্থির আছে, তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে মালতীমাধব হইতে চারি পাঁচটা শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সুতরাং একখানি মোটের উপরে ভারি রকমের গুরুবিষয়ক গ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে। ভরসা করি, সমালোচনাকালে আপনারা বলিবেন, বাঙ্গালা ভাষায় ইহা অদ্বিতীয়।

ভরসা করি, গুরু বিষয় ছাড়িয়া লঘু বিষয়ে আপনার অভিরুচি হইবে না। কেন না, সে সকলের কিছু অসুবিধা। খোশনবীসপুত্র একখানি নাটকের সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখিয়াছেন বটে ; নায়িকার নাম চন্দ্রকলা, কি শশিরম্ভা রাখিবেন স্থির করিয়াছেন,—তাঁহার পিতা বিজয়পুরের রাজা ভীমসিংহ ; আর নায়ক আর একটা কিছু সিংহ ; এবং শেষ অঙ্কে শশিরম্ভা নায়কের বুকে ছুরি মারিয়া আপনি হা হতোঽস্মি করিয়া পুড়িয়া মরিবেন, এই সকল স্থির করিয়াছেন। কিন্তু নাটকের আদ্য ও মধ্যভাগ কি প্রকার হইবে, এবং অন্যান্য "নাটকোল্লিখিত ব্যক্তিগণ" কিরূপ করিবেন, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। শেষ অঙ্কের ছুরি-মারা সিনের কিছু লিখিয়া রাখিয়াছেন ; এবং আমি শপথপূর্ব্বক আপনার নিকট বলিতে পারি যে, যে কুড়ি ছত্র লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে আটটা "হা, সখি !" এবং তেরটা "কি হলো ! কি হলো !" সমাবেশ করিয়াছেন। শেষে একটি গীতও দিয়াছেন—নায়িকা ছুরি হস্তে করিয়া গাহিতেছে ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, নাটকের অন্যান্য অংশ কিছুই লেখা হয় নাই।

* ইউ—টিল—ইটি—আই।

যদি নবেলে আপনার আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহা হইলেও আমরা অর্থাৎ খোশনবীস কোম্পানী কিছু অপ্রস্তুত নহি। আমরা উত্তম নবেল লিখিতে পারি, তবে কি না ইচ্ছা ছিল যে, বাজে নবেল লিখিয়া ডনকুইক্সোট বা জিলব্লার পরিশিষ্ট লিখিব। দুর্ভাগ্যবশতঃ দুইখানি পুস্তকের একখানিও এ পর্য্যন্ত আমাদের পড়া হয় নাই। সম্প্রতি মেকলের এসের পরিশিষ্ট লিখিয়া দিলে আপনার কার্য্য হইতে পারে কি? সেও নবেল বটে।

যদি কাব্য চাহেন, তবে মিত্রাক্ষর অমিত্রাক্ষর বিশেষ করিয়া বলিবেন। মিত্রাক্ষর আমাদের হইতে হইবে না— আমরা পয়ার মিলাইতে পারি না। তবে অমিত্রাক্ষর যত বলিবেন, তত পারিব। সম্প্রতি খোশনবীসের ছানা, জীমূতনাদবধ বলিয়া একখানি কাব্যের প্রথম খণ্ড লিখিয়া রাখিয়াছেন, ইহা প্রায় মেঘনাদবধের তুল্য —দুই চারিটা নামের প্রভেদ আছে মাত্র। চাই?

আর যদি লঘু গুরু সব ছাড়িয়া, খোশনবিসী রচনা ছাড়িয়া, সাফ কমলাকান্তি ঢঙ্গে আপনার রুচি হয়, তবে তাও বলুন, আমার প্রণীত ছাই ভস্ম যাহা কিছু লেখা থাকে, তাহা পাঠাই। মনে থাকে যেন, তাহার বিনিময়ে আফিঙ্গ লইব! ওজন কড়ার গণ্ডায় বুঝিয়া লইব—এক তিল ছাড়িব না।

আপনি কি রাজি? আপনি রাজি হউন বা না হউন, আমি রাজি।

দ্বিতীয় সংখ্যা

পলিটিক্স্

শ্রীচরণেষু· আফিঙ্গ পাইয়াছি। অনেকটা আফিঙ্গ পাঠাইয়াছেন—শ্রীচরণকমলেষু। আপনার শ্রীচরণকমলযুগলেষু—আরও কিছু আফিঙ্গ পাঠাইবেন।

কিন্তু শ্রীচরণকমলযুগল হইতে কমলাকান্তের প্রতি এমন কঠিন আজ্ঞা কি জন্য হইয়াছে, বুঝিতে পারিলাম না। আপনি লিখিয়াছেন যে, এক্ষণে নয় আইনে অন্যত্র কিছু পলিটিক্স্ কম পড়িবে তুমি কিছু পলিটিক্স্ ঝাড়িলে ভাল হয়। কেন মহাশয়? আমি কি দোষ করিয়াছি যে, পলিটিক্স্ সব্জেক্টরূপী আমা ইট মাথায় মারিব? কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবী ব্রাহ্মণ, তাহাকে পলিটিক্স্ লিখিবার আদেশ কেন করিয়াছেন? কমলাকান্ত স্বার্থপর নহে—আফিঙ্গ ভিন্ন জগতে আমার স্বার্থ নাই. আমার উপর পলিটিকেল চাপ কেন? আমি রাজা, না খোসামুদে, না জুয়াচোর, না ভিক্ষুক, না সম্পাদক, যে আমাদের পলিটিক্স্ লিখিতে বলেন? আপনি আমার দপ্তর পাঠ করিয়াছেন, কোথায় আমার এমন স্থূল বুদ্ধির চিহ্ন পাইলেন যে, আমাকে পলিটিক্স্ লিখিতে বলেন? আফিঙ্গের জন্য আমি আপনার খোসামোদ করিয়াছি বটে, কিন্তু তাই বলিয়া আমি এমন স্বার্থপর চাটুকার অদ্যাপি হই নাই যে, পলিটিক্স্ লিখি। ধিক্ আপনার সম্পাদকতায়! ধিক্ আপনার আফিঙ্গ দানে! আপনি

আজিও বুঝিতে পারেন নাই যে. কমলাকান্ত শর্ম্মা উচ্চাশয় কবি, কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবী পলিটিশ্যান নহে।

আপনার আদেশ প্রাপ্তে বড়ই মনঃক্ষুণ্ন হইয়া এক পতিত বৃক্ষের কাণ্ডোপরি উপবেশন করিয়া বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের বুদ্ধিবৈপরীত্য ভাবিতেছিলাম। কি করি. ভরিটাক্‌ আফিঙ্গ গলদেশের অধোভাগে যেন তেন প্রকারেণ প্রেরণ করিলাম। সম্মুখে শিরে কলুর বাড়ী—বাড়ীর প্রাঙ্গণে দুই তিনটা বলদ বাঁধা আছে—মাটিতে পোঁতা নাদায় কলুপত্নীর হস্ত মিশ্রিত খলি-মিশান ললিত বিচালিচূর্ণ গোগণ মুদিতনয়নে, সুখের আবেশে কবলে গ্রহণ করিয়া ভোজন করিতেছিল। আমি কতকটা স্থিরচিত্ত হইলাম—এখানে ত পলিটিক্‌স্‌ নাই। এই নাদার মধ্য হইতে গোগণ পলিটিক্‌স্‌-বিকার-শূন্য অকৃত্রিম সুখ পাইতেছে—দেখিয়া তৃপ্ত হইলাম। তখন অহিফেন-প্রসাদপ্রসন্ন চিত্ত লোকের এই পলিটিক্‌স্‌প্রিয়তা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার তখন বিদ্যাসুন্দর যাত্রার একটি গান মনে পড়িল।

বোবার ইচ্ছা কথা ফুটে,
খোঁড়ার ইচ্ছা বেড়ায় ছুটে,
তোমার ইচ্ছা বিদ্যা ঘটে
ইচ্ছা বটে ইত্যাদি।

আমাদের ইচ্ছা পলিটিক্‌স্‌—হপ্তায় হপ্তায় রোজ রোজ পলিটিক্‌স্‌; কিন্তু বোবার বাক্‌চাতুরীর কামনার মত, খঞ্জের দ্রুতগমনের আকাঙ্ক্ষার মত অন্ধের চিত্রদর্শনলালসার মত, হিন্দু বিধবার স্বামিপ্রণয়াকাঙ্ক্ষার মত আমার মনে আদরের আদরিণী গৃহিণীর আদরের সাধের মত, হাস্যাস্পদ. ফলিবার নহে। ভাই পলিটিক্‌স্‌-ওয়ালারা, আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী তোমাদিগের হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াদার শ্বশুরবাড়ী আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্‌স্‌ নাই। "জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো!" ইহাই তাহাদের পলিটিক্‌স্‌! তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিক্‌স্‌ যে গাছে ফলে তাহার বীজ এ দেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।

এইরূপ ভাবিতেছিলাম, ইত্যবসরে দেখিলাম, শিবু কলুর পৌত্র দশমবর্ষীয় বালক, এক কাঁসি ভাত আনিয়া উঠানে বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। দূর হইতে একটি শ্বেতকৃষ্ণ কুক্কুর তাহা দেখিল। দেখিয়া, একবার দাঁড়াইয়া, চাহিয়া চাহিয়া, ক্ষুণ্ন মনে জিহ্বা নিষ্কৃত করিল। অমল-ধবল অন্নরাশি কাংস্যপাত্রে কুসুমদামবৎ বিরাজ করিতেছে—কুকুরের পেটটা দেখিলাম, নিতান্ত পড়িয়া আছে। কুক্কুর চাহিয়া চাহিয়া, দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া, এক বার আড়মোড়া ভাঙ্গিয়া হাই তুলিল।

তার পর ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে ধীরে এক এক পদ অগ্রসর হইল, এক এক বার কলুর পুত্রের অন্নপরিপূরিত বদন প্রতি আড়নয়নে কটাক্ষ করে, এক এক পা এগোয়। অকস্মাৎ অহিফেন-প্রসাদে দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিলাম দেখিলাম, এই ত পলিটিক্‌স্‌,—এই কুক্কুর ত পলিটিশ্যান! তখন মনোভিনিবেশপূর্ব্বক দেখিতে লাগিলাম যে, কুক্কুর

পাকা পলিটিকেল চাল চালিতে আরম্ভ করিল। কুক্কুর দেখিল—কলুপুত্র কিছু বলে না—বড় সদাশয় বালক—কুক্কুর কাছে গিয়া, থাবা পাতিয়া বসিল। ধীরে ধীরে লাঙ্গুল নাড়ে, আর কলুর পোর মুখপানে চাহিয়া ; হ্যা-হ্যা করিয়া হাঁপায়। তাঁহার ক্ষীণ কলেবর, পাতলা পেট, কাতর দৃষ্টি এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস দেখিয়া কলুপুত্রের দয়া হইল, তাহার পলিটিকেল এজিটেশ্যন সফল হইল ; কলুপুত্র একখানা মাছের কাঁটা উত্তম করিয়া চুষিয়া লইয়া, কুক্কুরের দিকে ফেলিয়া দিল। কুক্কুর আগ্রহ সহকারে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, তাহা চর্ব্বণ, লেহন, গেলন এবং হজমকরণে প্রবৃত্ত হইল। আনন্দে তাহার চক্ষু বুজিয়া আসিল।

যখন সেই মৎস্যকণ্টকসম্বন্ধে এই সুমহৎ কার্য্য উত্তমরূপে সমাপন হইল, তখন সেই সুচতুর পলিটিশ্যনের মনে হইল যে, আর একখানা কাঁটা পাইলে ভাল হয়। এইরূপ ভাবিয়া, পলিটিশ্যন আবার বালকের মুখপানে চাহিয়া রহিল। দেখিল, বালক আপন মনে গুড় তেঁতুল মাখিয়া ঘোর রবে ভোজন করিতেছে—কুক্কুর পানে আর চাহে না। তখন কুক্কুর একটি bold move অবলম্বন করিল—জাত পলিটিশ্যন, না হবে কেন ? সেই রাজনীতিবিদ্ সাহসে ভর করিয়া একটু অগ্রসর হইয়া বসিলেন। আর এক বার হাই তুলিলেন। তাহাতেও কলুর ছেলে চাহিয়া দেখিল না। অতঃপর কুক্কুর মৃদু মৃদু শব্দ করিতে লাগিলেন। বোধ হয়, বলিতেছিলেন, হে রাজাধিরাজ কলুপুত্র! কাঙ্গালের পেট ভরে নাই। তখন কলুর ছেলে তাহার পানে চাহিয়া দেখিল। আর মাছ নাই —এক মুষ্টি ভাত কুকুরকে ফেলিয়া দিল। পুরন্দর যে সুখে নন্দনকাননে বসিয়া সুধা পান করেন, কার্ডিনেল উল্‌সি বা কার্ডিনেল্ জেরেজ যে সুখে কার্ডিনেলের টুপি পরিয়াছিলেন, কুক্কুর সেই সুখে সেই অন্নমুষ্টি ভোজন করিতে লাগিল। এমত সময়ে, কলুগৃহিণী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ছেলের কাছে একটা কুকুর ম্যাক্ ম্যাক্ করিয়া ভাত খাইতেছে—দেখিয়া কলুপত্নী রোষ-কষায়িত-লোচনে এক ইষ্টকখণ্ড লইয়া কুক্কুর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাজনীতিজ্ঞ তখন আহত হইয়া, লাঙ্গুলসংগ্রহপূর্ব্বক বহুবিধ রাগ-রাগিণী আলাপচারী করিতে করিতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

এই অবসরে আর একটি ঘটনা দৃষ্টিগোচর হইল। যত ক্ষণ ক্ষীণজীবী কুক্কুর আপন উদরপূর্ত্তির জন্য বহুবিধ কৌশল করিতেছিল, তত ক্ষণ এক বৃহৎকায় বৃষ আসিয়া কলুর বলদের সেই খোলবিচালি-পরিপূর্ণ নাদায় মুখ দিয়া জাব্‌না খাইতেছিল—বলদ বৃষের ভীষণ শৃঙ্গ এবং স্থূলকায় দেখিয়া, মুখ সরাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কাতরনয়নে তাহার আহারনৈপুণ্য দেখিতেছিল। কুক্কুরকে দূরীকৃত করিয়া, কলুগৃহিণী এই দস্যুতা দেখিতে পাইয়া এক বংশখণ্ড লইয়া বৃষকে গোভাগাড়ে যাইবার পরামর্শ দিতে দিতে তৎপ্রতি ধাবমানা হইলেন। কিন্তু ভাগাড়ে যাওয়া দূরে থাকুক—বৃষ এক পদও সরিল না—এবং কলুগৃহিণী নিকটবর্ত্তিণী হইলে বৃহৎ শৃঙ্গ হেলাইয়া, তাঁহার হৃদয়মধ্যে সেই শৃঙ্গাগ্রভাগ প্রবেশের সম্ভাবনা জানাইয়া দিল। কলুপত্নী তখন রণে ভঙ্গ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৃষ অবকাশমতে নাদা নিঃশেষ করিয়া হেলিতে দুলিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

আমি ভাবিলাম যে, এও পলিটিক্স্। দুই রকমের পলিটিক্স্ দেখিলাম—এক কুক্কুরজাতীয়, আর এক বৃষজাতীয়। বিস্মার্ক এবং গর্শাকফ এই বৃষের দলের পলিটিশ্যন—আর উল্‌সি হইতে আমাদের পরমাত্মীয় রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর পর্য্যন্ত অনেকে এই কুক্কুরের দলের পলিটিশ্যন।

তৃতীয় সংখ্যা

বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব

মহাশয়! আপনাকে পত্র লিখিব কি—লিখিবার অনেক অনেক শত্রু। আমি এখন যে কুঁড়ে ঘরে বাস করি, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার পাশে গোটা দুই তিন ফুলগাছ পুঁতিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম, কমলাকান্তের কেহ নাই—এই ফুলগুলি আমার সখা সখী হইবে। খোসামোদ করিয়া ইহাদের ফুটাইতে হইবে না—টাকা ছড়াইতে হইবে না, গহনা দিতে হইবে না, মনযোগান গোছ কথা বলিতে হইবে না, আপনার সুখে উহারা আপনি ফুটিবে। উহাদের হাসি আছে—কান্না নাই; আমোদ আছে—রাগ নাই। মনে করিলাম, যদি প্রসন্ন গোয়ালিনী আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, তবে এই ফুলের সঙ্গে প্রণয় করিব।

তা, ফুল ফুটিল—তারা হাসিল। মনে করিলাম—মহাশয় গো! কিছু মনে করিতে না করিতে, ফুটন্ত ফুল দেখিয়া ভোমরার দল,—লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে, ভোমরা বোল্‌তা মৌমাছি—বহুবিধ রসক্ষেপা রসিকের দল, আসিয়া আমার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তখন গুন্ গুন্ ভন্ ভন্ ঝন্ ঝন্ ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া হাড় জ্বালাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া বলিলাম যে, হে মহাশয়গণ! এ সভা নহে, সমাজ নহে, এসোসিয়েশ্যন, লীগ, সোসাইটি, ক্লাব প্রভৃতি কিছুই নহে কমলাকান্তের পর্ণকুটীর মাত্র, আপনাদিগের ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতে হয়, অন্যত্র গমন করুন—আমি কোন রিজলিউশ্যনই দ্বিতীয়িত করিতে প্রস্তুত নহি; আপনারা স্থানান্তরে প্রস্থান করুন। গুন গুনের দল, তাহাতে কোন মতে সম্মত নহে—বরং ফুলগাছ ছাড়িয়া আমার কুটীরের ভিতর হল্লা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই মাত্র আপনাকে এক পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছিলাম—(আফিঙ্গ ফুরাইয়াছে) —এমত সময়ে এক ভ্রমর কুচকুচে কালো আসল বৃন্দাবনী কালাচাঁদ, ভোঁ করিয়া ঘরের ভিতর উড়িয়া আসিয়া কানের কাছে ঘ্যান্ ঘ্যান্ আরম্ভ করিলেন—লিখিব কি, মহাশয়?

ভ্রমর বাবাজি নিশ্চিত মনে করেন, তিনি বড় সুরসিক—বড় সুবক্তা—তাঁহার ঘ্যান্ ঘ্যানানিতে আমার সর্ব্বাঙ্গ জুড়াইয়া যাইবে। আমার ফুলগাছের ফুলের পাপড়ি ছিঁড়িয়া আসিয়া আমারই কানের কাছে ঘ্যান্‌ঘ্যান্? আমার রাগ অসহ্য হইয়া উঠিল; আমি তালবৃন্ত হস্তে ভ্রমরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন আমি ঘূর্ণন,

বিঘূর্ণন, সংঘূর্ণন প্রভৃতি বহুবিধ বক্রগতিতে তালবৃন্তাস্ত্র সঞ্চালন করিতে লাগিলাম ; ভ্রমরও ডীন, উড্ডীন, প্রডীন, সমাডীন প্রভৃতি বহুবিধ কৌশল দেখাইতে লাগিল। আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী—দপ্তর-মুক্তাবলীর প্রণেতা, কিন্তু হায়, মনুষ্যবীর্য্য! তুমি অতি অসার! তুমি চিরদিন মনুষ্যকে প্রতারিত করিয়া শেষে আপন অসারতা প্রমাণীকৃত কর। তুমি জামার ক্ষেত্রে হানিবলকে, পলটোবার ক্ষেত্রে চার্লসকে, ওয়াটর্লুর ক্ষেত্রে নেপোলিয়নকে, এবং আজি এই ভ্রমরসমরে কমলাকান্তকে বঞ্চিত করিলে! আমি যত পাখা ঘুরাইয়া বায়ু সৃষ্টি করিয়া ভ্রমরকে উড়াইতে লাগলাম, ততই সে দুরাত্মা ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমার মাথামুণ্ড বেড়িয়া চোঁ বোঁ করিতে লাগিল। কখনও সে আমার বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত হইয়া, মেঘের আড়াল হইতে ইন্দ্রজিতের ন্যায় রণ করিতে লাগিল, কখনও কুম্ভকর্ণনিপাতী রামসৈন্যের ন্যায়, আমার বগলের নীচে দিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল ; কখনও স্যাম্পসনের ন্যায় শিরোরুহমধ্যে আমার বীর্য্য সংন্যস্ত মনে করিয়া আমার শরন্নীরদনিন্দিত কুঞ্চিত শ্বেতকৃষ্ণ কেশদামমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভেরী বাজাইতে লাগিল। তখন দংশনভয়ে অস্থির হইয়া রণে ভঙ্গ দিলাম। ভ্রমর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। সেই সময়ে চৌকাঠ পায়ে বাধিয়া কমলাকান্ত—"পপাত ধরণীতলে !!!" এই সংসারসমরে মহারথী শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী—যিনি দারিদ্র্য, চিরকৌমার এবং অহিফেন প্রভৃতির দ্বারাও কখনও পরাজিত হয়েন নাই—হায়! তিনি এই ক্ষুদ্র পতঙ্গ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন।

তখন ধূল্যবলুণ্ঠিত শরীরে দ্বিরেফরাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম,—"হে দ্বিরেফসত্তম! কোন্ অপরাধে দুঃখী ব্রাহ্মণ তোমার নিকট অপরাধী যে, তুমি তাহার লেখাপড়ার ব্যাঘাত করিতে আসিয়াছ? দেখ আমি এই বঙ্গদর্শনে পত্র লিখিতে বসিয়াছি—পত্র লিখিলে আফিঙ্গ আসিবে তুমি কেন ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া তাহার বিঘ্ন কর?" আমি প্রাতে একখানি বাঙ্গালা নাটক পড়িতেছিলাম তখন অকস্মাৎ সেই নাটকীয় রাগগ্রস্ত হইয়া বলিতে লাগিলাম—"হে ভৃঙ্গ! হে অনঙ্গরঙ্গতরঙ্গবিক্ষেপকারিন্! হে দুর্দ্দান্ত পাষণ্ডভণ্ডচিত্তলণ্ডভণ্ডকারিন্! হে উদ্যানবিহারিন্ কেন তুমি ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতেছ? হে ভৃঙ্গ! হে দ্বিরেফ! হে ষট্পদ! হে অলে! হে ভ্রমর! হে ভোমরা! হে ভোঁ ভোঁ!—"

ভ্রমর ঝুপ করিয়া আসিয়া সামনে বসিল। তখন গুন্ গুন্ করিয়া গলা দুরস্ত করিয়া বলিতে লাগিল—আমি অহিফেনপ্রসাদে সকলেরই কথা বুঝিতে পারি—আমি স্থিরচিত্তে শুনিতে লাগিলাম।

ভৃঙ্গরাজ বলিতে লাগিলেন, "হে বিপ্র! আমার উপর এত চোট কেন? আমি কি একাই ঘ্যান্-ঘেনে! তোমার এ বঙ্গভূমে জন্মগ্রহণ করিয়া ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিব না ত কি করিব? বাঙ্গালি হইয়া কে ঘ্যান্ ঘ্যানানি ছাড়া? কোন্ বাঙ্গালির ঘ্যান্ঘ্যানানি ছাড়া অন্য ব্যবসা আছে? তোমাদের মধ্যে যিনি রাজা মহারাজা কি এমনি একটা কিছু মাথায় পাগড়ি হইলেন, তিনি গিয়া বেল্ভিডিয়রে ঘ্যান্ ঘ্যান্ আরম্ভ করিলেন। যিনি হইবেন উমেদার, তিনি গিয়া রাত্রিদিবা রাজদ্বারে

ঘ্যান্ ঘ্যান্ করেন। যিনি কেবল একটি চাকরির উমেদওয়ার—তাঁর ঘ্যান্ ঘ্যানানির ত আর অন্ত নাই। বাঙ্গালি বাবু যিনিই দুই চারিটা ইংরেজী বোল শিখিয়াছেন. তিনি অমনি উমেদওয়াররূপে পরিণত হইয়া. দরখাস্ত বা টিকিট হাতে দ্বারে দ্বারে ঘ্যান্ ঘ্যান্ -ডাঁশমাছির মত খাবার সময়ে, শোবার সময়ে, বস্‌বার সময়ে, দাঁড়াবার সময়ে. দিনে. রাত্রে. প্রাহ্ণে, অপরাহ্ণে, মধ্যাহ্ণে. সায়াহ্ণে—ঘ্যান্ ঘ্যান্ ঘ্যান্। যিনি উমেদওয়ারি ছাড়িয়া স্বাধীন হইয়া উকীল হইবেন, তিনি আবার সনদী ঘ্যান্ ঘেনে। সত্যমিথ্যার সাগর-সঙ্গমে প্রাতঃস্নান করিয়া উঠিয়া, যেখানে দেখেন, কাঠগড়ার ভিতর বিড়ে মাথায় সরকারি জুজু বসিয়া আছে -বড় জজ, ছোট জজ. সবজজ, ডেপুটি, মুন্সেফ সেইখানে গিয়া সেই পেশাদার ঘ্যান্‌ঘেনে, ঘ্যান্ ঘ্যানানির ফোয়ারা খুলিয়া দেন। কেহ বা মনে করেন. ঘ্যান্‌ঘ্যানানির চোটে দেশোদ্ধার করিবেন -- সভাতলে ছেলে বুড়া জমা করিয়া ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতে থাকেন। কোন্ দেশে বৃষ্টি হয় নাই -- এসো বাপু ঘ্যান ঘ্যান করি; বড় চাকরি পাই না -- এসো বাপু. ঘ্যান্ ঘ্যান্ করি—রামকান্তের মা মরিয়াছে -এসো বাপু, স্বরণার্থ ঘ্যান্ ঘ্যান্ করি। কাহারও বা তাতেও মন উঠে না. তাঁরা কাগজ কলম লইয়া, হপ্তায় হপ্তায়, মাসে মাসে, দিন দিন ঘ্যান্ ঘ্যান্ করেন; আর তুমি যে বাপু, আমার ঘ্যান্ ঘ্যানানিতে এত বাগ করিতেছ. তুমি ও কি করিতে বসিয়াছ? বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের কাছে কিছু আফিঙ্গের যোগাড় করিবে বলিয়া ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতে বসিয়াছ। আমার চোঁ বোঁই কি এত কটু?

তোমায় সত্য বলিতেছি. কমলাকান্ত! তোমাদের জাতির ঘ্যান্‌ঘ্যানানি আর ভাল লাগে না। দেখ, আমি যে ক্ষুদ্র পতঙ্গ, আমিও শুধু ঘ্যান্ ঘ্যান্ করি না—মধু সংগ্রহ করি আর হুল ফুটাই। তোমরা না জান শুধু মধু সংগ্রহ করিতে. না জান হুল ফুটাইতে—কেবল ঘ্যান্ ঘ্যান্ পার। একটা কাজের সঙ্গে খোঁজ নাই—কেবল কাঁদুনে মেয়ের মত দিবারাত্রি ঘ্যান্ ঘ্যান্। একটু বকাবকি লেখালেখি কম করিয়া কিছু কাজে মন দাও—তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। মধু করিতে শেখ—হুল ফুটাইতে শেখ: তোমাদের রসনা অপেক্ষা আমাদের হুল শ্রেষ্ঠ—বাক্যবাণে মানুষ মরে না; আমাদের হুলের ভয়ে জীবলোক সদা সশঙ্কিত। স্বর্গে ইন্দ্রের বজ্র, মর্ত্ত্যে ইংরেজের কামান. আকাশমার্গে আমাদের হুল। সে যাক্, মধু কর; কাজে মন দাও। নিতান্ত যদি দেখ. রসনাকন্ডুয়ন রোগ জন্য কাজে মন যায় না -জিবে কাণ্টাক দিয়া ঘা কর—অগত্যা কাজে মন যাইতে পারে; আর শুধু ঘ্যান্ ঘ্যান্ ভাল লাগে না।” এই বলিয়া ভ্রমররাজ ভোঁ করিয়া উড়িয়া গেল।

আমি ভাবিলাম যে, এই ভ্রমর অবশ্য বিশেষ বিজ্ঞ পতঙ্গ। শুনা আছে মনুষ্যের পদবৃদ্ধি হইলেই সে বিজ্ঞ বলিয়া গণ্য হয়। এই জন্য দ্বিপদ মনুষ্য হইতে চতুষ্পদ পশু পক্ষান্তরে যে সকল মনুষ্যের পদবৃদ্ধি হইয়াছে—তাহারা অধিক বিজ্ঞ বলিয়া গণ্য। এই ষট্‌পদের—একখানি না, দুখানি না—ছয়খানি পা! অবশ্য এ ব্যক্তি বিশেষ বিজ্ঞ হইবে—ইহার অসামান্য পদবৃদ্ধি দেখা যায়। এই বিজ্ঞ পতঙ্গের পরামর্শ

অবহেলন করি কি প্রকারে? অতএব আপাততঃ ঘ্যান্‌ঘ্যানানি বন্ধ করিলাম—কিন্তু মধু সংগ্রহের আশাটা রহিল। বঙ্গদর্শন পুষ্প হইতে অহিফেন মধু সংগ্রহ হইবে, এই ভরসায় প্রাণ ধারণ করে—

আপনার আজ্ঞাবহ
শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

চতুর্থ সংখ্যা

বুড়ো বয়সের কথা

সম্পাদক মহাশয়! আফিঙ্গ পৌঁছে নাই, বড় কষ্ট গিয়াছে। আজ যাহা লিখিলাম, তাহা বিস্ফারিত লোচনে লেখা। নিজ বুদ্ধিতে, অহিফেন প্রাসাদাৎ নহে। একটা মনের দুঃখের কথা লিখিব।

বুড়া বয়সের কথা লিখিব; লিখি লিখি মনে করিতেছি, কিন্তু লিখিতে পারিতেছি না। হইতে পারে যে, এই নিদারুণ কথা আমার কাছে বড় প্রিয়,—আপনার মর্ম্মান্তিক দুঃখের পরিচয় আপনার কাছে বড় মিষ্ট লাগে, কিন্তু আমি লিখিলে পড়িবে কে! যে যুবা, কেবল সেই পড়ে; বুড়ায় কিছু পড়ে না। বোধ হয়, আমার এই বুড়া বয়সের কথার পাঠক জুটিবে না।

অতএব আমি ঠিক বুড়া বয়সের কথা লিখিব না। বলিতে পারি না; বৈতরণীর তরঙ্গাভিহত জীবনের সেই শেষ সোপানে আজিও পদার্পণ করি নাই; আজিও আমার পারের কড়ি সংগ্রহ করা হয় নাই। আমার মনে মনে বিশ্বাস যে, সে দিন আজিও আসে নাই। তবে যৌবনেও আমার আর দাবি দাওয়া নাই; মিয়াদি পাট্টার মিয়াদ ফুরাইয়াছে। এক দিকে মিয়াদ অতীত হইল, কিন্তু বাকি বকেয়া আদায় উসুল করা হয় নাই, তাহার জন্য কিছু পীড়াপীড়ি আছে; যৌবনের আখিরি করিয়া ফারখাতি লইতে পারি নাই। তাহার উপর মহাজনেরও কিছু ধারি; অনাবৃষ্টির দিনে অনেক ধার করিয়া খাইয়াছিলাম, শোধ দিতে পারি এমত সাধ্য নাই। তার উপর পার্টনির কড়ি সংগ্রহ করিবার সময় আসিল। আমার এমন দুঃখের সময়ের দুটো কথা বলিব, তোমরা যৌবনের সুখ ছাড়িয়া কি একবার শুনিবে না?

আগে আসল কথাটা মীমাংসা করা যাউক—আমি কি বুড়া? আমি আমার নিজের কথাই বলিতেছি এমত নহে, আমি বুড়া, না হয় যুবা, দুইয়ের এক স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যাঁহারই বয়সটা একটু দোটানা রকম—যাঁরই ছায়া পূর্ব্বদিকে হেলিয়াছে, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, মীমাংসা করুন দেখি, আপনি কি বুড়া। আপনার কেশগুলি, হয়ত আজিও অনিন্দ্য ভ্রমরকৃষ্ণ, হয়ত আজিও দন্তসকল অবিচ্ছিন্ন মুক্তামালার লজ্জাস্থল, হয় ত আপনার নিদ্রা অদ্যাপি এমন প্রগাঢ় যে, দ্বিতীয় পক্ষের ভার্য্যাও তাহা ভাঙ্গিতে পারে না;—তথাপি, হয় ত আপনি প্রাচীন। নয় ত,

আপনার কেশগুলি শাদা কালোয় গঙ্গা যমুনা হইয়া গিয়াছে, দশন মুক্তাপাতি ছিঁড়িয়া গিয়াছে, দুই একটি মুক্তা হারাইয়া গিয়াছে—নিদ্রা, চক্ষুর প্রতারণামাত্র, তথাপি আপনি যুবা। তুমি বলিবে, ইহার অর্থ, "বয়সেতে বিজ্ঞ নহে, বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে।" তাহা নহে—আমি বিজ্ঞতার কথা বলিতেছি না, প্রাচীনতার কথা বলিতেছি। প্রাচীনতা বয়সেরই ফল, আর কিছুরই নহে। ধাতুবিশেষে কিছু তারতম্য হয়, কেহ চল্লিশে বুড়া, কেহ বেয়াল্লিসে যুবা। কিন্তু তুমি কখন দেখিবে না যে, বয়সের অধিক তারতম্য ঘটে। যে পঁয়তাল্লিশে যুবা বলাইতে চায়, সে হয় যমভয়ে নিতান্ত ভীত, নয় তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছে; যে পঁয়ত্রিশে বুড়া বলাইতে চায়, সে হয় বড়াই ভালবাসে, নয় পীড়িত, নয় কোন বড় দুঃখে দুঃখী।

কিন্তু এই অর্দ্ধেক পথ অতিবাহিত করিয়া, প্রথম চস্‌মাখানি হাতে করিয়া রুমাল দিয়া মুছিতে মুছিতে ঠিক বলা যায় যে, আমি বুড়া হইয়াছি কি না! বুঝি বা হইয়াছি। বুঝি হই নাই। মনে মনে ভরসা আছে, একটু চক্ষুর দোষ হউক, দুই এক গাছা চুল পাকুক, আজিও প্রাচীন হই নাই। কই, কিছু ত প্রাচীন হয় নাই? এই চিরপ্রাচীন ভুবনমণ্ডল ত আজিও নবীন; আমার প্রিয় কোকিলের স্বর প্রাচীন হয় নাই; আমার সৌন্দর্য্য মাখা হীরা বসান, গঙ্গার ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গ ত প্রাচীন হয় নাই; প্রভাতের বায়ু, বকুলকামিনীর গন্ধ, বৃক্ষের শ্যামলতা, এবং নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা, কেহ ত প্রাচীন হয় নাই—তেমনই সুন্দর আছে। আমি কেবল প্রাচীন হইলাম? আমি এ কথায় বিশ্বাস করিব না। পৃথিবীতে উচ্চ হাসি ত আজিও আছে, কেবল আমার হাসির দিন গেল? পৃথিবীতে উৎসাহ, ক্রীড়া, রঙ্গ আজিও তেমনি অপর্য্যাপ্ত, কেবল আমারই পক্ষে নাই? জগৎ আলোকময়, কেবল আমারই রাত্রি আসিতেছে? সলমন কোম্পানির দোকানে বজ্রাঘাত হউক, আমি এ চস্‌মা ভাঙ্গিয়া ফেলিব, আমি বুড়া বয়স স্বীকার করিব না।

তবু আসে—ছাড়ান যায় না। ধীরে ধীরে দিনে দিনে পলে পলে বয়শ্চোর আসিয়া, এ দেহপুর প্রবেশ করিতেছে—আমি যাহা মনে ভাবি না কেন, আমি বুড়া, প্রতি নিঃশ্বাসে তাহা জানিতে পারিতেছে। অন্যে হাসে, আমি কেবল ঠোঁট হেলাইয়া তাহাদিগের মন রাখি। অন্যে কাঁদে, আমি কেবল লোকলজ্জায় মুখ ভার করিয়া থাকি—ভাবি, ইহারা এ বৃথা কালহরণ করিতেছে কেন? উৎসাহ আমার কাছে পণ্ডশ্রম—আশা আমার কাছে আত্মপ্রতারণা। কই, আমার ত আশা ভরসা কিছু নাই? কই—দূর হউক, যাহা নাই, তাহা আর খুঁজিয়া কাজ নাই।

খুঁজিয়া দেখিব কি? যে কুসুমদাম এ জীবনকানন আলো করিত, পথিপার্শ্বে একে একে তাহা খসিয়া পড়িয়াছে। যে মুখমণ্ডলসকল ভালবাসিতাম, একে একে অদৃশ্য হইয়াছে, না হয় রৌদ্রবিশুষ্ক বৈকালের ফুলের মত শুকাইয়া উঠিয়াছে। কই আর এ ভগ্নমন্দিরে, এ পরিত্যক্ত নাট্যশালায়, এ ভাঙ্গা মজলিসে সে উজ্জ্বল দীপাবলী কই? একে একে নিবিয়া যাইতেছে। কেবল মুখ নহে—হৃদয়। সে সরল, সে

ভালবাসাপরিপূর্ণ, সে বিশ্বাসে দৃঢ়, সৌহার্দ্দ্যে স্থির, অপরাধেও প্রসন্ন, সে বন্ধুহৃদয় কই? নাই। কার দোষে নাই? আমার দোষে নহে। বন্ধুরও দোষে নহে। বয়সের দোষে অথবা যমের দোষে।

তাতে ক্ষতি কি? একা আসিয়াছি, একা যাইব—তাহার ভাবনা কি? এ লোকালয়ের সঙ্গে আমার বনিয়া উঠিল না—আচ্ছা রোখশোধ। পৃথিবী! তুমি তোমার নিয়মিত পথে আবর্ত্তন করিতে থাক, আমি আমার অভীষ্ট স্থানে গমন করি—তোমায় আমায় সম্বন্ধ রহিত হইল—তাহাকে, হে মৃন্ময়ি জড়পিণ্ডগৌরব-পীড়িতে বসুন্ধরে! তোমারই বা ক্ষতি কি, আমারই বা ক্ষতি কি? তুমি অনন্ত কাল, শূন্য-পথে ঘুরিবে, আমি আর অল্প দিন ঘুরিব মাত্র! তার পরে তোমার কপালে ছাইগুলি দিয়া, যাঁর কাছে সকল জ্বালা জুড়ায় তাঁর কাছে গিয়া সকল জ্বালা জুড়াইব!

তবে স্থির হইল এক প্রকার যে, বুড়া বয়সে পড়িয়াছি! এখন কর্ত্তব্য কি? "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ?" এ কোন গণ্ডমূর্খের কথা। আবার বন কোথা? এ বয়সে, অট্টালিকাময়ী লোকপূর্ণা আপনিসমাকুলা নগরীই বন। কেন না, হে বর্ষীয়ান্ পাঠক! তোমার আমার সঙ্গে আর ইহার মধ্যে কাহারও সহৃদয়তা নাই। বিপদ্‌কালে কেহ কেহ আসিয়া বলিতে পারে যে, "বুড়া? তুমি অনেক দেখিয়াছ, এ বিপদে কি করিব বলিয়া দাও—" কিন্তু, সম্পদ্‌কালে কেহই বলিবে না, "বুড়া! আজি আমার আনন্দের দিন, তুমি আসিয়া আমাদিগের উৎসব বৃদ্ধি কর!" বরং আমোদ-আহ্লাদ কালে বলিবে, "দেখ ভাই, যেন বুড়া বেটা জানিতে না পারে।" তবে আর অরণ্যের বাকি কি?

যেখানে আগে ভালবাসার প্রত্যাশা করিতে, এখন সেখানে তুমি কেবল ভয় বা ভক্তির পাত্র। যে পুত্র তোমার যৌবনকালে, তাহার শৈশবকালে, তোমার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়াও, অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থাতেই, ক্ষুদ্র হস্ত প্রসারিত করিয়া, তোমার অনুসন্ধান করিত, সে এখন লোকমুখে সম্বাদ লয়, পিতা কেমন আছেন। পরের ছেলে, সুন্দর দেখিয়া যাহাকে কোলে তুলিয়া, তুমি আদর করিয়াছিলে, সে এখন কালক্রমে বয়ঃক্রম বয়ঃপ্রাপ্ত, কর্কশকান্তি, হয় ত মহাপাপিষ্ঠ, পৃথিবীর পাপস্রোত বাড়াইতেছে, হয় ত, তোমারই দ্বেষক—তুমি কেবল কাঁদিয়া বলিতে পার, "ইহাকে আমি কোলে পিঠে করিয়াছি।" তুমি যাহাকে কোলে বসাইয়া, ক, খ শিখাইয়াছিলে, সে হয় ত এখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত, তোমার মূর্খতা দেখিয়া মনে মনে উপহাস করে। যাহারই স্কুলের বেতন দিয়া তুমি মানুষ করিয়াছিলে, সে হয় ত এখন তোমাকে টাকা ধার দিয়া, তোমারই কাছে সুদ খায়। তুমি যাহাকে শিখাইতে, হয় ত সে তোমায় শিখাইতেছে। যে তোমার অগ্রাহ্য ছিল, তুমি আজি তার অগ্রাহ্য। আর অরণ্যের বাকি কি?

অন্তর্জগৎ ছাড়িয়া বহির্জগতেও এইরূপ দেখিবে। যেখানে তুমি স্বহস্তে পুষ্পোদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছিলে,—বাছিয়া বাছিয়া, গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, বিগোনিয়া, সাইপ্রেস, অরকেরিয়া আনিয়া পুঁতিয়াছিলে, পাত্রহস্তে স্বয়ং জলসিঞ্চন করিয়াছিলে,

সেখানে দেখিবে, ছোলা মটরের চাষ,—হারাধন পোদ গামছা কাঁধে মোটা মোটা বলদ লইয়া নির্ব্বিঘ্নে লাঙ্গল দিতেছে সে লাঙ্গলের ফাল তোমার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। যে অট্টালিকা তুমি যৌবনে, অনেক সাধ মনে মনে রাখিয়া, অনেক সাধ পুরাইয়া, যত্নে নির্ম্মাণ করিয়াছিলে, যাহাতে পালঙ্ক পাড়িয়া নয়নে নয়নে অধরে অধরে মিলাইয়া ইহ-জীবনের অনশ্বর প্রণয়ের প্রথম পবিত্র সম্ভাষণ করিয়াছিলে, হয় ত দেখিবে, সে গৃহের ইষ্টক সকল দামু ঘোষের আস্তাবলের সুরকির জন্য চূর্ণ হইতেছে; সে পালঙ্কের ভগ্নাংশ লইয়া কৈলাসীর মা পাচিকা ভাতের হাঁড়িতে জ্বাল দিতেছে—আর অরণ্যের বাকি কি? সকল জ্বালার উপর জ্বালা, আমি সেই যৌবনে যাহাকে সুন্দর দেখিয়াছিলাম—এখন সে কুৎসিত। আমার প্রিয় বন্ধু দাসু মিত্র, যৌবনের রূপে স্ফীতকণ্ঠ কপোতের ন্যায় সগর্ব্বে বেড়াইত—কত মাগী গঙ্গার ঘাটে, স্নানকালে তাহাকে দেখিয়া নমঃ শিবায় নমঃ বলিয়া ফুল দিতে, "দাসু মিত্রায় নমঃ" বলিয়া ফুল দিয়াছে। এখন সেই দাসু মিত্র শুষ্ককণ্ঠ, পলিতকেশ, দন্তহীন, লোলচর্ম্ম, শীর্ণকায়। দাসুর একটা ব্রাণ্ডি আর তিনটা মুরগী জলপানের মধ্যে ছিল,—এখন দাসু নামাবলীর ভরে কাতর, পাতে মাছের ঝোল দিলে, পাত মুছিয়া ফেলে। আর অরণ্যের বাকি কি?

গদার মাকে দেখ। যখন আমার সেই পুষ্পোদ্যানে, তরঙ্গিণী নামে যুবতী ফুল চুরি করিতে যাইত, মনে হইত, নন্দনকানন হইতে সচল সপুষ্প পারিজাত বৃক্ষ আনিয়া কে ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহার অলকদাম লইয়া উদ্যান-বায়ু ক্রীড়া করিত, তাহার অঞ্চলে কাঁটা বিঁধিয়া দিয়া গোলাপ গাছ রসকেলি করিত। আর আজি গদার মাকে দেখ। বকাবকি করিতে করিতে চাল ঝাড়িতেছে—মলিনবসনা, বিকটদর্শনা, তীব্ররসনা—দীর্ঘাঙ্গী, কৃষ্ণাঙ্গী, কৃশাঙ্গী, লোলচর্ম্ম, পলিতকেশ, শুষ্ক-বাহু, কর্কশকণ্ঠ। এই সেই তরঙ্গিণী—আর অরণ্যের বাকি কি?

তবে স্থির, বনে যাওয়া হবে না। তবে কি করিব? হিন্দুশাস্ত্রের বশবর্ত্তী হইয়া কালিদাসও সর্ব্বগুণবান্ রঘুগণের বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি—কালিদাস চল্লিশ পার হইয়া রঘুবংশ লিখেন নাই। তিনি যে রঘুবংশ যৌবনে লিখিয়াছিলেন, এবং কুমারসম্ভব চল্লিশ পার করিয়া লিখিয়াছিলেন, তাহা আমি দুইটি কবিতা উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি—

প্রথম অজবিলাপে,

"ইদমুচ্ছ্বসিতালকং মুখং
তব বিশ্রান্তকথং দুনোতি মাম্।
নিশি সুপ্তমিবৈকপঙ্কজং
বিরতাভ্যন্তরষট্পদস্বনম্ ॥"*

* বায়ুবশে অলকাগুলিন চালিত হইতেছে—অথচ বাক্যহীন তোমার এই মুখ রাত্রিকালে প্রমুদিত, সুতরাং অভ্যন্তরে ভ্রমর-গুঞ্জন-রহিত একটি পদ্মের ন্যায় আমাকে ব্যথিত করিতেছে।

এটি যৌবনের কান্না।

তার পর রতিবিলাপে,

"গত এব ন তে নিবর্ত্ততে স সখা দীপ ইবানিলাহতঃ।
অহমস্য দশেব পশ্য মামবিসহ্যব্যসনেন ধূমিতাম্ ॥"*

এটা বুড়ো বয়সের কান্না।—

তা যাই হউক, কালিদাস বুড়া বয়সের গৌরব বুঝিলেও কখনও বৃদ্ধের কপালে মুনিবৃত্তি লিখিতেন না। বিস্মার্ক, মোল্ট্কে ও ফ্রেডারিক বুড়া; তাঁহারা মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে—জর্ম্মান ঐকজাত্য কোথা থাকিত? টিয়র প্রাচীন—টিয়র মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে ফ্রান্সের স্বাধীনতা এবং সাধারণতন্ত্রাবলম্বন কোথা থাকিত? গ্লাডষ্টোন এবং ডিস্রেলি বুড়া—তাঁহারা মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে পার্লিমেণ্টের রিফর্ম্ম এবং আয়রিশ্ চর্চ্চের ডিসেষ্টাব্লিষমেণ্ট কোথা থাকিত?

প্রাচীন বয়সই বিষয়েষার সময়। আমি অন্ত্র-দন্তহীন ত্রিকালের বুড়ার কথা বলিতেছি না।—তাঁহারা দ্বিতীয় শৈশবে উপস্থিত। যাঁহারা আর যুবা নই বলিয়াই বুড়া, আমি তাহাদিগের কথা বলিতেছি। যৌবন কর্ম্মের সময় বটে, কিন্তু তখন কাজ ভাল হয় না। একে বুদ্ধি অপরিপক্ক, তাহাতে আবার রাগ দ্বেষ ভোগাসক্তি, এবং স্ত্রীগণের অনুসন্ধানে তাহা সতত হীনপ্রভ; এজন্য মনুষ্য যৌবনে সচরাচর কার্য্যক্ষম হয় না। যৌবন অতীতে মনুষ্য বহুদর্শী, স্থিরবুদ্ধি লব্ধপ্রতিষ্ঠ, এবং ভোগাসক্তির অনধীন, এজন্য সেই কার্যকারিতার সময়। সেই জন্য, আমার পরামর্শ যে, বুড়া হইয়াছি বলিয়া, কেহ স্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মুনিবৃত্তির ভান করিবে না। বার্দ্ধক্যেও বিষয় চিন্তা করিবে।

তোমরা বলিবে, একথা বলিতে হইবে না; কেহই জীবন থাকিতে ও শক্তি থাকিতে বিষয়চেষ্টা পরিত্যাগ করে না। মাতৃস্তনপান অবধি উইল করা পর্য্যন্ত আবালবৃদ্ধ কেবল বিষয়ানেষণে বিব্রত। সত্য, কিন্তু আমি সেরূপ বিষয়ানুসন্ধানে বৃদ্ধকে নিযুক্ত করিতে চাহিতেছি না। যৌবনে যে কাজ করিয়াছ, সে আপনার জন্য; তারপর যৌবন গেলে যত কাজ করিবে, পরের জন্য। ইহাই আমার পরামর্শ। ভাবিও না যে, আজিও আপনার কাজ করিয়া উঠিতে পারিলাম না—পরের কাজ করিব কি? আপনার কাজ ফুরায় না—যদি মনুষ্যজীবন লক্ষ বর্ষ পরিমিত হইত তবু আপনার কাজ ফুরাইত না—মনুষ্যের স্বার্থপরতার সীমা নাই—অন্ত নাই। তাই বলি, বার্দ্ধক্যে আপনার কাজ ফুরাইয়াছে, বিবেচনা করিয়া পরহিতে রত হও। এই মুনিবৃত্তি যথার্থ মুনিবৃত্তি। এই মুনিবৃত্তি অবলম্বন কর।

যদি বল, বার্দ্ধক্যেও যদি আপনার জন্য হউক, পরের জন্য হউক, বিষয় কার্য্যে নিরত থাকিব, তবে ঈশ্বরচিন্তা করিব কবে? পরকালের কাজ করিব কবে? আমি

* তোমার সেই সখা বায়ুতাড়িত দীপের ন্যায় পরলোক গমন করিয়াছেন, আর ফিরিবেন না। আমি নির্ব্বাপিত দীপের দশাবৎ অসহ্য দুঃখে ধূমিত হইতেছি দেখ।

বলি, আশৈশব পরকালের কাজ করিবে, শৈশব হইতে জগদীশ্বরকে হৃদয়ে প্রধান স্থান দিবে। যে কাজ সকল কাজের উপর কাজ, তাহা প্রাচীন কালের জন্য তুলিয়া রাখিবে কেন? শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে, সকল সময়েই ঈশ্বরকে ডাকিবে। ইহার জন্য বিশেষ অবসরের প্রয়োজন নাই—ইহার জন্য অন্য কোন কার্য্যের ক্ষতি নাই। বরং দেখিবে, ঈশ্বরভক্তির সঙ্গে মিলিত হইলে সকল কার্য্যই মঙ্গলপ্রদ, যশস্কর এবং পরিশুদ্ধ হয়।

আমি বুঝিতে পারিতেছি, অনেকের এ সকল কথা ভালো লাগিতেছে না। তাঁহারা এতক্ষণে বলিতেছেন, তরঙ্গিণী যুবতীর কথা হইতেছিল—হইতে হইতে আবার ঈশ্বরের নাম কেন? এই মাত্র বুড়া বয়সের ঢেঁকি পাতিয়া, বঙ্গদর্শনের জন্য ধান ভানিতেছিল—আবার এ শিবের গীত কেন? দোষ হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু মনে মনে বোধ হয় যে, সকল কাজেই একটু একটু শিবের গীত ভাল।

ভাল হউক বা না হউক, প্রাচীনের অন্য উপায় নাই। তোমার তরঙ্গিনী হেমাঙ্গিণী সুরঙ্গিণী কুরঙ্গিণীর দল আর আমার দিকে ঘেঁষিবে না। তোমার মিল, কোমত, স্পেন্সর, ফুয়রবাক মনোরঞ্জন করিতে পারে না। তোমার দর্শন, বিজ্ঞান, সকলই অসার—সকলই অন্ধের মৃগয়া। আজিকার বর্ষার দুর্দ্দিনে—আজি এ কালরাত্রির শেষ কুলগ্নে,—এ নক্ষত্রহীন অমাবস্যার নিশির মেঘাগমে,—আমায় আর কে রাখিবে? এ ভবনদীর তপ্ত সৈকতে, প্রখরবাহিনী বৈতরণীর আবর্ত্তভীষণ উপকূলে—এ দুস্তর পারাবারের প্রথম তরঙ্গমালার প্রঘাতে, আর আমায় কে রক্ষা করিবে? অতি বেগে প্রবল বাতাস বহিতেছে—অন্ধকার, প্রভো! চারি দিকেই অন্ধকার! আমার এ ক্ষুদ্র ভেলা দুষ্কৃতের ভরে বড় ভারি হইয়াছে। আমায় কে রক্ষা করিবে?

পঞ্চম সংখ্যা

কমলাকান্তের বিদায়

সম্পাদক মহাশয়!

বিদায় হইলাম, আর লিখিব না। বনিল না। আপনার সঙ্গে বনিল না, পাঠকের সঙ্গে বনিল না, এ সংসারের সঙ্গে আমার বনিল না। আমার আপনার সঙ্গে আর আমার বনিল না। আর কি লেখা হয়? বেসুরে কি এ বাঁশী বাজে? বাঁশী বাজি বাজি করে, তবু বাজে না—বাঁশী ফাটিয়াছে। আবার বাজ দেখি, হৃদয়ের বংশী! হায়! তুই কি আর তেমনি করিয়া বাজিতে জানিস? আর কি সে তান মনে আছে? না, তুই সেই আছিস—না আমি সেই আমি আছি। তুই ঘুণে ধরা বাঁশী—আমি ঘুণে ধরা—আমি ঘুণে ধরা কি কি ছাই তা আমি জানি না। আমার সে স্বর নাই—আর বাজাইব কি? আর সে রস নাই, শুনিবে কে? একবার বাজ দেখি হৃদয়! এই জগৎ সংসারে—বধির, অর্থচিন্তায় বিব্রত, মূঢ় জগৎ সংসারে,

সেইরূপ আবার মনের লুকান কথাগুলি তেমনি করিয়া বল্ দেখি? বলিলে কেহ শুনিবে কি? তখন বয়স ছিল—কত কাল হইল সে দপ্তর লিখিয়াছিলাম এখন সে বয়স, সে রস নাই—এখন সে রস ছাড়া কথা কেহ শুনিবে কি? আর সে বসন্ত নাই—এখন গলা-ভাঙ্গা কোকিলের কুহূরব কেহ শুনিবে কি?

ভাই, আর কথায় কাজ নাই—আর বাজিয়া কাজ নাই—ভাঙ্গা বাঁশে মোটা আওয়াজে আর কুক্কুর-রাগিনী ভাঁজিয়া কাজ নাই। এখন হাসিলে কেহ হাসিবে না—কাঁদিলে বরং লোকে হাসিবে। প্রথম বয়সের হাসিকান্নায় সুখ আছে—লোকে সঙ্গে সঙ্গে হাসে কাঁদে;—এখন হাসিকান্না। ছি!—কেবল লোক হাসান!

হে সম্পাদককুলশ্রেষ্ঠ! আপনাকে স্বরূপ বলিতেছি—কমলাকান্তের আর সে রস নাই। আমার সে নসীবাবু নাই—অহিফেনের অনটন—সে প্রসন্ন কোথায় জানি না—তাহার সে মঙ্গলা গাভী কোথায় জানি না। সত্য বটে, আমি তখনও একা—এখনও একা—কিন্তু তখন আমি একায় এক সহস্র—এখন আমি একায় আধখানা। কিন্তু একার এত বন্ধন কেন? যে পাখীটি পুষিয়াছিলাম—কবে মরিয়া গিয়াছে—তাহার জন্য আজিও কাঁদি; যে ফুলটি ফুটাইয়াছিলাম—কবে শুকাইয়াছে, তাহার জন্য আজিও কাঁদি; যে জলবিম্ব, একবার জলস্রোতে সূর্য্যরশ্মি সম্প্রভাত দেখিয়াছিলাম—তাহার জন্য আজিও কাঁদি। কমলাকান্ত অন্তরের অন্তরে সন্ন্যাসী—তাহার এত বন্ধন কেন? এ দেহ পচিয়া উঠিল—ছাই-ভস্ম মনের বাঁধনগুলো পচে না কেন? ঘর পুড়িয়া গেল—আগুন নিভে না কেন? পুকুর শুকাইয়া আসিল—এ পঙ্কে পঙ্কজ ফুটে কেন? ঝড় থামিয়াছে—দরিয়ায় তুফান কেন? ফুল শুকাইয়াছে—এখনও গন্ধ কেন? সুখ গিয়াছে—আশা কেন? স্মৃতি কেন? জীবন্ কেন? ভালবাসা গিয়াছে—যত্ন কেন? প্রাণ গিয়াছে—পিণ্ডদান কেন? কমলাকান্ত গিয়াছে—যে কমলাকান্ত চাঁদ বিবাহ করিত, কোকিলের সঙ্গে গায়িত, ফুলের বিবাহ দিত, এখন আবার তার আফিঙ্গের বরাদ্দ কেন? বাঁশী ফাটিয়াছে—আবার সা, ঋ, গ, ম কেন? প্রাণ গিয়াছে ভাই, আর নিঃশ্বাস কেন? সুখ গিয়াছে, ভাই, আর কান্না কেন?

তবু কাঁদি; জন্মিবামাত্র কাঁদিয়াছিলাম, কাঁদিয়া মরিব। এখন কাঁদিব, লিখিব না।

অনুগত, স্বগত এবং বিগত
শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

কমলাকান্তের পত্র

খোশনবীস জুনিয়র প্রণীত

সেই আফিঙ্গখোর কমলাকান্তের অনেকদিন কোন সম্বাদ পাই নাই। অনেক সন্ধান করিয়াছিলাম, অকস্মাৎ সম্প্রতি একদিন তাহাকে ফৌজদারী আদালতে দেখিলাম। দেখি যে, ব্রাহ্মণ এক গাছতলায় বসিয়া, গাছের গুঁড়ি ঠেসান দিয়া, চক্ষু বুজিয়া ডাবায় তামাকু টানিতেছে। মনে করিলাম, আর কিছু, না ব্রাহ্মণ লোভে পড়িয়া কাহার ডিবিয়া হইতে আফিঙ্গ চুরি করিয়াছে—অন্য সামগ্রী কমলাকান্ত চুরি করিবে না —ইহা নিশ্চিত জানি। নিকটে একজন কালোকোর্ত্তা কনষ্টেবলও দেখিলাম। আমি বড় দাঁড়াইলাম না—কি জানি যদি কমলাকান্ত জামিন হইতে বলে। তফাতে থাকিয়া দেখিতে লাগিলাম যে, কাণ্ডটা কি হয়।

কিছুকাল পরে কমলাকান্তের ডাক হইল। তখন একজন কনষ্টেবল রুল ঘুরাইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া এজ্‌লাসে লইয়া গেল। আমি পিছু পিছু গেলাম। দাঁড়াইয়া দুই একটি কথা শুনিয়া, ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিলাম।

এজ্‌লাসে, প্রথামত মাচানের উপর হাকিম বিরাজ করিতেছেন। হাকিমটি একজন দেশী ধর্ম্মাবতার—পদে ও গৌরবে ডিপুটি। কমলাকান্ত আসামী নহে—সাক্ষী। মোকদ্দমা গরুচুরি। ফরিয়াদী সেই প্রসন্ন গোয়ালিনী।

কমলাকান্তকে সাক্ষীর কাটারায় পুরিয়া দিল। তখন কমলাকান্ত মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। চাপরাশি ধমকাইলেন—"হাস কেন?"

কমলাকান্ত যোড়হাত করিয়া বলিল, "বাবা, কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি—যে, আমাকে এর ভিতর পুরিলে?"

চাপরাশী মহাশয় কথাটা বুঝিলেন না। দাড়ি ঘুরাইয়া বলিলেন, "তামাসার জায়গা এ নয়—হলফ পড়।"

কমলাকান্ত বলিল, "পড়াও না বাপু।"

একজন মহুরী তখন হলফ পড়াইতে আরম্ভ করিল। বলিল, "বল, আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া…"

কমলাকান্ত। (সবিস্ময়ে) কি বলিব?

মুহুরী। শুন্‌তে পাওনা—"পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে—"

কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে! কি সর্ব্বনাশ।

হাকিম দেখিলেন, সাক্ষীটা কি একটা গণ্ডগোল বাধাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "সর্ব্বনাশ কি?"

কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনেছি—এ কথাটা বল্‌তে হবে?

হাকিম। ক্ষতি কি? হলফের ফারমই এই।

কমলা। হুজুর সুবিচারক বটে। কিন্তু একটা কথা বলি কি, সাক্ষ্য দিতে দিতে দুই একটা ছোট রকম মিথ্যা বলি, না হয় বলিলাম—কিন্তু গোড়াতেই একটা বড় মিথ্যা বলিয়া আরম্ভ করিব, সেটা কি ভাল?

হাকিম। এর আর মিথ্যা কথা কি?

কমলাকান্ত মনে মনে বলিল, "এত বুদ্ধি থাকিলে তোমার কি এ পদবৃদ্ধি হইত ?" প্রকাশ্যে বলিল, "ধর্ম্মাবতার, আমার একটু একটু বোধ হইতেছে কি যে, পরমেশ্বর ঠিক, প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। আমার চোখের দোষই হউক আর যাই হউক, কখনও ত এ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম না। আপনারা বোধ হয় আইনের চসমা নাকে দিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পারেন— কিন্তু আমি যখন তাঁহাকে এ ঘরের ভিতর প্রত্যক্ষ পাইতেছি না— তখন কেমন করিয়া বলি—আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে—"

ফরিয়াদীর উকীল চটিলেন— তাঁহার মূল্যবান্ সময়, যাহা মিনিটে মিনিটে টাকা প্রসব করে, তাহা এই দরিদ্র সাক্ষী নষ্ট করিতেছে। উকীল তখন গরম হইয়া বলিলেন, "সাক্ষী মহাশয়! Theological Lectureটা ব্রাহ্মসমাজের জন্য রাখিলে ভাল হয় না ? এখানে আইনের মতে চলিতে মন স্থির করুন।"

কমলাকান্ত তাঁহার দিকে ফিরিল। মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনি বোধ হইতেছে উকীল।"

উকীল। (হাসিয়া) কিসে চিনিলে ?

কমলা। বড় সহজে। মোটা চেন আর ময়লা শামলা দেখিয়া। তা, মহাশয়। আপনাদের জন্য Theological Lecture নয়। আপনারা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখেন স্বীকার করি— যখন মোয়াক্কেল আসে।

উকীল সরোষে উঠিয়া হাকিমকে বলিলেন, "I ask the protection of the Court against the insults of the witness."

কোর্ট বলিলেন, "Oh, Baboo! the witness is your own witness, and you are at liberty to send him away if you like."

এখন কমলাকান্তকে বিদায় দিলে উকীলবাবুর মোকদ্দমা প্রমাণ হয় না— সুতরাং উকীলবাবু চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। কমলাকান্ত ভাবিলেন, এ হাকিমটি জাতি-ভ্রষ্ট— পালের মত নয়।

হাকিম গতিক দেখিয়া, মুহুরিকে আদেশ করিলেন যে, "ওথের প্রতি সাক্ষীর objection আছে— উহাকে simple affirmation দাও।" তখন মুহুরি কমলাকান্তকে বলিল, "আচ্ছা, ও ছেড়ে দাও—বল, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি—বল।"

কমলা। কি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সেটা জানিয়া প্রতিজ্ঞাটা করিলে ভাল হয় না ?

মুহুরি হাকিমের দিকে চাহিয়া বলিল, "ধর্ম্মাবতার। সাক্ষী বড় সেরকশ।"

উকীলবাবু হাঁকিলেন, "Very Obstructive."

কমলাকান্ত। (উকীলের প্রতি) শাদা কাগজে দস্তখত করিয়া লওয়ার কথাটা আদালতের বাহিরে চলে জানি— ভিতরেও চলিবে কি?

উকীল। শাদা কাগজে কে তোমার দস্তখত লইতেছে ?

কমলা। কি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, তাহা না জানিয়া, প্রতিজ্ঞা করা. আর কাগজে কি লেখা হয় তাহা না দেখিয়া দস্তখত করা. একই কথা।

হাকিম তখন মুহুরিকে আদেশ করিলেন যে, "প্রতিজ্ঞা আগে ইহাকে শুনাইয়া দাও —গোলমালে কাজ নাই।" মুহুরি তখন বলিলেন, "শোন, তোমাকে বলিতে হইবে যে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি যে সাক্ষ্য দিব, তাহা সত্য হইবে, আমি কোন কথা গোপন করিব না—সত্য ভিন্ন আর কিছু হইবে না।"

কমলা। ওঁ মধু মধু মধু।

মুহুরি। সে আবার কি ?

কমলা। পড়ান, আমি পড়িতেছি।

কমলাকান্ত তখন আর গোলযোগ না করিয়া প্রতিজ্ঞা পাঠ করিল। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য উকীলবাবু গাত্রোত্থান করিলেন. কমলাকান্তকে চোখ রাঙ্গাইয়া বলিলেন, "এখন আর বদ্মায়েশি করিও না—আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তার যথার্থ উত্তর দাও। বাজে কথা ছাড়িয়া দাও।"

কমলা। আপনি যা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাই আমাকে বলিতে হইবে ? আর কিছু বলিতে পাইব না ?

উকীল। না।

কমলাকান্ত তখন হাকিমের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "অথচ আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, 'কোন কথা গোপন করিব না।" ধর্ম্মাবতার, বে-আদবি মাফ হয়। পাড়ায় আজ একটা যাত্রা হইবে, শুনিতে যাইব ইচ্ছা ছিল ; সে সাধ এইখানেই মিটিল। উকীলবাবু অধিকারী—আমি যাত্রার ছেলে, যা বলাইবেন, কেবল তাই বলিব ; যা না বলাইবেন, তা বলিব না। যা না বলাইবেন. তা কাজেই গোপন থাকিবে। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপরাধ লইবেন না।"

হাকিম। যাহা আবশ্যক বিবেচনা করিবে, তাহা না জিজ্ঞাসা হইলেও বলিতে পার।

কমলাকান্ত তখন সেলাম করিয়া বলিল, "বহুৎ খুব।" উকীল তখন জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন, "তোমার নাম কি ?"

কমলা। শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

উকীল। তোমার বাপের নাম কি ?

কমলা। জোবানবন্দীর আভ্যুদয়িক আছে না কি ?

উকীল গরম হইলেন, বলিলেন, 'হুজুর ! এসব Contempt of Court". হুজুর, উকীলের দুর্দ্দশা দেখিয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট নন—বলিলেন, "আপনারই সাক্ষী।" সুতরাং উকীল আবার কমলাকান্তের দিকে ফিরিলেন, বলিলেন, "বল, বলিতে হইবে।"

কমলাকান্ত পিতার নাম বলিল। উকীল তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি জাতি।"

কমলা। আমি কি একটা জাতি ?

উকীল। তুমি কোন্ জাতীয় ?

কমলা। হিন্দু জাতীয়।

উকীল। আঃ। কোন্ বর্ণ ?

কমলা। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ।

উকীল। দূর হোক্ ছাই ! এমন সাক্ষীও আনে ! বলি তোমার জাত আছে ?

কমলা। মারে কে ?

হাকিম দেখিলেন, উকীলের কথায় হইবে না। বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, হিন্দুর নানা প্রকার জাতি আছে জান ত—তুমি তার কোন্ জাতির ভিতর ?"

কমলা। ধর্ম্মাবতার ! এই উকীলেরই ধৃষ্টতা ! দেখিতেছেন আমার গলায় যজ্ঞোপবীত, নাম বলিয়াছি চক্রবর্ত্তী—ইহাতেও যে উকীল বুঝেন নাই যে, আমি ব্রাহ্মণ, ইহা আমি কি প্রকারে জানিব ?

হাকিম লিখিলেন, "জাতি ব্রাহ্মণ।" তখন উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বয়স কত ?"

এজ্লাসে একটা ক্লক ছিল—তাহার পানে চাহিয়া হিসাব করিয়া কমলাকান্ত বলিল, "আমার বয়স ৫১ বৎসর, দুই মাস, তের দিন, চারি ঘণ্টা, পাঁচ মিনিট —"

উকীল। কি জ্বালা ! তোমার ঘণ্টা মিনিট কে চায় ?

কমলা। কেন, এই মাত্র প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন যে, কোন কথা গোপন করিব না।

উকীল। তোমার যা ইচ্ছা কর ! আমি তোমায় পারি না। তোমার নিবাস কোথা ?

কমলা। আমার নিবাস নাই।

উকীল। বলি, বাড়ী কোথা ?

কমলা। বাড়ী দূরে থাক্, আমার একটা কুঠারীও নাই।

উকীল। তবে থাক কোথা ?

কমলা। যেখানে সেখানে।

উকীল। একটা আড্ডা ত আছে ?

কমলা। ছিল যখন নসীবাবু ছিলেন। এখন আর নাই।

উকীল। এখন আছ কোথা ?

কমলা। কেন, এই আদালতে ?

উকীল। কাল ছিলে কোথা ?

কমলা। একখানা দোকানে।

হাকিম বলিলেন, "আর বকাবকিতে কাজ নাই—আমি লিখিয়া লইতেছি, নিবাস নাই। তার পর ?"

উকীল। তোমার পেশা কি ?

কমলা। আমার আবার পেশা কি? আমি কি উকীল না বেশ্যা যে, আমার পেশা আছে?

উকীল। বলি খাও কি করিয়া?

কমলা। ভাতের সঙ্গে ডাল মাখিয়া, দক্ষিণ হস্তে গ্রাস তুলিয়া, মুখে পুরিয়া গলাধঃকরণ করি।

উকীল। সে ডালভাত জোটে কোথা থেকে?

কমলা। ভগবান্ জোটালেই জোটে নইলে জোটে না।

উকীল। কিছু উপার্জ্জন কর?

কমলা। এক পয়সাও না।

উকীল। তবে কি চুরি কর?

কমলা। তাহা হইলে ইতিপূর্ব্বেই আপনার শরণাগত হইতে হইত। আপনি কিছু ভাগও পাইতেন।

উকীল তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া, আদালতকে বলিলেন, "আমি এ সাক্ষী চাহি না। আমি ইহার কোন জোবানবন্দী করাইতে পারিব না।"

প্রসন্ন বাদিনী, উকীলের কোমর ধরিল; বলিল, "এ সাক্ষী ছাড়া হইবে না। এ বামন সত্য কথা বলিবে, তাহা আমি জানি—কখনও মিছা বলে না। উহাকে তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে জান না—তাই ও অমন করিতেছে। ও বামনের আবার পেশা কি? ও এর বাড়ী ওর বাড়ী খেয়ে বেড়ায়, ওকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, উপার্জ্জন কর! ও কি বল্‌বে?"

উকীল তখন হাকিমকে বলিল, "লিখুন, পেশা ভিক্ষা।"

এবার কমলাকান্ত রাগিল, "কি? কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী ভিক্ষোপজীবী? আমি মুক্তকণ্ঠে হলফের উপর বলিতেছি, আমি কখনও কাহারও কাছে এক পয়সা ভিক্ষা চাই না।

প্রসন্ন আর থাকিতে পারিল না—সে বলিল, "সে কি ঠাকুর! কখন আফিঙ্গ চেয়ে খাও নাই?"

কমলা। দূর মাগি ধেমো গোয়ালের মেয়ে। আফিঙ্গ কি পয়সা! আমি কখন একটি পয়সাও কাহারও কাছে ভিক্ষা লই নাই।

হাকিম হাসিয়া বলিলেন, "কি লিখব, কমলাকান্ত?"

কমলাকান্ত নরম হইয়া বলিল, "লিখুন পেশা ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ।" সকলে হাসিল—হাকিম তাই লিখিয়া লইলেন।

তখন উকীল মহাশয় মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ফরিয়াদীকে চেন?"

কমলা। না।

প্রসন্ন হাঁকিল, "সে কি, ঠাকুর! চিরটা কাল আমার দুধ দই খেলে, আজ বল চিনি না?"

কমলাকান্ত বলিল, "তোমার দুধ দই চিনি না, এমন কথা ত বলিতেছি না—তোমার দুধে দই বিলক্ষণ চিনি। যখনই দেখি এক পোয়া দুধে তিন পোয়া জল, তখনই চিনতে পারি যে, এ প্রসন্ন গোয়ালীর দুধ; যখনই দেখতে পাই যে, ঘোলের চেয়ে দই ফিকে, তখনই চিনতে পারি যে, এ প্রসন্নময়ীর দধি। দুধ দই চিনি নে?"

প্রসন্ন নথ ঘুরিয়া বলিল, "আমার দুধ দই চেন, আর আমায় চিনতে পার না?"

কমলাকান্ত বলিল, "মেয়েমানুষকে কে কবে চিনিতে পেরেছে, দিদি? বিশেষ, গোয়ালার মেয়ের কাঁকালে যদি দুধের কেঁড়ে থাকিল, তবে কার বাপের সাধ্য তাকে চিনে উঠে?"

উকীল তখন আবার সওয়াল করিতে লাগিলেন, "বুঝা গেল; তুমি বাদিনীকে চেন – উহার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ আছে?"

কমলা। মন্দ নয়—এত গুণ না থাকিলে কি উকীল হয়!

উকীল। তুমি আমার কি গুণ দেখিলে?

কমলা। বামনের ছেলে গোয়ালার মেয়েতেও আপনি একটা সম্বন্ধ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

উকীল। এমন সম্বন্ধ কি হয় না? কে জানে তুমি ওর পোষ্যপুত্র কি না?

কমলা। ওর নয়, কিন্তু ওর গাইয়ের বটে।

উকীল। বুঝা গেল, তোমার সঙ্গে বাদিনীর একটা সম্বন্ধ আছে, একেবারে সাফ বলিলেই হইত– এত দুঃখ দাও কেন? এখন জিজ্ঞাসা করি, তুমি এ মোকদ্দমার কি জান?

কমলা। জানি যে, এ মোকদ্দমায় আপনি উকীল, প্রসন্ন ফরিয়াদী, আমি সাক্ষী আর এই নেড়ে আসামী।

উকীল। তা নয় গোরুচুরির কি জান?

কমলা। গোরুচুরি আমার বাপ দাদাও জানে না। বিদ্যাটা আমায় শিখাইবেন? আমার দুধ দধির বড় দরকার।

উকীল। আঃ—বলি গোরুচুরি দেখিয়াছ?

কমলা। একদিন দেখিয়াছিলাম। নসীবাবুর একটা বক্না—এক বেটা মুচি—

উকীল। কি যন্ত্রণা! বলি, প্রসন্ন গোয়ালিনীর গোরু যখন চুরি যায়, তখন তুমি দেখিয়াছ?

কমলা। না—চোর বেটার এত বুদ্ধি হয় নাই যে, আমাকে ডাকিয়া সাক্ষী রাখিয়া গোরুটা চুরি করে। তাহা হইলে আপনারও কাজের সুবিধা হইত, আমারও কাজের সুবিধা হইত।

প্রসন্ন দেখিল, উকীলকে টাকা দেওয়া সার্থক হয় নাই—তখন আপনার হাতে হাল

লইবার ইচ্ছায়, উকীলের কানে কানে বলিয়া দিল, "ও বামন সে সব কিছুর সাক্ষী নয়—ও কেবল গোরু চেনে।"

উকীল মহাশয় তখন কূল পাইলেন। গর্জ্জিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি গোরু চেন?"

কমলাকান্ত মধুর হাসিয়া বলিল, "আহা, চিনি বই কি—নহিলে কি আপনার সঙ্গে এত মিষ্টালাপ করি?"

হাকিম দেখিলেন, সাক্ষী বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে—বলিলেন, "ও সব রাখ।" প্রসন্ন গোয়ালীর শামলা গাই আদালতের সম্মুখে মাঠে বাঁধা ছিল—দেখা যাইতেছিল। ডিপুটি বাবু সেই দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই গোরুটি চেন?"

কমলাকান্ত যোড়হাত করিয়া বলিল, "কোন্ গোরুটি, ধর্ম্মাবতার?"

হাকিম বলিলেন, "কোন্ গোরুটি কি? একটি বই ত সাম্‌নে নাই?"

কমলা। আপনি দেখিতেছেন, একটি—আমি দেখিতেছি অনেকগুলি।

হাকিম বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "দেখিতে পাইতেছ না—ঐ শামলা?"

কমলাকান্ত শামলা গাইয়ের দিকে না চাহিয়া উকীলের শামলার প্রতি চাহিল। বলিল, "এ শামলাও চুরির না কি?"

কমলাকান্তের নষ্টামি হাকিম আর সহ্য করিতে পারিলেন না—বলিলেন, "তুমি আদালতের কাজের বড় বিঘ্ন করিতেছ—Contempt of Court জন্য তোমার পাঁচ টাকা জরিমানা।"

কমলাকান্ত আভূমিপ্রণত সেলাম করিয়া যোড়হাত করিয়া বলিল, "বহুৎ খুব হুজুর। জরিমানা আদায়ের ভার কার প্রতি?"

হাকিম। কেন?

কমলা। কিরূপে আদায় করিবেন, সে বিষয়ে তাঁহাকে কিছু উপদেশ দিব।

হাকিম। উপদেশের প্রয়োজন কি?

কমলা। ইহলোকে ত আমার নিকট জরিমানা আদায়ের কোন সম্ভাবনা নাই—তিনি পরলোকে যাইতে প্রস্তুত কি না জিজ্ঞাসা করিব।

হাকিম। জরিমানা না দিতে পার, কয়েদ যাইবে।

কমলা। কত দিনের জন্য, ধর্ম্মাবতার?

হাকিম। জরিমানা অনাদায়ে এক মাস কয়েদ।

কমলা। দুই মাস হয় না?

হাকিম। বেশী মিয়াদের ইচ্ছা কর কেন?

কমলা। সময়টা কিছু মন্দ পড়িয়াছে—ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ আর তেমন সুলভ নয়—জেলখানায় যাহাতে মাস দুই ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ হয়, সে ব্যবস্থা যদি আপনি করেন, তবে গরীব ব্রাহ্মণ উদ্ধার পায়।

এরূপ লোককে জরিমানা বা কয়েদ করিয়া কি হইবে। হাকিম হাসিয়া বলিলেন,

"আচ্ছা, তুমি যদি গোল না করিয়া সোজা জোবানবন্দী দাও, তবে তোমার জরিমানা মাপ করা যাইতে পারে। বল—ঐ গোরু তুমি চেন কি না?"

হাকিম তখন এক জন কনষ্টেবলকে আদেশ করিলেন যে, গোরুর নিকট গিয়া প্রসন্নের গাই দেখাইয়া দেয়। কনষ্টেবল তাহাই করিল। বিষণ্ন উকীল বাবু তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ গোরু তুমি চেন।"

কমলা। সিংওয়ালা গোরু—তাই বলুন।

উকীল। তুমি বল কি?

কমলা। আমি বলি শামলাওয়ালা—তা যাক্—আমি ও সিংওয়ালা গোরুটা চিনি। বিলক্ষণ আলাপ আছে।

উকীল। ও কার গোরু?

কমলা। আমার।

উকীল। তোমার!

কমলা। আমারই।

হরি হরি! প্রসন্নের মুখ শুকাইল। উকীল দেখ্‌ল, মোকদ্দমা ফাঁসিয়া যায়। প্রসন্ন তখন তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তবে রে বিট্‌লে! গোরু তোমার!"

কমলাকান্ত বলিল, 'আমার না ত কার! আমি ওর দুধ খেয়েছি, ওর দই খেয়েছি—ওর ঘোল খেয়েছি—ওর ছানা খেয়েছি—ওর মাখন খেয়েছি, ওর ননী খেয়েছি—ও গোরু আমার হলো না, তুই বেটী পালিস্ ব'লে কি তোর বাবার গোরু হলো!"

উকীল অতটা বুঝিলেন না। বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার, witness hostile! permission দিন, আমি ওকে cross করি।"

কমলা। কি? আমায় cross করিবে?

উকীল। হাঁ, করিব?

কমলা। নৌকায়, না সাঁকো বেঁধে?

উকীল। সে আবার কি?

কমলা। বাবা! কমলাকান্ত-সাগর পার হও, এত বড় হনুমান্ তুমি আজও হও নাই।

এই বলিয়া কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী রাগে গর্ গর্ করিয়া কাটরা হইতে নামিয়া যায়—চাপরাশী ধরিয়া আবার কাটরায় পুরিল। তখন কমলাকান্ত আলুথালু হইয়া নিশ্চেষ্ট হইল—বলিল, "কর বাবা ক্রস্ কর!—আমি অগাধ সমুদ্রে পড়িয়া আছি—যে ইচ্ছা সে লম্ফ দাও—'অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গং!'—উকীল মহাশয়! এ প্রশান্ত মহাসমুদ্র তরঙ্গ বিক্ষেপ করে না, আপনি স্বচ্ছন্দে উল্লম্ফন করুন!"

উকীল তখন কোর্টকে বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার, দেখা যাইতেছে যে, এ ব্যক্তি বাতুল; ইহাকে আর ক্রস্ করিবার প্রয়োজন নাই! বাতুল বলিয়া ইহার জোবানবন্দী পরিত্যক্ত হইবে। ইহাকে বিদায় দেওয়া হউক।"

হাকিম কমলাকান্তের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলে বাঁচেন, বিদায় দিতে প্রস্তুত, এমত সময়ে প্রসন্ন হাত যোড় করিয়া আদালতে নিবেদন করিল, "যদি হুকুম হয়, তবে আমি স্বয়ং উহাকে গোটা কত কথা জিজ্ঞাসা করি, তার পর বিদায় দিতে হয়, দিবেন।"

হাকিম কৌতূহলী হইয়া অনুমতি দিলেন। প্রসন্ন তখন কমলাকান্তের প্রতি চাহিয়া বলিল, "ঠাকুর! মৌতাতের সময় হয়েছে না?"

কমলা। মৌতাতের আবার সময় কি রে বেটী—"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিদ্যাং নেশাঞ্চ চিন্তয়েৎ।"

প্রসন্ন। অং বং এখন রাখ—এখন মৌতাত করিবে?

কমলা। দে।

প্রসন্ন। আচ্ছা, আগে আমার কথার উত্তর দাও—তার পর সে হবে।

কমলা তবে জল্‌দি-জল্‌দি বল—জল্‌দি জল্‌দি জবাব দিই।

প্রসন্ন। বলি, গোরু কার?

কমলা। গোরু তিন জনের; গোরু প্রথম বয়সে গুরুমহাশয়ের; মধ্য বয়সে স্ত্রীজাতির শেষ বয়সে উত্তরাধিকারীর; দাঁড় ছিঁড়িবার সময়ে কারও নয়।

প্রসন্ন। বলি, ঐ শামলা গাই কার?

কমলা। যে ওর দুধ খায় তার।

প্রসন্ন। ও গোরু আমার কি না?

কমলা। তুই বেটী কখন ওর এক বিন্দু দুধ খেলি নে, কেবল বেচে মর্‌লি, গোরু তোর হলো? ও গোরু যদি তোর হয় তবে বাঙ্গাল বেঙ্কের টাকাও আমার। দে বেটী, গোরুচোরকে ছেড়ে দে—গরীবের ছেলে দুধ খেয়ে বাঁচুক।

হাকিম দেখিলেন, দুই জনে বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে—আদালত মেছো-হাটা হইয়া উঠিল। তখন উভয়কে ধমক দিয়া, জিজ্ঞাসাবাদ নিজহস্তে লইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রসন্ন এই গোরুর দুধ বেচে?"

কমলা। আজ্ঞে, হাঁ।

'উহার গোয়ালে এই গোরু থাকে?"

কমলা। ও গোরুও থাকে, আমিও কখন কখন থাকি।

"ঐ খাওয়ায়!"

কমলা। উভয়কে।

বাদিনীর উকীল তখন বলিলেন, "আমার কার্য সিদ্ধ হইয়াছে—আমি উহাকে আর জিজ্ঞাসা করিতে চাই না।" এই বলিয়া তিনি উপবেশন করিলেন। তখন আসামীর উকীল গাত্রোত্থান করিলেন। দেখিয়া কমলাকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার তুমি কে?"

আসামীর উকীল বলিলেন, "আমি আসামীর পক্ষে তোমাকে ক্রস্‌ করিব।"

কমলা। একজন ত ক্রস্ করিয়া গেল, আবার তুমি কুমার বাহাদুর এলে না কি ?

উকীল। কুমার বাহাদুর কে ?

কমলা। রাজপুত্রকে চেন না ? ত্রেতা যুগে আগে ক্রস্ করিলেন পবনাঙ্গজ মহাশয়। তার পর ক্রস্ করিলেন কুমার বাহাদুর।*

উকীল। ও সব রাখ—তুমি গোরু চেন বলেছ – কিসে চেন ?

কমলা। কখন শিঙ্গে—কখন শামলায় !

উকীল রাগিয়া উঠিয়া, গর্জ্জন করিয়া, টেবিল চাপড়াইয়া বলিলেন, "তোমার পাগলামি রাখ – তুমি এই গোরু চিনিতে পারিতেছ কিসে ?"

কমলা। ঐ হাম্বা-রবে।

উকীল হতাশ হইয়া বলিলেন, "Hopeless !" উকীল মহাশয় বসিয়া পড়িলেন আর জেরা করিবেন না। কমলাকান্ত বিনীতভাবে বলিল, "দাড়ি ছেড় কেন, বাবা।"

উকীল আর জেরা করিবেন না দেখিয়া হাকিম কমলাকান্তকে বিদায় দিলেন। কমলাকান্ত ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল। আমি কিছু কাজ সারিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম যে, কমলাকান্ত থেলো হুঁকা হাতে করিয়া বসিয়া আছে—চারিদিকে লোক জমিয়াছে—প্রসন্নও সেখানে আসিয়াছে। কমলাকান্ত তাহাকে তিরস্কার করিতেছে আর বলিতেছে, "তোর মঙ্গলার বাঁটের দিব্য, তোর দুধের কেঁড়ের দিব্য, তোর ঘোলমউনির দিব্য, তোর ফাঁদি-নথের দিব্য, তুই যদি চোরকে গোরু ছেড়ে না দিস্।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "চক্রবর্ত্তী মহাশয় ! চোরকে গোরু ছাড়িয়া দিবে কেন ?"

কমলাকান্ত বলিল, "পূর্ব্বকালে মহারাজ শ্যেনজিৎকে এক ব্রাহ্মণ বলিয়াছিল যে, 'বৎস, গোপস্বামী ও তস্কর, ইহাদের মধ্যে যে ধেনুর দুগ্ধ পান করে, সেই তাহার যথার্থ অধিকারী। অন্যের তাহার উপর মমতা প্রকাশ করা বিড়ম্বনা মাত্র।'† এই হলো ভীষ্মদেব ঠাকুরের Hindu Law, আর ইহাই এখনকার ইউরোপের International Law। যদি সভ্য এবং উন্নত হইতে চাও, তবে কাড়িয়া খাইবে। গো শব্দে ধেনুই বুঝ আর পৃথিবীই বুঝ, ইনি তস্করভোগ্যা। সেকন্দর হইতে রণজিৎ সিংহ পর্য্যন্ত সকল তস্করই ইহার প্রমাণ। Right of Conquest যদি একটা right হয়, তবে Right of theft, কি একটা right নয় ? অতএব, হে প্রসন্ন নামে গোপকন্যে ! তুমি আইনমতে কার্য্য কর। ঐতিহাসিক রাজনীতির অনুবর্ত্তী হও। চোরকে গোরু ছাড়িয়া দাও।"

এই বলিয়া কমলাকান্ত সেখান হইতে চলিয়া গেল। দেখিলাম, মানুষটা নিতান্ত ক্ষেপিয়া গিয়াছে।

খোশনবীস জুনিয়র

———

* অঙ্গদ। † শান্তিপর্ব্ব, ১৭৪ অধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত টীকা

প্রথম সংখ্যা

একা

'কে গায় ওই ?"

সারকথা ও সমালোচনা দপ্তরের প্রথম সংখ্যাটিতে কমলাকান্তরূপী বঙ্কিমচন্দ্রের তিনটি উপলব্ধি ব্যক্ত হয়েছে। প্রথমটি এই যে তিনি একা; দ্বিতীয়টি, আশা মানুষের জীবনকে রাঙিন করে তোলে; তৃতীয়টি 'প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী—প্রীতিই ঈশ্বর'।

লেখকের এই ভাবনার মূলে রয়েছে একটি গীত। অজানা এক পথিক চলেছে আপন মনে গান গাইতে গাইতে। সেই গানের সুর লেখকের কাছে 'বহুকাল-বিস্মৃত সুখস্বপ্নের ন্যায়' মধুর বলে মনে হয়েছে। পথিকের মন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির অপরূপ সৌন্দর্য দেখে আনন্দে ভরে গেছে—তাই সে গান গেয়ে চলেছে; কিন্তু সেই গান শুনে কমলাকান্তের হৃদয় আলোড়িত হয় কেন মনের মধ্যে এরই উত্তর খুঁজতে গিয়ে তিনি দেখলেন, নিসর্গ-সৌন্দর্যের প্রভাবে সকলেরই অন্তর যখন আনন্দোচ্ছল তখন তাঁর নিজের অন্তর নিরানন্দ, তাই আকস্মিক সংগীতের প্রভাবে এই আলোড়ন জেগেছে। কিন্তু ঐ নিরানন্দ হওয়ারও মূল কারণ, তিনি একা। অমনি তিনি জানালেন, এ সংসারে কেউ যেন একা না থাকে। অপরের ভালোবাসার পাত্র না হ'লে মানুষের জন্মই বৃথা—পরের ভালো লাগে বলেই ফুলের জীবন সার্থক—পরের জন্যই হৃদয়কে বিকশিত করে তুলতে হবে।

প্রথমাংশের এই একা-না-থাকার প্রস্তাবটির সঙ্গে শেষাংশের প্রীতি-তত্ত্বের গভীর সংযোগ লক্ষণীয়। 'প্রীতিই ঈশ্বর' বলায় সেখানে যদিও ঈশ্বরভক্তি হয়েছে পরম লক্ষ্য, তবুও মূলত এই ঈশ্বরপ্রেম যে মানব-প্রেমরই নামান্তর সে কথাও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে,—'মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।'

মাঝখানে অতীত স্মৃতিচারণ সূত্রে এসেছে যৌবনের প্রসঙ্গ ও তারই অনুষঙ্গে মানবজীবনে আশার অপরিমেয় প্রভাবের কথা। এক হিসাবে রচনাটি প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তদেশে দাঁড়িয়ে যৌবনের সুখস্বপ্নের ক্ষণিক অনুভূতি বলা যেতে পারে। সেই ক্ষণিককে ধরে রাখার কোনো উপায় নেই, কিন্তু তাকে যে বৃহত্তর গভীরতর উপলব্ধির মধ্যে নিমজ্জিত করা যেতে পারে, তারই নির্দেশ পাওয়া যায় শেষাংশের চিন্তা ও ভাববিন্যাসের মধ্যে। এই গভীরতর উপলব্ধি আসলে বঙ্কিমেরই প্রৌঢ় ঋতুর ফসল। এর মধ্যে আছে একদিকে উপনিষদের আত্মজ্ঞান বা আত্মপ্রসার, অপরদিকে

পাশ্চাত্য মানবপ্রেমের এক অপূর্ব সমন্বয়। যৌবনের আনন্দ আশার রঙিন কাচের অপেক্ষা রাখে। ভিত্তিহীন যুক্তিহীন অলীক স্বপ্নরচনায় বিভোর যৌবনে যে স্ফূর্তির যোগান থাকে, বেশি বয়সে তা আর থাকে না বটে, কিন্তু পরিবর্তে এই সংসারের যে কঠিন অভিজ্ঞতা সংগৃহীত হয় তাই থেকে মানুষ আরও লাভবান হতে পারে। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গভীরতর জীবনবোধ জাগ্রত হওয়ায় তিনি যৌবনের আনন্দের উচ্ছ্বাসের পরিবর্তে শান্তরসাপ্লুত ধ্রুব আনন্দের জন্য উৎসুক হয়েছেন।

'একা'-প্রবন্ধটি সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যেখানে হাস্যরসের কোনো সম্পর্ক নেই, এই দিক থেকে এটি 'আমার দুর্গোৎসব' ও 'একটি গীত'-এর সমশ্রেণীভুক্ত। এগুলো আদ্যন্ত গম্ভীরভাবের রচনা। 'একা'র মধ্যে আমরা খুব বেশি করে পাই দার্শনিক ও ক্রান্তদর্শী কবি-বঙ্কিমকে। যৌবনের ও আশার ক্ষণস্থায়ী মোহে বিভ্রান্ত-বিমূঢ় মানুষ কিভাবে সেই মোহভঙ্গে স্থায়ী সুখ-শান্তির সন্ধান পেতে পারে দার্শনিক বঙ্কিম এখানে সেই উদ্দেশ্যে এক মূল্যবান জীবন-ভাষ্য রচনা করেছেন। তবে এখানে শুধু অপরের জন্য সংহিতা-রচনার আয়োজন নয়, প্রৌঢ়ত্বে উপনীত বঙ্কিম আপন হৃদয়-গহনে সন্ধানী দৃষ্টি চালিয়ে উদ্ধার করেছেন তাঁরই নিজস্ব গভীর উপলব্ধি-জাত জীবনবোধ। এইজন্য এক নিবিড় তন্ময়তার সুর লেগে আছে রচনায়, বিশেষত এর পরিণতি অংশে। সমগ্র কমলাকান্ত সম্পর্কে যে লিরিক মূর্ছনার বৈশিষ্ট্য দাবী করা হয়ে থাকে, 'একা'-র সেই দাবী বুঝি অন্যান্য সমস্ত দপ্তরের তুলনায় সবচেয়ে জোরালো।

পাঠপ্রসঙ্গে—কে গায় ওই—এখানে গায়ক কে তা লক্ষ্য নয়। লেখকের কানে গানের সুরটি এসে লেগেছে, তার আকর্ষণী শক্তিই জানাবার বিষয়।

সুখস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় সংগীতের উৎকর্ষ যে তাঁকে মুগ্ধ করেছে এমন নয়। সংগীত তাঁর অন্তরে জাগিয়ে দিয়েছে অতীতকালের আনন্দের স্মৃতি। বাস্তবিক পক্ষে এই রচনাটি প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তদেশে দাঁড়িয়ে যৌবনের সুখস্বপ্নের ক্ষণিক অনুভূতি বলা যেতে পারে। রচনাটির শেষভাগে দেখা যায়, তিনি এই ক্ষণিক আনন্দের স্মৃতিটুকুকে গভীরতর উপলব্ধির মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছেন। বিগত যৌবনের আনন্দময় স্মৃতি তাঁর কাছে সুখস্বপ্নের মতো অনুভূতিগ্রাহ্য অথচ অপ্রাপ্য ও ক্ষণিক বলে প্রতিভাত হয়েছে; সেই সঙ্গে জীবনের প্রৌঢ় অনুভূতি তাঁহার চিত্তকে ভাবাপ্লুত করেছে। যৌবনের আনন্দ-চঞ্চল স্মৃতিকে অতিক্রম করে জীবনে গভীরতর রহস্যানুসন্ধানের এই প্রবণতা প্রবীণ লেখকের পক্ষে স্বাভাবিকই হয়েছে।

মনের আনন্দ উছলিয়া উঠিতেছে—মানুষের সৌন্দর্যানুভূতি ও শিল্পসাধনা তার আনন্দবৃত্তি থেকেই উদ্ভূত। প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে পথিকের অন্তর আনন্দে উদ্বেলিত, সংগীতের মধ্য দিয়ে সেই আনন্দই অভিব্যক্ত।

আমার হৃদয়কে আলোড়িত করে কেন আলংকারিকেরা কাব্যকে সহৃদয় হৃদয়সংবাদী বলেন। সংগীত প্রভৃতি অন্যান্য শিল্পকলা সম্পর্কেও ঐ কথাই বলা যেতে পারে। শিল্পী যখন কোন সৃষ্টি করেন তখন তার মধ্যে কোনো ভাবকে আপনার অনুভূতির দ্বারা বিশেষীকৃত রূপে ফুটিয়ে তোলেন। তবু সাহিত্যের মতো সংগীতের বেলাতেও একজনের সৃষ্ট শিল্প অপর একজনের অন্তরকে স্পর্শ করতে পারে।- এখানে অবশ্য লেখক তাঁর হৃদয় আলোড়িত হবার অন্য কারণ দেখিয়েছেন।

আমিই কেবল নিরানন্দ ইত্যাদি—সকলের মনেই আনন্দ আছে; কিন্তু লেখকের অন্তরে আনন্দ নেই; সেইজন্য এই আনন্দোদ্ভূত সংগীত তাঁর কাছে একটি বিশেষ বস্তু বলে মনে হয়েছে এবং তাঁর চিত্তে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। লেখক কেন যে নিরানন্দ তা স্পষ্টভাবে বলেননি। রচনাটির শেষ অংশে বৃদ্ধ বয়সে আশার অভাবে মানুষের হৃদয়ে আনন্দের পরিমাণ যে কমে আসে তা বলা হয়েছে। তবে পরবর্তী অনুচ্ছেদেই যে একাকিত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায় সেইটেই এই নিরানন্দের মূল এমন অনুমান করা অসংগত হবে না।

আমি একা—আনন্দে মুখর পৃথিবীতে নিজে নিরানন্দ বলেই কমলাকান্ত একা। বাস্তবিক পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন আলোচনা করলে তাঁর একাকিত্বই সবচেয়ে বেশি করে আমাদের চোখে পড়ে। যৌবনে যখন তিনি সাহিত্যসৃষ্টিতে ব্রতী হয়েছিলেন তখন তাঁর কয়েকজন সাহিত্যানুরাগী বন্ধু হয়তো ছিল; কিন্তু পরিণত বয়সে তিনি যখন লেখনী ধারণ করে গুরুত্বপূর্ণ কাজে অগ্রসর হয়েছেন, তখন তাঁকে একাকীই সাধনা করতে হয়েছে। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে ধর্মতত্ত্ব, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা প্রভৃতি বিষয়ে বা সামাজিক, ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক বহু বিষয়ে সত্যান্বেষী ও মানব-প্রেমিকের দৃষ্টি নিয়ে যে আলোচনা করেছেন, তাতে যোগ দিয়ে সহায়তা করবার মতো লোক তিনি পান নি। তিনি বারবার নব্য শিক্ষিত এবং প্রাচীনপন্থী উভয় দলের বাঙালীর চিন্তার দ্বারে করাঘাত করেছেন, কিন্তু সাড়া পাননি বললেই হয়। এমন কি কয়েকটি উপন্যাসের মধ্যে তাঁর যে সুগভীর জীবনদৃষ্টির পরিচয় ফুটেছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সাহিত্যানুরাগীরা তার কতটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। স্বল্পসংখ্যক ব্যতিক্রমের মধ্যে চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়কুমার সরকার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম করা যায়।

এই বহু জনাকীর্ণ ইত্যাদি—বহুজন-পরিবেষ্টিত হয়েও নিঃসঙ্গ থাকার বেদনা বেশির ভাগ প্রতিভাধর পুরুষের ভাগ্যে ঘটে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র যে পৃথিবীতে বাস করতেন সে পৃথিবীতে কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। এ যুগে বহু মনীষী বা কর্মী ঐভাবে আগন্তুকের মতো এই পৃথিবীতে এসে দোসরহীন অবস্থায় আপনাদের ভাবনার ডালা নিয়ে ফিরেছেন। আত্মার এই নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্ব সকল যুগে সকল দেশেই প্রতিভাশালী শিল্পীর জীবনে দেখতে পাওয়া যায়।

কেহ একা থাকিও না - উপনিষদে পাওয়া যায় যে, ব্রহ্ম প্রথমে একা ছিলেন, কিন্তু তাতে তাঁর তৃপ্তি হলো না। তিনি তখন প্রজাকাম হয়ে এই বিশ্বকে সৃষ্টি করলেন। মানুষ একা থাকতে পারে না—তার মনকে উন্মুক্ত করে দেবার মতো একটা অবকাশ, একটা অবলম্বন থাকা চাই। বঙ্কিমচন্দ্র উপনিষদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে হয় না। তবে উপনিষদের এই ভাবটির সঙ্গে তাঁর চিন্তাটির নিকট সাদৃশ্য আছে। উপনিষদে আত্মার সত্যকামনার কথা বলা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র হৃদয়ের সংযোগকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। মানুষ আত্মকেন্দ্রিক না হয়ে অপরের সঙ্গে হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করবে, এই বলাই তাঁর অভিপ্রায়। তাঁর এই অভিমতটির মূলে পাশ্চাত্য মানবতাবাদের আদর্শের প্রভাব আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে রোমাণ্টিক আদর্শবাদ ইউরোপ, বিশেষ করে ইংলণ্ডের ভাবুক সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাও কতক পরিমাণে তাঁর বোধটিকে প্রভাবিত করে থাকবে। কয়েক ছত্র পরে 'পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও' এই ভাবটি পাশ্চাত্য পরহিত-সাধনব্রতের অর্থাৎ মানবতাবোধের আদর্শ।

তাহা বলি নাই - এখন তিনি সংগীত ভালো লাগার মূল কারণটি বলতে উদ্যত হয়েছেন। পূর্বে নিজের নিরানন্দ ও একাকিত্ব সম্পর্কে যা বলেছেন তা তাঁর এই মূল-উক্তির ভূমিকামাত্র।

এ হৃদয় আর তাই নাই ক্রোচে প্রমুখ আধুনিক নন্দনতাত্ত্বিক বলেন যে, কোনো বিষয় নিজে সুন্দর কিংবা অসুন্দর নয়। মানুষের চিত্তটাই সব। মানুষের চিত্তে যা সুন্দর বলে প্রতিভাত হয়ে ব্যক্ত হয় তাকেই সুন্দর বলা হয়, মানুষের চিত্তে যা অসুন্দর বলে প্রতিভাত হয় তাকেই অসুন্দর বলা হয়। কমলাকান্তরূপী বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, যৌবনে যখন তাঁর চিত্তে স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ছিল তখন সবই তাঁর কাছে সুন্দর বলে মনে হয়েছে। এখন জীবনের রূপ যে পরিবর্তিত হয়ে গেছে এমন নয়, তবে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানাকারণে তাঁর অন্তরের সেই প্রফুল্লতা বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় এখন আর এই পৃথিবী তাঁর কাছে আনন্দময় বলে মনে হয় না। ওয়ার্ডসওয়ার্থও দুঃখ করেছেন যে, বাল্যে যে পৃথিবীকে তিনি সুন্দর দেখেছিলেন, পরবর্তী কালে আর তিনি তা দেখতে পান না। বাল্যের সেই সৌন্দর্যবোধ বিলীন হয়েছে।

ক্ষতি অপেক্ষা অর্জন অধিক মানুষ তাঁর শক্তি ও উদ্যম ব্যয় করে সংসারযাত্রায় একটা নিরাপদ ভিত্তি অর্জন করে। বহুদিনব্যাপী প্রচেষ্টার ফলে এই ভিত্তিটি সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষতি অপেক্ষা অর্জনটাই বেশি বলে নির্দেশ করা হয়ে থাকে।

আশা সেই রঙ্গিন কাচ - আশাকেই বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের সর্ববিধ আনন্দের মূল বলে নির্দেশ করেছেন। আশা মানুষের চোখে এমন মাদকতা সৃষ্টি করে যাতে অসম্ভব বলে, অপ্রাপ্য বলে কিছু মনে হয় না। ব্যর্থতাও হৃদয়কে মুষড়িয়ে দেয় না।

এখন জানিয়াছি ইত্যাদি—বঙ্কিমচন্দ্র এখানে অভিজ্ঞতাকেই আশার বিপরীত প্রান্তে স্থাপন করেছেন। মানুষ যতক্ষণ কোনো বিষয়ের পরিণতি কি হবে তা জানে না, ততক্ষণই সে অনেক কিছু আশা করে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে যখন সে দেখে যে, তার আশা সার্থক হবার পথে অনেক বাধা, বারবার ব্যর্থতাই দেখা দিচ্ছে তখন তার আশার পরিধি সংকীর্ণ হয়ে আসে। বাইবেলে আছে যে, মানুষ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে স্বর্গের সুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অভিজ্ঞতার সাহায্যে কোনো বিষয়ের যথার্থ পরিচয় লাভ করলেও আশার সুখস্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হতে হয়, বারবার আশাভঙ্গ হলে আশা করবার শক্তিই অবসন্ন হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়বার শুনিতে চাই না—বাস্তবিকপক্ষে ঐ বিশেষ সংগীতে কমলাকান্তের আকর্ষণ নেই—ওটি তাঁর যৌবনের স্মৃতি মুহূর্তের জন্য জাগ্রত করে দিয়েছিল বলেই তাঁর কাছে মধুর লেগেছিল। এখন আর তা শুনতে চান না। যৌবনের স্মৃতি আনন্দময় হলেও কমলাকান্ত আর তা ফিরে পেতে চান না। এখন তিনি এমন এক আনন্দের সন্ধান পেয়েছেন যার কাছে যৌবনের উন্মাদনাময় আনন্দ তুচ্ছ বলেই গণ্য। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে গভীরতর জীবনবোধ জাগ্রত হওয়ায় তিনি যৌবনের আনন্দের উচ্ছ্বাসের পরিবর্তে শান্তরসাপ্লুত ধ্রুব আনন্দের জন্য উৎসুক হয়েছেন।

প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি—এই উক্তিটি এই রচনাটির মূল বক্তব্য। বঙ্কিমচন্দ্র প্রীতিকে সকলের উপরে স্থান দিয়েছেন—এটি তাঁর প্রৌঢ় উপলব্ধির ফল। যৌবনে মানুষের মনে যে আনন্দ থাকে তা অনেকাংশে স্বকেন্দ্রিক—তখন সে নিজের হৃদয়ের আশায় মেতে থাকায় অপরের দিকে বিশেষ চেয়ে দেখে না। কিন্তু বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে যৌবনের উচ্ছ্বাস কমে যায়, আশার তরঙ্গ শমিত হয়ে আসে—কিন্তু এই সময় সর্বব্যাপী প্রেম হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে। প্রীতি ও ঈশ্বরের অভিন্নতা কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব এবং এর ওপর পাশ্চাত্য আদর্শের প্রভাব নেই। প্রেমভক্তির যে আদর্শ বৈষ্ণবীয় চিন্তায় দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রকে তা আদৌ প্রভাবিত করেনি। এই উক্তিটি তাঁর স্বকীয় উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। 'মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না'—পরিসমাপ্তিতে এই উক্তিটিতে তিনি আপনার জীবনদৃষ্টি ও আদর্শ দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন। তাঁহার দেশপ্রেমের মূলেও তাঁর এই প্রীতি বর্তমান। স্বদেশের কল্যাণসাধনের কামনাও এর সঙ্গে জড়িত। 'বাঙ্গালা নব্য লেখকদের প্রতি' তিনি যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তার একাংশ এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে—'যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন তবে অবশ্য লিখিবেন।'

দ্বিতীয় সংখ্যা

মনুষ্য-ফল

সারকথা ও সমালোচনা ঃ এই প্রবন্ধের বক্তব্য-সার হলো বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ যেন বিভিন্ন জাতীয় ফলের মতো। বলা বাহুল্য কমলাকান্তের এই উপলব্ধি আফিমের মাত্রা চড়াবার ফল। ভূমিকায় সাধারণভাবে এই ফল-সাদৃশ্যের হেতু ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যথা ফল যে গাছে ফলে, সে শুধু পরিপক্ক হয়ে স্খলিত হওয়ার জন্য। তেমনি সংসার-বৃক্ষে মানুষ-ফলের জন্ম, শুধু পরিণামে মৃত্যুবরণের জন্য। তবে ফলের যেমন অকালে ঝরে পড়া, পোকায় খাওয়া, পাখিতে খাওয়া, শুকিয়ে যাওয়া, আবার ক্ষেত্র বিশেষে দেবসেবায় বা ব্রাহ্মণ-সেবায় ব্যয়িত হওয়া ইত্যাদি, অথবা হিতকর বা বিষময়, কিংবা মাকালের মত কেবল শোভাসার ইত্যাদি নানা দশা আছে, তেমনি আছে মানুষেরও।

কিন্তু মূল উদ্দেশ্য বুঝি এই দার্শনিকসুলভ সাদৃশ্য-উদ্‌ঘাটনই নয়, রকমারি ফলের প্রকৃতির সাহায্যে সমাজস্থ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের প্রকৃতি, জীবন বা কার্য-কলাপের বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করা। তাই দেখা যায়, আমাদের দেশে বড় মানুষেরা যেন কাঁটাল, সিবিল সার্বিসের সাহেবরা আম্রফল, স্ত্রীলোকেরা নারকেল, দেশহিতৈষীরা শিমুল, অধ্যাপক ব্রাহ্মণেরা ধুতুরা, লেখকগণ তেঁতুল, এবং দেশী হাকিমেরা কুষ্মাণ্ড। উপযুক্ত ও উপভোগ্য যুক্তির ভিত্তিতে এই সব সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে।

কমলাকান্ত ঢঙের রচনা হিসাবে মনুষ্যফল নিবন্ধটি নানা বৈশিষ্ট্য দাবী করে। যে পরিহাস-রসিকতা এই ঢঙের প্রধান অঙ্গ তা এর ছত্রে ছত্রে তরঙ্গায়িত এবং একেবারে শেষের কয়টি কথায় ঐ রসিকতার সুর যেমন চড়া, তেমনি রসালো, আর তেমনি তার প্রয়োগ-নৈপুণ্য ঃ 'সংসারোদ্যানে আরও অনেক ফল ফলে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা অকর্মণ্য, কদর্য, টক,—শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী।' নিজেকে যে-লেখক সর্বনিকৃষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেন, তাঁর অন্যান্য শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে যাই থাকুক, তা কেউই গায়ে মাখে না। আর এইটাই প্রমাণ করে যে, এখানকার কোনো বিদ্রূপই নির্মম আঘাতের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত নয়, হাস্যকৌতুকের মাধ্যমে অসঙ্গতি প্রদর্শন লেখকের লক্ষ্য।

সমালোচনা এখানে নানা ভঙ্গীর। বড়লোকদের কাঁটাল বলার মধ্যে ঐ শ্রেণীর মানুষগুলোর প্রতি যে সহানুভূতিশূন্য নিছক কোনো অবাঞ্ছিত কটাক্ষই করা হয়েছে, তা নয় ; প্রথমটা খাজা, আটা-বহুল বা ভুতুড়িসার বলে বড়লোকী অপদার্থতার প্রতি কটাক্ষমূলক একটি শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে বটে, কিন্তু পরে পাকা-কাঁটালের উপর শৃগালের ও মাছির অত্যাচারের আঙ্গিক-রচনায় লেখকের আর সে মনোভাব নেই,

পরিবর্তে শৃগালমাছিতে ভরা এই আমাদের সমাজের প্রতিই সকৌতুক কটাক্ষপাতে রচিত হয়েছে একটি চমৎকার নক্শা। সিবিল সার্বিসের সাহেবদের সম্পর্কে মন্তব্য রীতিমত তীক্ষ্ম ও মর্মভেদী। স্ত্রীলোকদের প্রসঙ্গটাই এই প্রবন্ধে প্রশস্ততম। প্রিয়-অপ্রিয়, রঞ্জিত-অতিরঞ্জিত নানা মন্তব্যই এখানে স্থান পেয়েছে ; তার মধ্যে আমাদের স্ত্রী-সমাজের দুর্বলতাও যেমন ফুটেছে, মহিমাও তেমনি ফুটেছে। স্ত্রীলোকের বিদ্যা নারকেলের মালা, কখনও আধখানা বৈ পুরো দেখতে পেলাম না, অবশ্যই একটা অনুদার অপ্রিয় কিন্তু উপভোগ্য মন্তব্য। ছোবড়া, স্ত্রীলোকের রূপ এবং কেবল জাহাজ-বাঁধা ও গলায়-দাড় হওয়াই যেন তার একমাত্র কাজ, এ ধরনের মন্তব্যও কৌতুক দৃষ্টি ও রস-সৃষ্টির পরিচয় দেয় ; কিন্তু নারী-সমাজের প্রতি বঙ্কিমের যে সশ্রদ্ধ মমতার অভাব ছিল না, তার প্রমাণও যথেষ্ট। নারকেলের ত্রিগুণার মধ্যে মধ্যম দশা, অর্থাৎ ডাব-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনসূত্রে বঙ্কিম ডাবের জলের সঙ্গে স্ত্রীলোকের স্নেহের সাদৃশ্য দেখিয়ে বলেছেন, ঐ জলের মতোই নারীর হৃদয় সর্বসন্তাপহারক। 'তোমার দারিদ্র্য চৈত্রে, বা বন্ধু-বিয়োগ-বৈশাখে—তোমার যৌবন-মধ্যাহ্নে বা রোগতপ্ত বৈকালে, আর কিসে তোমার হৃদয় শীতল হইবে ? মাতার আদর, স্ত্রীর প্রেম, কন্যার ভক্তি, ইহা অপেক্ষা জীবনের সন্তাপে আর কি সুখের আছে ? গ্রীষ্মের তাপে ডাবের জলের মত আর কি আছে ?' এই মূল্যবান্ রূপক রচনায় সংসারে নারীর ভূমিকাকে পর্যাপ্ত শ্রদ্ধা, মহিমা ও মমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তা ছাড়া বিদ্যার বেলা যাই বলা হোক, বুদ্ধির বেলা কিন্তু অবজ্ঞার কোনো স্পর্শ নেই। গৃহিণীপণা নাম দিয়ে বঙ্কিম স্ত্রী-লোকের বুদ্ধির তারিফ করেছেন ও ব্যঙ্গও করেছেন। আনুষঙ্গিকভাবে বহু বিবাহের প্রতি কটাক্ষটাও মন্দ উপভোগ্য নয়।

বঙ্কিমের যুগে যে দেশহিতৈষী সাজবার হুজুগ দেখা দিয়েছিল তাকে এখানে ব্যঙ্গ-জর্জরিত করা হয়েছে শিমুল ফুল-ফলের রূপকযোগে। 'কিন্তু আমার চক্ষে নেড়া গাছে অত রাঙ্গা ভাল দেখায় না', বা 'অন্তর্লঘু ফল, ফট করিয়া ফাটিয়া উঠে,' এই দুটি মন্তব্যে পরিহাসের পর্দা ভেদ করে উঁকি দিচ্ছে দুটি রূঢ় সত্য,—এক, সারা দেশ যেখানে স্বাধীন রাষ্ট্রচেতনার দিক থেকে অজ্ঞতায় নিমজ্জিত, সেখানে দুটি-চারিটি লোকের মুখে কপট স্বদেশীয়ানার উচ্ছ্বাসপূর্ণ বাগাড়ম্বর বেমানান দেখায় ; তথাকথিত দেশহিতৈষীরা কেবল বাক্সর্বস্ব, বাইরের উত্তেজনায় শুধু মুখে তুবড়ি ফুটিয়েই নিষ্ক্রিয় থাকেন।

বাংলা সাহিত্য ও বঙ্গীয় লেখকসমাজের সমালোচনা কমলাকান্তের দপ্তরের অনেক জায়গায় ছড়িয়ে আছে। এখানে ধুতুরা ফলের রূপক প্রসঙ্গে বঙ্কিম যে বলেছেন, প্রবন্ধ-গাঁজার মধ্যে সেই বচন-ধুতুরার বীচিতে পাঠকের নেশা জমিয়ে তোলাই বঙ্গীয় লেখকের কাজ এবং ঐ নেশায় বাংলাদেশ আজকাল মেতে উঠেছে,—এর মধ্যে প্রবন্ধের মৌলিকতা এবং নিজস্ব উৎকর্ষ কিভাবে যাচাই করতে হয় তার মূল্যবান সংকেত রয়েছে।

ঠিক এরই সূত্র ধরে কমলাকান্ত সহজেই বলতে পেরেছেন, বাংলার লেখকগণ হলেন ফলের মধ্যে তেঁতুল, সাক্ষাৎ কাষ্ঠাবতার, তবে সমালোচনার আগুনে পোড়েন ভাল। এই সমঝদারি মন্তব্য প্রকৃত সাহিত্যরসিক মাত্রই বুঝবেন। সাহিত্যিক সারবস্তু বা স্বকীয়তা কিছুই নেই, কিন্তু তাতে সমালোচনার উপাদান হতে আটকায় না, এবং ভস্মীভূত কাষ্ঠখণ্ডের মতো এইসব অন্তঃসারশূন্য সাহিত্য সূক্ষ্ম সমালোচনায় শেষ পর্যন্ত ছাইপাঁশ বলেই গণ্য হয়। এ ছাড়া খাঁটি বাংলা সাহিত্যের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হওয়ার বিড়ম্বনা কী সুন্দরভাবেই না অভিব্যক্ত হয়েছে। এখানে 'আগা-গোড়া তেঁতুলের মাছ দিয়ে ভাত মারা'র ব্যঙ্গ-পরিহাসোচ্ছল রূপকে, আর সাহিত্যরসের দিক দিয়ে তুলনামূলক আলোচনায় পাশ্চাত্য ও বঙ্গীয় সাহিত্যের কী সত্যরূপটাই না পাশাপাশি তুলে ধরা হয়েছে :–"পদ্মীপিসী কুলীনের মেয়ে, কিন্তু রাঁধিবার বেলা কলাইয়ের দাল আর তেঁতুলের মাছ ছাড়া আর কিছুই রাঁধিতে জানে না। ফয়জু জাতিতে নেড়ে, কিন্তু রাঁধে অমৃত"।

'মনুষ্য-ফল' প্রবন্ধটি একাধারে সমালোচক ও হাস্যরসিক বঙ্কিমের চমৎকার পরিচয় বহন করে। রসিকতার সঙ্গে সহৃদয়তার সংযোগ থাকায় এখানকার ব্যঙ্গবিদ্রূপও কোথাও রূঢ় হয়ে ওঠেনি। কবিশেখর কালিদাস রায় দপ্তরগুলিকে যে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করতে চেয়েছেন,—emotional, logical ও rhetorical—তার মধ্যে 'মনুষ্য-ফল' তৃতীয় শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য, কারণ এখানকার পরম্পরা (sequence) প্রধানত আলঙ্কারিক, 'বড়বাজার' বা 'ঢেঁকি'র মতো এখানেও রূপকমালায় সাজানো হয়েছে লেখকের বক্তব্য।

পাঠপ্রসঙ্গে—মাত্রা চড়াইলে—কমলাকান্তের দপ্তরে এই আফিমের মহিমাই সর্বত্র বন্দিত। যা সাদা চোখে দেখা ও সাদা কথায় বলার মতো নয়, অহিফেন-প্রসঙ্গে তা সবই হয় কমলাকান্তের সহজসাধ্য। আফিম্ কমলাকান্তের কাছে দিব্যজ্ঞান ও দিব্যদৃষ্টিলাভের উপায়স্বরূপ, তাই তার মাত্রা চড়ানোর অর্থ ঐ জ্ঞান ও দৃষ্টির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। এর সহায়তায় তিনি বিশ্বরূপ দর্শন করেন।

সকলগুলি পাকিতে পায় না—এখানে রোগে বা অন্য কারণে অকালমৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

দেবসেবায় বা ব্রাহ্মণভোজনে লাগে—আপাতদৃষ্টিতে কৌতুককর বলে মনে হলেও লেখক বাস্তবিকপক্ষে সৎকার্যে জীবন উৎসর্গের কথা বলতে চেয়েছেন।

শৃগাল খায়—অর্থাৎ কোন সৎকাজে না লাগায় তাদের জীবন হয় ব্যর্থ।

কভকগুলি তিক্ত ইত্যাদি—কমলাকান্ত এখানে মানুষের প্রকৃতি ও গুণাগুণের বৈচিত্র্যের কথা বলেছেন।

কাঁটাল বলিয়া বোধ হয়—অর্থস্ফীতি আছে বলে বড়ো মানুষেরা বড়ো ; কাঁটালও আকারে বড়ো।

কতকগুলি বড় আটা ইত্যাদি—যারা ধনী হলেও মানুষের কল্যাণসাধনের জন্য কিছু মাত্র চেষ্টা করে না, লেখক তাদের প্রতি কটাক্ষ করেছেন।

শৃগালেরা কেহ বা দেওয়ান ইত্যাদি—কোনো-না-কোনো কর্মসূত্রে যারা ধনীকে শোষণ করবার জন্য সর্বদাই উৎসুক হয়ে থাকে, তারাই এখানে শৃগালরূপে কল্পিত।

রসের প্রত্যাশা—কিছু অর্থসাহায্য। শৃগাল ও মাছি এই দুটির মধ্যে ভেদ করে শোষক ও প্রসাদার্থী এই দুই শ্রেণী স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া উঠে—সম্ভবত এখানে ইঙ্গিতটা নিছক সঞ্চিত ধনের অকল্যাণকারিতা ও পাপবুদ্ধির কুৎসিত সহায়তার দিকে।

এ দেশে আম ছিল না—কেউ কেউ অনুমান করেন যে, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে ভারতে আম আসে। তবে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যেও আম্রের উল্লেখ আছে।

দেখিতে রাঙ্গা রাঙ্গা—বাহ্য রূপ ও আড়ম্বরকে কটাক্ষ করা হয়েছে।

কাঁচায় বড় টক ইত্যাদি—ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের আচরণের মধ্যে যে উগ্রতা আছে তাকে বঙ্কিমচন্দ্র টক বলেছেন। এদেশে অনেক কাল থাকবার পর তাদের উগ্রতা কতকটা কমে যায় বটে, কিন্তু একেবারে চলে যায় না।

ফাঁকি দিয়া পাঁচিশ টাকা শ' বিক্রয় হইয়া যায়—অনেক ব্রিটিশ রাজকর্মচারী বাস্তবিকপক্ষে অকর্মণ্য, কিন্তু বাহ্য আড়ম্বরের জন্য উচ্চপদে নিযুক্ত হয়ে প্রচুর বেতন পেয়ে থাকে। তাদের যোগ্যতার তুলনায় তারা অধিকতর প্রতিপত্তি লাভ করে।

কাঁচা মিঠে আম—পাকিলে পানশে—কোনো কোনো ব্রিটিশ রাজকর্মচারী প্রথম এদেশে আসবার সময় সহৃদয় আচরণ করে, কিন্তু পরে তাদের আচরণে সহৃদয়তা বা সৌজন্য থাকে না। তারা হয়ে পড়ে আত্মকেন্দ্রিক ও উদ্ধত।

কিয়ৎক্ষণ সেলাম জলে ইত্যাদি—ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের তোষামোদলুব্ধতার প্রতি কটাক্ষ বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্রও করেছেন। 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' বা 'লোক-রহস্যে'র কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

কলাগাছের সহিত তুলনা—কলাবৌয়ের দৃষ্টান্তে লজ্জাশীলতার দিক থেকে স্ত্রী-জাতিকে কলাগাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে।

গেছো কথা—বাঁদুরে কথা; মূর্খের উক্তি।

উভয়েই বানরের প্রিয়—সম্ভবত যারা নারীর রূপলুব্ধ, কমলাকান্ত তাদের বানর বলতে চেয়েছেন। উক্তিটি তীক্ষ্ণ হলেও সত্য।

মাকাল ফলকেই ইত্যাদি—গুণহীন, রূপমাত্র সার, এই হিসাবেই মাকাল ফলের সঙ্গে তুলনা।

কাঁদি কাঁদি পাড়ে না—অর্থাৎ বহু বিবাহ করে না। এখানে কুলীন ব্রাহ্মণদের বহু বিবাহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ব্যবসায়ী নাহলে—নারিকেল ব্যবসায়ী একসঙ্গে কাঁদি কাঁদি নারিকেল পাড়ে। যে

সব কুলীন ব্রাহ্মণ বহু বিবাহ করে, কমলাকান্ত তাদের 'বিবাহ-ব্যবসায়ী' বলে অভিহিত করেছেন। নাট্যকার রামনারায়ণ এদের বলেছেন, 'বিবাহ বণিক'।

করকচি বেলা—নারবেলের এই প্রথমাবস্থা নারীর কিশোরী-দশার সঙ্গেই উপমিত হয়েছে।

ডাবই ভাল—করকচি, ডাব, আর ঝুনো, বঙ্কিমের পরিকল্পনায় হয়েছে কিশোরী, যুবতী ও গৃহিণীর প্রতীক স্থানীয়। উভয় ক্ষেত্রে মধ্যম দশাই সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে তৃপ্তিকর।

বড় তপ্ত—নবোদ্ভিন্নযৌবনা নারীর মধ্যে যে তেজ থাকে, তা শিক্ষার গুণে সংহত না হলে অনিষ্ট সাধন করতে পারে। বস্তুতঃ, যৌবনের মধ্যেই একটা প্রবল আবেগ আছে। এই আবেগ সংযত না করলে ক্ষতিসাধন করতে পারে।

কলিজা পুড়িয়া যাইবে—সংসারের শিক্ষা বা বোধ না থাকলে নারীর প্রেম অনেক সময় পুরুষের জীবনে দুঃখ বহন করে আনে। সংসার-শিক্ষাশূন্যা নারীর প্রেম যে পুরুষের হৃদয়কে দগ্ধ করে ও সংসারে দাবদাহ সৃষ্টি করে তা বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে কুন্দনন্দিনী ও নগেন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন।

উভয়ই বড় স্নিগ্ধকর—নারীর প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের এই মনোভাব অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের। মাতা, পত্নী বা কন্যারূপে নারীর স্নেহ, প্রেম ইত্যাদির চিত্র বা গৌরব বর্ণনা আমার পূর্বতন সাহিত্যে পাই বটে, কিন্তু নারীর হৃদয় যে কীভাবে পুরুষের জীবনকে স্নিগ্ধ ছায়ায় আবৃত করে রাখে, সে সম্বন্ধে কোন সচেতন ধারণা আমরা এই সময় পাই না। ঊনবিংশ শতাব্দী পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসবার পর থেকে বাংলাদেশে যে মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব হয়, তাতেই নারীর মূল্য ও মর্যাদা বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম জীবনের সাহিত্যগুরু কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নারী-বিদ্বেষ এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।—পাশ্চাত্য সাহিত্যের গভীরতর অধ্যয়নের ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের চেতনায় নারীসম্পর্কীয় বোধটি পরিপুষ্ট হয়েছিল। তাঁর উপন্যাসগুলিতেও নারীচরিত্র বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে।

ডাবের বেলায় বড় সুমিষ্ট বড় কোমল—বঙ্কিমচন্দ্র যুবতীর বুদ্ধিকে অস্বীকার করেননি, অথচ তা যে পরিণত, এমন কথা বলেননি। তথাপি যুবতীর বুদ্ধি কোমল ও মধুর।

অজীর্ণ রোগে রাত্রে নিদ্রা হয় না—টাকা ফেরত দিবার দুশ্চিন্তার সঙ্গে থাকে গৃহিণীর গঞ্জনা। এতে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে।

আমখানা বৈ পুরা দেখিতে পাইলাম না—বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই অভিমত প্রকাশ করেন, তখন পাশ্চাত্য দেশে সবে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার হচ্ছে। স্ত্রীলোকের বিদ্যা তখন পরিণতি লাভ করবার সুযোগ লাভ করেনি। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রয়োগ না করা হলে শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয় না।

দুই মালার মাপে—বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবত বলতে চেয়েছেন যে, স্ত্রীলোকের বিদ্যা

সম্পূর্ণ ব্যক্ত হয় না। স্ত্রীলোক পুরুষের মতো ধরনে রচনা করেছেন মাত্র, কিন্তু বিদ্যার পরিচয় সেখানে সম্পূর্ণ নয়।

দুই বড় অসার—কমলাকান্ত নারীর স্নেহকেই সবচেয়ে বেশি মর্যাদা দিয়েছেন। তারপর বুদ্ধির স্থান। স্ত্রীজাতির বিদ্যাকে তিনি বিশেষ মূল্য দেননি—নারীর রূপকে তিনি অসার এবং ক্ষতিকর বলেই বর্ণনা করেছেন।

অনেক নরহত্যা নিবারণ হইবে—নারীর রূপে লুব্ধ হয়ে অনেকে অনেক দুষ্কর্ম করেছে। প্রণয়ে হতাশ হয়ে অনেকে মৃত্যুবরণ করছে। সুতরাং নারীর রূপজ আকর্ষণ-সৃষ্টি যাতে সংযত হয় এমনভাবে যদি আইন করা হয় তবে অনেক প্রাণ বেঁচে যাবে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সবগুলি উপন্যাসের মধ্যেই নারীর রূপই অনর্থ ঘটিয়েছে। শৈবলিনী, রোহিণী, কুন্দনন্দিনী ও লবঙ্গলতা এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

বিশ্বেশ্বরকে দিবেন—কোনো ফল বিশ্বেশ্বরকে দেওয়ার অর্থ সেই ফল আর জীবনে ভোগ করা হয় না। কমলাকান্ত নারিকেল ফল শিবকে নিবেদন করছেন, সুতরাং কখনও দার পরিগ্রহ করা তাঁর হবে না।

শিমুল ফুল ভাবি—দেশহিতৈষীরা ভড়ং করে অনেকে বড়ো বড়ো কথা বলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে দেশাত্মবোধ পূর্ণভাবে জাগ্রত হয়নি। সুতরাং অনেকেই দেশহিতৈষণার নামে আত্মপ্রচারণাই করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই সব বাক্‌সর্বস্ব আত্মকেন্দ্রিক দেশ-হিতৈষীদের বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখেননি।

নেড়া গাছে—সম্ভবত সারা বাংলাদেশে তখন রাষ্ট্রীয় চেতনার দিক থেকে যে ব্যাপক অজ্ঞতা ছিল, এখানে তারই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

খানিক তূলা বাহির হইয়া ইত্যাদি—তথাকথিত দেশহিতৈষীরা অন্তঃসারহীন কথার স্তূপ ছাড়া আর কিছুই সৃষ্টি করতে পারেন না।

বড় বড় বচনে—স্মৃতির বিধান-সম্পর্কীয় উক্তিগুলিই এখানে কমলাকান্তের লক্ষ্য। স্মৃতির অনেক অংশই যে সমাজ-জীবনের আকৃতি ও প্রকৃতির পরিবর্তনের ফলে কালবারিত হয়ে গিয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র তা উপলব্ধি করেছিলেন। ভট্টপল্লীর এক প্রান্তে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি স্মৃতিশাস্ত্রকে বিশেষ মূল্য দেননি। পাশ্চাত্য সমাজবিধি ও আইনের জ্ঞানও স্মৃতিশাস্ত্রের প্রতি উপেক্ষার কারণ হতে পারে। যুগের উপযোগী হয়ে না ওঠার জন্য বহু শত বৎসরের পুরাতন শাস্ত্র যে কণ্টকময় ধুতুরার ফল প্রসব করবে, তাতে বিচিত্র কি।

প্রবন্ধ-গাঁজার মধ্যে ইত্যাদি—প্রবন্ধের মধ্যে আড়ম্বর সৃষ্টির জন্য সংস্কৃত শ্লোকাদি উদ্ধারের রীতিকে বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ সুনজরে দেখেননি। অকারণ উদ্ধৃতি প্রবন্ধের মধ্যে বাগ্‌জাল বিস্তার অযথা আড়ম্বর সৃষ্টি করে মাত্র।

আমাদের দেশে লেখকদিগকে ইত্যাদি—অনেক লেখক অক্ষমতাবশতঃ যে বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করে, তাকেই বিকৃত করে ফেলে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে শিব গড়তে বানর গড়ার দৃষ্টান্তগুলি সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের কঠোর নিন্দার ভাগী হয়েছে।

সাক্ষাত বাণ্ঠাবতার... সমালোচনার আগুনে পোড়েন ভাল ইত্যাদি—অন্তঃসারহীন সাহিত্য-সমালোচনায় অসার রূপে প্রতিপন্ন হয়।

ফয়জন্ত জাতিতে... অমৃত—এই অংশের বাঙ্‌নির্মিতি বড়োই উপভোগ্য। হয়ত এখানে বঙ্কিমের প্রধান লক্ষ্য সাহেবী খানায় আসক্ত এদেশীয় বাবুদের রুচিবিকার ও ভোজনবিলাসের প্রতিই কটাক্ষ করা, কিন্তু সেইসঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে এই সাহিত্যিক সত্য যে ইংরেজি সাহিত্য বিদেশীয় বিজাতীয় হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যরস হিসাবে তা অমৃততুল্য,- যার পাশে তখনকার বাংলা সাহিত্য তেঁতুলের মাছ-ভাতে সেব্য এক নিকৃষ্ট খাদ্য বিশেষ।

ইহারা পৃথিবীর কুষ্মাণ্ড—বঙ্কিমচন্দ্র নিজে হাকিম ছিলেন, কার্যোপলক্ষে তাঁকে দেশী হাকিমের সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই হাকিম সম্পর্কে তিনি এই বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

বিলাতী কুমড়া—যারা এ দেশীয় হয়েও আঠারো আনা সাহেবিভাবাপন্ন, কমলাকান্ত তাদের 'বিলাতী কুমড়া' বলেছেন।

সর্বাপেক্ষা অকর্মণ্য কদর্য টক—কমলাকান্ত নিজেকেও বাদ দেননি। নিজেকে টক নিকৃষ্ট ফল বলে অভিহিত করেছেন; সুতরাং পূর্বোক্ত কোনো মন্তব্যেই আর কারও রুষ্ট হওয়ার কারণ রইল না। নিজেকে নিয়ে উপভোগ্য ব্যঙ্গ করবার এই প্রবণতা শেকস্‌পীয়র ও চার্লস্‌ ল্যামের রচনায় পাওয়া যায়।।

তৃতীয় সংখ্যা

ইউটিলিটি বা উদরদর্শন

সারকথা ও সমালোচনা ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা এদেশে প্রচলিত হয়, পাশ্চাত্য দর্শন তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। বস্তুত ইংরাজী শিক্ষার প্রথম যুগে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন এই তিনটি জিনিসই সবচেয়ে বেশি প্রসারলাভ করেছিল—এই তিনটি বিষয়ের মধ্য দিয়েই পাশ্চাত্য জগতের চিন্তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে কোমৎ, স্পেন্সার প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে বেন্থাম ও মিলও বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'গরিষ্ঠসংখ্যক লোকের জন্য মহত্তম মঙ্গল'—বেন্থাম প্রমুখ পাশ্চাত্য হিতবাদীদের এই হলো মূলনীতি। বঙ্কিমচন্দ্র এই আদর্শে পুরাপুরি বিশ্বাসী না হলেও এর উপর যে তাঁর কিছুটা আস্থা ছিল 'ধর্মতত্ত্ব' প্রথম খণ্ডের দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়ে তার পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যকে তিনি ধর্মের একটি ক্ষুদ্র অংশ বলে স্বীকার করেছেন। অবশ্য আলোচ্য রচনাটিতে বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য হিতবাদ দর্শনের অনুসরণ করেননি। পাশ্চাত্য হিতবাদ দর্শনের কথা স্মরণমাত্র করে একটি উদ্ভট দর্শন কল্পনা করে তার নাম

দিয়েছেন 'উদরদর্শন'। তাঁর এই দর্শনটির তিনি সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের রীতিতে প্রথমে সূত্র দিয়েছেন তারপর তার ভাষ্য রচনা করেছেন। বস্তুত, এই ভাষ্য কৌতুক রসের বাহনমাত্র।

রচনাটির প্রারম্ভে কমলাকান্ত বেন্থামের হিতবাদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, তিনি নিজেও একজন দার্শনিক এবং হিতবাদ দর্শন অবলম্বন করে নূতন একটি দর্শন-শাস্ত্র রচনা করেছেন। তিনি সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের অনুসরণে সূত্র এবং ভাষ্য প্রণয়ন করেছেন এবং নিজে সংস্কৃতজ্ঞ হলেও বঙ্গভাষাভাষীদের বুঝবার সুবিধার জন্য বাংলা ভাষাতেই রচনা করেছেন।

কমলাকান্ত উদরদর্শনে সাতটি সূত্র রচনা করেছেন। প্রথম সূত্রে তিনি জীব-শরীরস্থ বৃহৎ গহ্বরবিশেষকে উদর বলে নির্দেশ করেছেন। ভাষ্যে নাক কান বা পর্বতগুহাদিকে উদর আখ্যাদানের প্রতিষেধ করেছেন এবং কোনো কোনো স্থানে যে অঞ্জলিও বুঝায় তা জানিয়েছেন। দ্বিতীয় সূত্রে কমলাকান্ত উদরের ত্রিবিধ পূর্তিই পরমার্থ বলে তৃতীয় সূত্রে আধিভৌতিক পূর্তিকেই বিহিত করেছেন।[১] দ্বিতীয় সূত্রের ভাষ্যে তিনি আহারকে আধিভৌতিক পূর্ত, ধনীর বাক্যে প্রত্যাশাকে আধ্যাত্মিক পূর্তি এবং প্লীহা-যকৃৎ প্রভৃতির বৃদ্ধিকে আধিদৈবিক পূর্তি বলেছেন।

চতুর্থ সূত্রে বিদ্যা, বুদ্ধি, পরিশ্রম, উপাসনা, বল ও প্রতারণা এই ছ'টিকে পূর্ব পণ্ডিতদের মতে পুরুষার্থের উপায় বলে উল্লেখ করে পঞ্চম সূত্রে এই উপায়গুলি দিয়ে যে পুরুষার্থ-সাধন অসাধ্য, তা প্রতিপন্ন করেছেন। চতুর্থ সূত্রের ভাষ্যে তিনি উপায় ছ'টির অভিনব ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কমলাকান্তের মতে বিদ্যা বাংলার স্বতঃসিদ্ধ, তজ্জন্য লেখা-পড়া শিখবার প্রয়োজন নেই. বুদ্ধি সকলের মধ্যেই পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। আহার-নিদ্রাদিই পরিশ্রম, গুণীর গুণকীর্তন. উপাসনা. হাঁক-ডাক ও অঙ্গভঙ্গী, বল, এবং বিক্রয়, চিকিৎসা ও ধর্মোপদেশই প্রতারণা। পঞ্চম সূত্রের ভাষ্যে তিনি এই ক'টি দিয়ে যে উদরপূর্তি অসম্ভব, একে একে তার উদাহরণ দিয়েছেন।

কমলাকান্ত ষষ্ঠ সূত্রে হিতসাধনকেই পুরুষার্থের একমাত্র উপায় বলে নির্দেশ করে সপ্তম সূত্রে সকলকে দেশের হিতসাধন করতে নির্দেশ দিয়ে তাঁর দর্শনের সঙ্গে হিতবাদ দর্শনের ঐক্য প্রতিপাদন করেছেন। ষষ্ঠ সূত্রের ভাষ্যে তিনি হিতসাধনের অভিনব দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

পাঠ প্রসঙ্গে—ইউটিলিটি —এই শব্দটির সম্ভাব্য অর্থ করে ভীষ্মদেব খোশনবীশ যে মন্তব্য করেছেন, তা উপভোগ্য হয়েছে। কমলাকান্তকে 'দুর্বৃত্ত দশানন লম্বোদর গজানন' বলে অভিহিত করাও কৌতুকাবহ।

বাঙ্গালায় প্রচলিত —কমলাকান্ত এখানে বাংলাদেশের কথাই বলতে চেয়েছেন। তাঁর দর্শনের ভাষ্য বা ব্যাখ্যা করবার সময় তিনি বাংলাদেশ থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন।

১। অন্ন, ব্যঞ্জন, সন্দেশ, মিষ্টান্ন প্রভৃতির ভৌতিক সামগ্রীর দ্বারা উদরের যে পূর্তি হয়, তা হলো আধিভৌতিক পূর্তি।

বাংলাদেশে হিতবাদ দর্শনের ব্যবহারিক প্রয়োগ প্রচলিত—কমলাকান্ত তাকে একটা শাস্ত্রানুগত রূপ দান করেছেন এই মাত্র।

আমি যে অসংস্কৃতজ্ঞ ইত্যাদি—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলাদেশে সংস্কৃতশাস্ত্রে জ্ঞানই পাণ্ডিত্যের একমাত্র নিদর্শন ছিল। কমলাকান্ত বাংলায় দর্শন রচনা করেছেন বলে পাছে লোকে তাঁকে সংস্কৃত ভাষার অনভিজ্ঞ বলে, এইজন্য তিনি প্রথমেই বলে রাখছেন যে, তিনি সংস্কৃত ভাষা জানেন।

ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলাদেশে তর্কবিদ্যার বিশেষ প্রসার ঘটেছিল। মধ্যযুগের সংস্কৃত পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁরা ভাষ্য গ্রন্থ বা টীকা রচনা করেছেন, তাঁরা প্রতিপদেই প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে এক-একটি শব্দ নিয়ে কূটতর্কের অবতারণা করতেন। এখানে কমলাকান্ত কৌতুকবশে ভাষ্য-রচনার ঐ রীতির এক parody রচনা করেছেন। উদরের সংজ্ঞা নির্দেশ এবং নাক, বদন বা পর্বতের গুহাকে উদর বলে ভুল করবার কল্পনা দর্শনশাস্ত্রের রীতিতে অভিজ্ঞ অনভিজ্ঞ উভয়েরই কাছে কৌতুকাবহ বলে মনে হবে। তিনি নৈয়ায়িকের পদ্ধতিতে ভাষ্য রচনা করেছেন।

অঞ্জলি পুরাইতে হয় কমলাকান্তের উদ্ভাবনী শক্তি প্রশংসনীয়। উদরের ন্যায় অঞ্জলিও অর্থে পূর্ণ করতে হয়।

সাংখ্যেরও এই মত– সাংখ্য আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই তিন প্রকার দুঃখের কথা বলে। ত্রিবিধ দুঃখের সম্পূর্ণ বিরতি হলেই পরমপুরুষার্থ অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয়, এই তত্ত্ব প্রতিপাদন করেছে। কমলাকান্তের উদর-দর্শনে অবশ্য উদরের ত্রিবিধ পূর্তিকেই পরমপুরুষার্থ বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আধ্যাত্মিক উদর পূর্তি হয়– বড়োলোকদের আশাপ্রদ বাক্য শুনলে মনে যে আশার সঞ্চার হয় তাতে মন কতকটা শান্ত হয় বটে, কিন্তু বাস্তবে কোনো লাভ হয় না। কেননা তাঁরা অভাব দূর করে না। কমলাকান্ত একে আধ্যাত্মিক উদরপূর্তি বলে কৌতুক করেছেন।

বিদ্যা বাঙ্গালার স্বতঃসিদ্ধ –অনেকে বিশেষ কিছু পড়াশোনা না করেই নিজেকে শিক্ষিত বলে মনে করে। বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যখন শিক্ষার প্রসার সীমাবদ্ধ ছিল, তখন অনেকে যৎসামান্য শিক্ষালাভ করেই নিজেদের সুপণ্ডিত বলে প্রচার করতো। কমলাকান্তের মুখ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সেই পণ্ডিতম্মন্য স্বল্পবিদ্যার অধিকারীদের আক্রমণ করেছেন। অশিক্ষিত ধনীর প্রগল্ভ পাণ্ডিত্যের বড়াইয়ের প্রতি কটাক্ষ তাঁর অন্য রচনাতেও আছে।

যে আশ্চর্য শক্তি দ্বারা ইত্যাদি– বুদ্ধির সংজ্ঞাটি অভিনব ও বিশেষ কৌতুকজনক। অপরকে বুদ্ধিহীন এবং নিজেকে বুদ্ধিমান বলে মনে করার যে ধারণা সকলেরই আছে, কমলাকান্ত তাই নিয়ে মৃদু কৌতুক করেছেন।

উপযুক্ত সময়ে ঈষদুষ্ণ ইত্যাদি লেখক সুকৌশলে সাধারণ গৃহস্থ বাঙালীর সুখলালিত জীবনকে ব্যঙ্গ করেছেন। উপযুক্ত সময়ে ঈষদুষ্ণ অন্নব্যঞ্জন ভোজন,

তৎপরে নিদ্রা, বায়ুসেবন, তাম্রকুট ধূম্রপান, গৃহিণীর সঙ্গে সম্ভাষণ ইত্যাদি কার্য সম্পাদনের নাম পরিশ্রম। অবস্থাপন্ন বাঙালীদের মধ্যে অনেকেই কমলাকান্ত-কথিত পরিশ্রম ছাড়া আর কিছুই করত না, বা এখনও অনেকে করে না।

কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন কথা ইত্যাদি - গুণহীন ও গুণবানের দোষ বা গুণ-কীর্তনের সংজ্ঞাগুলি মনোজ্ঞ হয়েছে।

বল—কমলাকান্ত বলের যে কটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তা বিশেষ করে সাধারণ বাঙালীর কথাই মনে করিয়ে দেয়। বাঙালীর বল কেবল মুখে, এইরকম প্রসিদ্ধি আছে। সে হস্তপদ ব্যবহার করলে কিল, চড় বা লাথি দেখানো ছাড়া আর কিছুই বিশেষ করে না। উত্তেজিত হলে তার মুখে হিন্দী ও ইংরাজি ভাষা বেরিয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত এ-যুগেও ভুরি ভুরি দেখা যায়। পলায়নকে বলরূপে কল্পনা কৌতুকাবহ। ষড়্‌বিধ বলের মধ্যে রোদন, প্রহার-সহিষ্ণুতা ও দ্বেষ-হিংসা প্রভৃতি 'অহিংসা' বলপ্রয়োগের কল্পনাও কমলাকান্তের উপভোগ্য রসিকতার নিদর্শন।

প্রতারণা দোকানদার যে ঠকায় এবং চিকিৎসক যে অনর্থক ফাঁকি দিয়ে টাকা নেয়, এ ধরণা খুবই প্রচলিত। বাস্তবিকপক্ষে যাতে অপরে না ঠকায় বরং পারলে অপরকে ফাঁকি দিয়ে নিজে লাভবান হই—এই চিন্তাটি সাধারণ মানুষের অনেকের মধ্যেই দেখা যায়। ধর্মোপদেষ্টা বা ধার্মিককে ভণ্ড বলে লেখক সাধারণ লোকের ধারণার হীনতার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। ধার্মিক যে বিনা কারণে এবং প্রতিদানের প্রত্যাশা না করে অপরকে উপদেশ দিতে পারে হিসাবী লোকের কাছে তা চিন্তার অগোচর—সুতরাং সে ধর্মোপদেষ্টাকে প্রতারক বলেই সন্দেহ করে।

বিদ্যাতে যদি ইত্যাদি বাংলাদেশের সংবাদপত্রের অবস্থা বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে বিশেষ উন্নত না হলেও এখানে তিনি অল্পশিক্ষিত সম্পাদকদের পত্রিকাগুলিকে কটাক্ষ করে এই উক্তি করেছেন বলেই মনে হয়।

মন্দ পে-বিল লিখি নাই—নাগা ফকিররা সাহেবের কাছে ভিক্ষা চাইছে এই ছবি এঁকে পে-বিল তৈরি করায় কমলাকান্ত যথার্থ গুণবান সাহেবের গুণ প্রকাশ করে উপাসনাই করেছিলেন। কিন্তু তা সাহেবের পছন্দ না হওয়ায় কমলাকান্ত ক্ষুব্ধ।

হিতসাধনের দ্বারা সাধ্য এই সূত্রটির ভাষ্যে কমলাকান্ত পরের মঙ্গলসাধনের নামে যারা নিজেদের হিতসাধন করে তাদের আক্রমণ করেছেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা যজমানের মঙ্গলের জন্য মন্ত্র দেন বা পূজাদি করেন, কিন্তু আসলে এই সব পন্থায় নিজেদের উদর পূরণ করেন। ইউরোপীয় জাতিরা অসভ্যদের উন্নয়নের নাম করে নিজেদের অধিকার বিস্তার করেন। লেখকেরা পরের জ্ঞান বা আনন্দের জন্য পাঠ্য বা অপাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করে অর্থবান হয়েছেন। পরের হিতসাধন উপলক্ষ মাত্র, নিজের উদর-পূর্তিই লক্ষ্য।

সপ্তম দর্শন—সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা এই ছ'টি প্রধান দর্শন।

চতুর্থ সংখ্যা

পতঙ্গ

সারকথা ও সমালোচনা কাম্যবস্তুর স্বরূপ জানতে পারলে আর মানুষের কোনো সুখ থাকে না। এই সংসারে মানুষের কাম্য অশেষ বিধ,— জ্ঞান ধন, মান, রূপ, ধর্ম, ইন্দ্রিয়সুখ ইত্যাদি। অথচ এই জ্ঞান, ধর্ম প্রভৃতির স্বরূপ কী, তা কেউ জানে না। জানে না বলেই বুঝি এদেরই আকর্ষণে সর্বশক্তি নিয়োগ ক'রে, এমনকি শরীর পাত করে লোকে যেন কতোই সুখ পায়। এই দুর্নিবার আকর্ষণ-বহ্নি জ্বলছে বিশ্বময়, আর বিচিত্র কামনার মানুষ আমরা সেই বহ্নিতে পুড়ে ম'রবার জন্য তার চারদিকে ঘুরে মরছি অসংখ্য পতঙ্গের মতো। তাই 'পতঙ্গ'-শীর্ষক নিবন্ধটির সার কথা হলো, এ সংসার বহ্নিময়, মনুষ্যমাত্রেই পতঙ্গ। কিন্তু পুড়ে মরা তো সকলের হয় না, ঘুরে মরে সকলেই, কিন্তু সকলেই পুড়ে মরে না। এর কারণ, সেজবাতি যেমন একটা কাচের আবরণে আবদ্ধ থাকে, তেমনি পূর্বোক্ত বিচিত্র বহ্নিগুলিরও যেন একটা বাহিরে আবরণ দেওয়া আছে, যাতে প্রতিহত হওয়ায় আর পুড়ে মরা হয় না। এই হিসাবে, এ সংসার, যেমন বহ্নিময় তেমনি আবার কাচময়। কাচ না থাকলে সংসার এতদিনে পুড়ে ছারখার হয়ে যেতো। পুড়ে মরার দৃষ্টান্তের মধ্যে যেমন আছেন চৈতন্যদেব, সক্রেতিস, গ্যালিলিও বা সেণ্ট পল প্রমুখ মহামানব, তেমনি আছে প্রাচীন কাব্যগ্রন্থে বর্ণিত বিবিধ চরিত্র। বহ্নির দাহ বুঝি সবলেই ভোগ করে, তবে যে সবলেই পুড়ে মরে না, সে শুধু ঐ আবরণের জন্য। অর্থৎ জ্ঞান-বহ্নি, রূপ-বহ্নি, ধন-বহ্নি, বা মান-বহ্নি, যে-কোন কামনারই বহ্নি হোক না কেন, তার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-বিলোপ সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে ঘটে না, যেহেতু সংসার-জীবনের অপরাপর দায়-দায়িত্ব-পালনের কর্তব্য তাকে ঐ বিলোপের হাত থেকে রক্ষা করে।

এই যে জীবন-সমীক্ষা, এইটাই 'পতঙ্গ' নিবন্ধে রূপক বা প্রতীকের আশ্রয়ে ব্যক্ত হয়েছে। পতঙ্গ, আলো ও কাচ এই তিনটি সাঙ্গিককে ও প্রতীকে কমলাকান্ত-রূপী বঙ্কিম তাঁর বক্তব্যের আসর সাজিয়েছেন। পতঙ্গ মানুষমাত্রেই আলো বা বহ্নি ধন-মান-রূপ-জ্ঞান-ধর্ম্ম ইত্যাদি, আর কাচ বা আবরণ হলো সেই সব প্রভাব যার জন্য সাধারণ মানুষ একেবারে আত্মবিস্মৃত হয়ে স্ব স্ব কামনার আগুনে ঝাঁপ দিতে পারে না।

'পতঙ্গ' দপ্তরটি বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্ভাবনী শক্তির উৎকৃষ্ট পরিচয় বহন করে। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হবে, অভিনব একটা কিছু সৃষ্টির জন্য নিতান্তই এক উদ্ভট খেয়ালের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। কিন্তু খেয়ালী কল্পনার মধ্যে যখনই বঙ্কিম দিব্যদৃষ্টির আলোটি জেলে দেন, অমনি আমরা দেখতে পাই, আপাতত যাকে নিরতিশয় লঘু

কল্পনার বিলাস মনে হয়েছিল, তার অন্তরালে লুকিয়ে আছে এক গভীর সত্য। একটু অনুধাবন করলেই দেখা যায়, বঙ্কিমের সৃজনী কল্পনাই সক্রিয় রয়েছে এই দপ্তরের পরিকল্পনামূলে—খেয়ালী কল্পনা সৃজন ব্যাপারে সহায়ক হয়েছে মাত্র। বাইরের কল্পনার রঙীন ছাঁচটি অন্তর্লীন সত্যে উপনীত হওয়ার একটা পথ মাত্র।

বস্তুত কমলাকান্তের দপ্তরে এই ছাঁচের বৈশিষ্ট্যই সাধারণ রস-সন্ধানী পাঠকের প্রধান আকর্ষণ। এই দিক থেকে 'পতঙ্গ', 'বিড়াল-ঢেঁকি-মনুষ্যফল-বড়বাজার' এর সমশ্রেণীর রচনা। এদের প্রত্যেকটি মননসমৃদ্ধ, রূপকাত্য, হাস্যরসাত্মক রচনা। 'একা', 'একটি গীত', 'আমার দুর্গোৎসবে'র মন্ময়তা বা গীতিমূর্ছনা এখানে নেই, যদিও প্রথম দুটির মধ্যে যেমন একটা জীবন-ভাষ্য আছে, অবিকল এক না হলেও, এখানেও আছে একটা জীবন-ভাষ্য। এখানকার হাস্যরস যত না ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-সঞ্জাত, তত কৌতুক-সঞ্জাত। এ কৌতুকের মূল আঙ্গিক রচনায়, পট ভূমিকা-সৃষ্টিতে, ও বিশেষত পতঙ্গের বক্তৃতাভঙ্গীতে। দ্বিতীয়ার্ধের কথাগুলিতে কৌতুকের স্পর্শটি সত্যের চাপে আর মনে বড় একটা দাগ কাটতে চায় না। তত্ত্বের গভীরতায় হাস্যরস এখানে নিয়ন্ত্রিত। তা' ছাড়া বহ্নির রূপকটিতে প্রয়োগের ক্ষেত্রে সর্বত্র সমান ব্যঞ্জনাধর্ম বজায় থাকেনি। চৈতন্যদেব বা সক্রেতিস-গ্যালিলিওর পুড়ে মরার কথায় আমরা বুঝি এই পুড়ে-মরা মহাভাগ্যের কথা। লেখকও এরই সমর্থনে আবরণ-কাচের ভূমিকার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ধর্ম বা জ্ঞান-বহ্নির দাহ, আর রূপ-ধন-মান-ভোগ-বহ্নির দাহ কখনই একজাতীয় হতে পারে না। এই শেষোক্ত শ্রেণীর দিকে লক্ষ্য রেখেই বলা যায়, এ সংসার বহ্নিময়। প্রথমটি মহামানবদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, পরেরটি সর্বসাধারণের। আবার, কাচ-আবরণের জন্যই সংসার রক্ষা পায়—এই পরিকল্পনার যৌক্তিকতা এখানে যে কেবল বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই কামনা-বহ্নিতে লোক পুড়ে মরে, অধিকাংশ মানুষ ঐ চরম পরিণাম এড়িয়ে যেতে পারে। তবে যে দৃষ্টিতে এ্যান্টান ক্লিওপেট্রা বা বিদ্যাসুন্দর বা দুর্যোধন অথবা নসীরামবাবু পতঙ্গ, সে দৃষ্টিতে চৈতন্যদেব-সক্রেতিস-গ্যালিলিও-সেণ্ট পলবেও পতঙ্গ বলে এক শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। তাঁরাও পতঙ্গ, কিন্তু উচ্চতর শ্রেণীর।

পাঠ প্রসঙ্গে—দলাদলিতে চটিয়া সামান্য বিষয় নিয়েও যে বাঙালী দলাদলি করে, বঙ্কিমচন্দ্র সেই ইঙ্গিত করেছেন বলে মনে হয়। কমলাকান্ত আফিমখোর ভালোমানুষ, দলাদলি তাঁর বিশেষ পছন্দ নয়। তাই দলাদলির কথা শুনে তিনি চটেছেন।

অনাদি ক্রিয়া-পরম্পরার একটি ফল—আফিমের মাত্রা চড়িয়ে ফেলার মতো একটা তুচ্ছ খেয়ালের কারণ নির্ণয়ের জন্য তর্কশাস্ত্রের যুক্তিজাল বিস্তারের ঘটা দেখিয়ে বঙ্কিম মার্জিত হাস্যরসের সুযোগ করে নিয়েছেন। কমলাকান্তের আফিমের মাত্রা বাড়িয়ে তোলা পৃথিবীর কার্য-কারণ সম্পর্কের ফল মাত্র।

দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইলাম আফিমের প্রসাদে কমলাকান্ত প্রায়ই দিব্য চক্ষু ও দিব্য কর্ণ লাভ করতেন।

আমাদের রাইট আছে—পাশ্চাত্য দেশে সামাজিক বা রাজনৈতিক অধিকার

সম্পর্কে যে ঘোষণা হয় বঙ্কিমচন্দ্র পতঙ্গের মুখে সেই অধিকারের দাবি পেশ করেছেন। বহুকাল ধরে যা করা হয়েছে তার ওপর একটা অধিকার জন্মে যায়। পতঙ্গ সেই অধিকারের কথা বলছে। এইভাবে পুড়ে মরবার অধিকার ঘোষণা অভিনব সন্দেহ নেই।

আমরা কি হিন্দুর মেয়ে ইত্যাদি—রামমোহনের প্রচেষ্টায় আইন করে সহমরণ প্রথা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো। হিন্দুর মেয়ে সহমরণে পুড়ে মরতে পায় না বলে পতঙ্গও কি পুড়ে মরতে পারবে না? বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যযুগের সতীদাহ-প্রথার প্রতি কটাক্ষ করেছেন। এই ছত্রে এবং পরের দু'টি অনুচ্ছেদে স্ত্রীজাতির তুলনায় পতঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কৌতুকজনক।

তাহাতে কি সুখ - এখানে পতঙ্গের মনোভাবটি ব্যক্ত হয়েছে। তার কাছে যা একান্ত কামনার জিনিস নয় তা অসার বলে মনে হয়েছে। যে যাতে নিবিষ্টচিত্ত, তা ভিন্ন অপর বিষয়ে তার আকাঙ্ক্ষা বিশেষ থাকে না। যে যার জন্য উৎসুক, তাই তার কাছে একমাত্র আনন্দের নিদান।

দিব বৈ ত গ্রহণ করিব না—'পতঙ্গের বহ্নিতে আত্মসমর্পণ করে জ্বলে মরার সুখ ব্যতীত সে আর কিছুই চায় না। মানুষও যার জন্য পাগল, তার জন্য আপনার সর্বসুখ বিসর্জন দেওয়া ছাড়া তার আর কিছু কাম্য নেই। যে ধনের জন্য পাগল, সে ধন চায় বটে, কিন্তু পরিমিত ধন পেলেই তার আশা মেটে না—অপরিমিত ধনের অধিকারী হয়েও সে অর্থের সন্ধানে ফেরে, বস্তুত, ধন তার কাম্য নয়, সে ধন দিয়ে ধন-বহ্নিকে প্রজ্বলিত করে।

তুমি আমার বাসনার ইত্যাদি—মানুষ যা চায় তার সম্বন্ধেও এই কথা বলে। যা কামনার ধন তার স্বরূপ জানা হলেই তার প্রতি আগ্রহ চলে যায়। যতদিন পর্যন্ত তা অপরিজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত বা অধিক রহস্যাবৃত থাকে, ততদিন পর্যন্তই তার প্রতি আকর্ষণ থাকে। যা অতিপরিচিত, তার অভিনবত্ব আর থাকে না।

মনুষ্যমাত্রই পতঙ্গ, সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে—এইটাই এই রচনার মূল কথা। বঙ্কিমচন্দ্র পতঙ্গ ও বহ্নিকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করে মানুষের কোনো কোনো বিষয়ে দুর্মদ আকাঙ্ক্ষার কথা বলেছেন।

সংসার কাচময়—পতঙ্গ যেমন আলোর আগুনকে ঘিরে যে কাচ আছে, তাতে বাধা পেয়ে ফিরে আসে বলে পুড়ে মরে না, মানুষও তেমনই সংসারের নানা জিনিসে প্রতিহত হয় বলে বেঁচে যায়। একদিকে তার যেমন বিশেষ একটি দুর্নিবার কামনা থাকে, অন্যদিকে আবার এমন কয়েকটি বাধা থাকে যা ঐ বিশেষ কামনাটি থেকে দূরে টেনে রাখে।

যদি সকল ধর্মবিৎ চৈতন্যদেবের ন্যায় ইত্যাদি—মহাপ্রভু ভগবৎপ্রেমে উন্মাদ হয়েছিলেন। তাঁর গভীর অধ্যাত্মানুভূতিই এর কারণ। অপর ধর্মবেত্তাদের অনুরূপ ধর্মানুভূতি হলে তাঁদেরও উন্মাদ হতে হতো।

সক্রেতিস—প্রাচীন গ্রীসের জ্ঞানতপস্বী সক্রেতিসকে সত্য-জ্ঞান প্রচার করতে গিয়ে রাজপুরুষদের বিরাগভাজন হতে হয় এবং হেমলক বিষপানে প্রাণত্যাগ করতে হয়।

গেলিলিও—মধ্যযুগের বিজ্ঞানসাধক গ্যালিলিও যে বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচার করেন তা বাইবেলের বর্ণনার বিরুদ্ধ হওয়ায় ধর্ম্মযাজক ও রাজপুরুষদের হাতে তিনি নিগ্রহ ভোগ করেছিলেন।

মানবহ্নি সৃজন করিয়া—দুর্যোধন তাঁর প্রচণ্ড মানের জন্যই পাণ্ডবদের সঙ্গে বিরোধ বাধান। আর সেই মানের জন্যই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ এবং কুরু-বংশের বিনাশ।

জ্ঞানবহ্নিজাত দাহের গীত "Paradise Lost"—মানুষ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছিল; মিলটনের "প্যারাডাইস লস্ট" কাব্যে সেই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

ধর্ম্মবহ্নির অদ্বিতীয় কবি সেন্ট পল—ভগবদ্ভক্ত পল যীশুখৃষ্টের বাণী প্রচার করতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর সাধনায় ইউরোপে খৃষ্টধর্ম দৃঢ়মূল হয়।

ভোগবহ্নির পতঙ্গ "আণ্টনি, ক্লিওপেত্রা"—রোমক বীর আণ্টনি মিশরের বিলাসিনী রাজ্ঞী ক্লিওপেত্রার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁদের প্রণয়ের ফল বিষময় হয়েছিল। আণ্টনি যুদ্ধে প্রাণ দেন, কিন্তু ক্লিওপেত্রা সর্পদংশনে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন।

রূপবহ্নির "রোমিও ও জুলিয়েত"—শেক্সপীয়ারের সৃষ্ট "প্রেমিক প্রেমিকা", তারা প্রণয়াবদ্ধ হয়, কিন্তু অবশেষে উভয়ে মৃত্যুবরণ করে।

ঈর্ষাবহ্নির "ওথেলো"—নায়ক ওথেলো তার অসামান্যা প্রেমময়ী সাধ্বী পত্নী দেসডিমোনাকে যে স্বহস্তে হত্যা করে, তার মূলে ছিল প্রচণ্ড ঈর্ষাপ্রবণতা, তাই নিজের ভয়ংকর ভুল বুঝতে পারার পর তার সেই দাহ চরমে ওঠে, যার ফলে আত্মহনন ছাড়া আর পথ ছিল না।

গীতগোবিন্দ ইত্যাদি—এদেশের কাব্য কয়েকটি সম্পর্কে বঙ্কিমের স্বাধীন অভিমত বেশ লক্ষণীয়। গীতগোবিন্দে ইন্দ্রিয়-বহ্নির দাহ বর্ণিত হয়েছে।

তাহা কি কিছু জানি না ইত্যাদি—এই অংশে বঙ্কিমচন্দ্রের অধ্যাত্মদৃষ্টির গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে। অবাঙ্মনসোগোচর ঈশ্বরের সম্পর্কে এখানে বঙ্কিম তাঁর ধ্যান-ধারণা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। তাঁর অন্য কোনো রচনায় এতটা গভীর অনুভূতি আছে কি না সন্দেহ। ঈশ্বর, ধর্ম, স্নেহ প্রভৃতির সব কিছুকেই একটি অখণ্ড সত্যের অন্তর্গত করে দেখার মধ্যে তাঁর কবিকল্পনাই প্রাধান্য লাভ করেছে। ঈশ্বর অলৌকিক, অপরিজ্ঞাত পদার্থ, তথাপি তাঁকে লাভ করবার জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষা, প্রয়াস ও প্রকাশের শেষ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের পক্ষপাতী না হলেও দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্রাহ্মভক্তের চিন্তার সঙ্গে তাঁর অধ্যাত্মচিন্তার এই অংশটির সাজাত্য লক্ষণীয়।

আমরা পতঙ্গ না ত কি?—এখানে যে অর্থে মানুষকে পতঙ্গ বলা হয়েছে, তাতে দেখা যায় এই পতঙ্গত্ব অপরিহার্য। সুতরাং এই পতঙ্গ-পরিচয়ের মধ্যে কোনো শ্লেষ-কটাক্ষ কিছুই থাকতে পারে না।

পঞ্চম সংখ্যা

আমার মন

কথাসার ও সমালোচনা ঃ এই রচনাটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। (১) কমলাকান্তের মন চুরি হয়ে গেছে। চোরের সন্ধান আরম্ভ হবে, কিন্তু তার গোড়াতেই জানিয়ে দেওয়া হল যে কোনো সাধারণ চোর ঐ চুরি করেনি, আর সেই কারণে সাত-পৃথিবী খুঁজেও কমলাকান্ত সেই 'মনচোর' বার করতে পারেন নি। তবু কিন্তু খোঁজাখুঁজির একটা বিবরণ দেওয়া হয়েছে, আর সেই সূত্রে এসেছে পাকশালের কথা, প্রসন্ন গোয়ালিনী ও তার মঙ্গলা গাইয়ের কথা এবং এক রূপসী যুবতীর পিছু নেওয়ার কথা। (২) রহস্য ছেড়ে সত্য কথা বলার আয়োজন। মন কেন চুরি যায়? লঘুচেতাদের মনের বন্ধন চাই, আর সে বন্ধনের একটা সাধারণ রূপ হলো পরের কাছে মন বাঁধা দেওয়া। এরই আবার অত্যন্ত সহজ ও পরিচিত চিরাচরিত রূপটি হলো বিবাহ। কমলাকান্তের অবশ্য এই বিবাহ-জনিত প্রকৃত সুখ সম্পর্কে স্বতন্ত্র মন্তব্য আছে, সেটি শেষাংশে দ্রষ্টব্য। এখানে তিনি বলেছেন পরের জন্য আত্মবিসর্জন বা পরসুখবর্ধন ভিন্ন স্থায়ী সুখের অন্য কোনো মূল নেই। (৩) তৃতীয় অংশে এসেছে এদেশে প্রকৃত সুখের অভাবের কারণ বিশ্লেষণ, এবং সেই সূত্রে ইংরেজের আমদানী মেটিরিয়াল প্রস্পারিটি' বা বাহ্যসম্পদের প্রতি ও অর্থের প্রতি উৎকট লালসাবৃদ্ধির ফলে আমাদের দেশের সংস্কৃতিগত হৃদয়-প্রাধান্য ও প্রেমসম্পদ বিনষ্ট হওয়ার কথা। (৪) অমনি সঙ্গত কারণেই এসেছে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সভ্যতার তুলনা, একটি স্বার্থ-কেন্দ্রিক, আর একটি পরার্থ-কেন্দ্রিক। প্রথমটির জন্য রকমারি কল-কারখানা আবিষ্কৃত হচ্ছে; এখন কমলাকান্তের কথা হলো, যদি মানুষে মানুষে প্রণয়বৃদ্ধির কল আবিষ্কৃত হয় তবেই রক্ষা, নচেৎ সব বেকল হয়ে যাবে। (৫) শেষ কথা, কমলাকান্তের মন চুরি যাওয়ার ব্যাপারটা থেকে অপরে যেন সতর্ক হয়। তিনি যেন পরের বোঝা ঘাড়ে নেওয়ার ভয়ে সংসারী হননি, সুতরাং সুখে তাঁর কোনো অধিকার নেই; কিন্তু যারা বিবাহ করে সংসারী হয়েছে তারা কি সত্যিই সুখী হয়েছে? হয়নি, তার কারণ, সংসারের ক'জন মানুষ আর বুঝেছে যে, যে বিবাহ সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রতি প্রীতিবিস্তারের শিক্ষা না দেয় সে বিবাহ মিথ্যা, তার কোনো প্রয়োজন নেই।

প্রবন্ধটি বেশ লঘুভাবে শুরু হয়েছে এবং রীতিমত লঘুতরল পরিহাস-রসিকতার তরঙ্গে দোল খেয়ে এক স্তরে এসে গম্ভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছে। এই ছাঁচই আমরা লক্ষ্য করি আরও কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্যে খুব বেশি করে 'বিড়াল'-এ। 'বিড়ালে'র মতোই এর প্রধান লক্ষ্য সমাজের দিকে। 'বিড়ালে' সাম্যবাদের প্রতিধ্বনি, 'আমার মন'-এ প্রীতি-তত্ত্বের ব্যাখ্যা, যা 'একা' নিবন্ধটির কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু।

'বিড়াল'-এ সামাজিক অশান্তির একটা দিক মাত্র আলোচিত হয়েছে যা ধনবৈষম্য ও শ্রেণী-বিদ্বেষ সঞ্জাত। আমার মন-এ বৃহত্তর পরিধিতে সংসারী মানুষের প্রকৃত সুখের অভাব কি জন্য, তাই হয়েছে আলোচনার বিষয়। সুতরাং এখানকার সমাজ-সমীক্ষা জীবন-সমীক্ষায় রূপান্তরিত হয়েছে। এখানকার দার্শনিকতা 'বিড়াল'-এ নেই, আছে 'একা'য়। আবার 'একা'য় যে দার্শনিক জিজ্ঞাসা পাঠককে মুগ্ধ করে, 'বিড়াল'-এ তার নামগন্ধও নেই। মন-চুরির উপলব্ধিটাই রচনার মন্ময়তাসূচক। এ ছাড়া, মানুষ কবে নিত্য সুখের মূল অনুসন্ধান করবে এর জন্যে কমলাকান্তের ব্যাকুলতা, "আমি মরিয়া ছাই হইব, আমার নাম পর্যন্ত লুপ্ত হইবে কিন্তু আমার এ আশা একদিন ফলিবে"—ইত্যাদি ভঙ্গীতে ঐ বিষয়ে গভীর প্রত্যাশা-পোষণ অথবা "ফলিবে কিন্তু কত দিনে! হায়, কে বলিবে কত দিনে!" ইত্যাদিতে গভীর আকুতি, কিংবা "আমি কখন পরের জন্য ভাবি নাই, এইজন্য সকল হারাইয়া বসিয়াছি। সুখে আমার অধিকার কি?" ইত্যাদিতে কারুণ্যগর্ভ আত্মবিশ্লেষণ, এ সমস্তই প্রমাণ করে রচনাটির নিবিড় মন্ময়তার দাবী।

'আমার মন' কমলাকান্তের দপ্তরের সেই শ্রেণীরও অন্তর্ভুক্ত যেগুলি মননসমৃদ্ধ, রূপকাঢ্য, ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা। মননের চাতুরী যেমন প্রথম অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তেমনি বাহ্যসম্পদের পূজার নক্সা-রচনায়। রূপকেরও ছড়াছড়ি এই সব ক্ষেত্রে। যে হাস্য-রস 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ, তারও বিচিত্র নমুনা এই সব রূপক-নক্সার আধারে প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম পর্বে পাকশালায় অনুসন্ধানের কাহিনীতে পরিহাস-রসিকতার ভঙ্গী এক ধরনের, এর মধ্যে ব্যঙ্গের খোঁচা কিছুই নেই, খালি কৌতুকোচ্ছল চিত্র-রচনার বাহাদুরিতে নিরীহ হাস্যরসের তরঙ্গ তোলা হয়েছে। কিন্তু বাহ্যসম্পদের পূজার নক্সায় রসিকতার মুখে বেশ একটু ধার আছে। এখানে ব্যঙ্গ-শাণিত মৃদু আঘাতের পরিচয় পাওয়া যায়। রূপক ভেঙে অর্থ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে প্রবল হাস্যরোল সৃষ্ট হয়। 'হর হর বম্ বম্' যার বীজমন্ত্র, সে পূজো যে কোন্ দেবতার তা এদেশের কে না জানে? কিন্তু কমলাকান্তের ব্যঙ্গোপযোগী পরিকল্পনায় মহাদেবের জায়গায় বেদী অধিকারকারী দেবতাটি হয়েছে 'বাহ্যসম্পদ' অথবা 'টাকা' অথবা 'বাবা পঞ্চানন্দ'। শৈব-পদ্ধতিতে কি শাক্তের মতো বলিদান থাকতে পারে? কিন্তু কমলাকান্তের কল্পনায় সবই সম্ভবপর। তাই এর পুরোহিত পুরাণ ও তন্ত্র সবই বিলেতী,—এর নৈবেদ্য, ছাগবলি, গঙ্গাজল, বিল্বদল, চন্দন সবই অদ্ভুত ও উদ্ভট। এই উদ্ভট পরিকল্পনা হাস্যরসকে অবারিত করে দিয়েছে। ষোড়শোপচার সাড়ম্বর পূজার আঙ্গিক রচনায় কোনো ত্রুটি নেই, ঢাক-ঢোল-কাঁসির ব্যবস্থা হয়েছে, হোমের ব্যবস্থা হয়েছে, আর খুব ঘটা করে আঁকা হয়েছে পাঁঠাবলির চিত্র। হোমের ঘৃতও যেমন অভিনব, পাঁঠাও তেমনি অভাবনীয়, আর সর্বাপেক্ষা অভিনব হলো বলিদানের কর্মকার যাকে প্রচণ্ড আবেগের বশে ডাক দিয়েছেন কমলা-কান্ত "কোথা ভাই ইউটিলিটেরিয়ান কামার!" যাতে সে বাবা পঞ্চানন্দের নাম করে

হাঁড়িকাটে-ফেলা পাঁঠা এক কোণে পাচার করে। এই যে এক নিঃশ্বাসে এমন একটি দীর্ঘরূপকমালা রচনা ক'রে এক সঙ্গতিপূর্ণ বৃহৎ নক্সার ছোটবড়ো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের খুঁটিনাটি বজায় রাখা ও বর্ণনাকে ক্লাইমাক্সে পৌঁছে দেবার জন্য ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সুমিত প্রয়োগ বাংলা রস-সাহিত্যে এর কোনো তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। একজন প্রখ্যাত সমালোচক 'আমার মন' জাতীয় প্রবন্ধের সপ্রশংস সমালোচনায় বলেছেন, কমলাকান্তের উক্তিগুলির "অত্যন্ত প্রকট অসম্বন্ধ প্রলাপের মধ্যে যে নিগূঢ় মনস্বিতা আছে, বাংলা সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই।" 'আমার মন' বা এমন কয়েকটি দপ্তরে কমলাকান্তের বচন-বাচনে কোথাও কোথাও অসংযম বা অতি-ভাষণ থাকতে পারে, দেখা দিতে পারে বর্ণনার অতিরেক বা কল্পনা-বিলাসের আতিশয্য, কিন্তু রচনাসমূহের মধ্যে কোনো অসম্বন্ধ প্রলাপ নেই। স্থানবিশেষের বাগ্-বিস্তার অবাঞ্ছিত হতে পারে, হতে পারে কিঞ্চিৎ চপলতার পরিচায়ক,—যেমন রামমণির সঙ্গে কমলাকান্তের প্রসক্তির কথা, বা 'প্রসন্ন সতী-সাধ্বী-পতিব্রতা'-এর ব্যাখ্যা, কিংবা কমলাকান্তের কোনো এক যুবতীর পিছু-নেওয়ায় ফলাফল বর্ণনা,—কিন্তু এগুলিকে বলা চলে ইচ্ছাকৃত, শিথিল বিস্তার। প্রথম পর্বে 'ডেকচি-সমারূঢ়া অন্নপূর্ণা' 'ইলিশের সতৈল অভিষেকান্তে সিংহাসনারোহণ', 'দ্বিতীয় দধীচিতুল্য ছাগ-নন্দন', 'ক্ষুধা-বৃত্রাসুর বধের উপযোগী কোরমা-বজ্র', 'পাচক-বিষ্ণুপরিত্যক্ত লুচি-সুদর্শন চক্র', 'অখণ্ডমণ্ডলাকার লুচি' বা 'সন্দেশ-শালগ্রামে'র যে বর্ণনা স্থান পেয়েছে তার মধ্যে আতিশয্য থাকলেও তা রস-পরিবেশনের প্রয়াসকে সার্থক করেছে। অতঃপর প্রসন্ন গোয়ালিনীর সঙ্গে কমলাকান্তের সম্পর্ক জানাতে গিয়ে যা বলা হয়েছে তা পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। 'সে রসের হাসি পথে ছড়াইতে ছড়াইতে যাইত, আমি তাহা কুড়াইয়া লইতাম',—এমন কাব্য-সৌরভে সুরভিত বিশুদ্ধ ঘনিষ্ঠতার কথা আর কোথাও শোনা যায় না। গব্যরসে ও কাব্যরসে উভয়ের মধ্যে যে বিলক্ষণ বিনিময় চলতো, এ তথ্যটি দপ্তর-ব্যাখ্যার পক্ষে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। 'মঙ্গলা আমার বিষ্ণুপদ, প্রসন্ন আমার ভাগীরথ'—এ প্রসঙ্গটিও 'কমলাকান্ত'কে জানবার পক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্য। আবার রচনা-রসের দিক দিয়েও এই অংশটির অবদান সামান্য নয়।

আবার, কমলাকান্ত যে কেবল হাস্যরসিক নন, তিনি একজন সূক্ষ্মদর্শী বিচারক, প্রাজ্ঞ শিক্ষক, সমাজকল্যাণকামী স্বদেশহিতৈষী ও সর্বোপরি মানবপ্রেমিক, তারও বলিষ্ঠ পরিচয় ছড়িয়ে আছে এই প্রবন্ধটির দ্বিতীয়ার্ধে। মূলতঃ তিনি মনুষ্যত্ব ধর্মে বিশ্বাসী।

পাঠ-প্রসঙ্গে – সাত পৃথিবী—সপ্ত স্বর্গের অনুকরণে কমলাকান্ত সাত পৃথিবী বলেছেন। সপ্তদ্বীপের কল্পনার প্রভাবও এখানে আছে।

ডেকচি সমারূঢ়া অন্নপূর্ণা—ডেকচিতে চাপানো ভাত। ভাতকে সচরাচর লক্ষ্মীরূপে কল্পনা করা হয়ে থাকে। 'অন্ন' শব্দটির সূত্রে কমলাকান্ত অন্নপূর্ণা শব্দটি ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয়।

অন্যে যাহা বলে বলুক ইত্যাদি—সাধারণতঃ কিন্তু বা গুরুকে 'অখণ্ড মণ্ডলাকার' বলা হয়ে থাকে। কোনো কোনো রসিক টাকারও এই বিশেষণটি প্রয়োগ করেন। কমলাকান্ত লুচির গোলত্বের দিকে লক্ষ্য রেখেই পদটিকে তার উপযুক্ত বিশেষণরূপে ব্যবহার করেছেন।

প্রণয়টা কেবল গব্যরসাত্মক—প্রসন্ন গোদুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য বিনামূল্যে উপহার দিত বলে কমলাকান্ত প্রসন্নর প্রণয়কে গব্যরসাত্মক বলেছেন।

এত গুণে কোন লিপিব্যবসায়ী ইত্যাদি—কমলাকান্তের রচনা প্রসন্নর ভালো লেগেছিল। তাই প্রসন্নর প্রতি তিনি একটু অনুরাগী হয়ে পড়েন। একটি মধুর টিপ্পনীযোগে ঐ সাদা কথাটি হয়েছে ব্যঞ্জনাময়। বংলাদেশে তখন যদি বা বাংলার লেখক দেখা দিত তো পাঠক জুটতো না। তাই অন্য প্রাপ্য দূরে থাক, শুধু তার লেখা যে অপরে আগ্রহ করে পড়ে, এইটুকুতেই সে ধন্য হয়ে যেতো। তখনকার সাহিত্যের ও সাহিত্যিকের শোচনীয় অবস্থার প্রতি এই কটাক্ষটি উপভোগ্য।

গাইয়ের প্রতিও তদ্রূপ—বাস্তবিক পক্ষে মঙ্গলা গাই-ই দুধ দিত বলে কমলাকান্ত তার প্রতি অনুরাগ পোষণ করেছেন। 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী' অংশে মঙ্গলা গাইকে নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে কৌতুকরস সৃষ্টি করেছেন তা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

উভয়েই সুন্দরী ইত্যাদি—নারী ও গাভীতে কমলাকান্তের সমদৃষ্টি লক্ষণীয়।

আমার মন কোথাও নাই—এতক্ষণ পর্যন্ত কমলাকান্ত তাঁর মন কোথায় হারিয়েছে বলে রসিকতা করছিলেন—এখানে রসিকতা ছেড়ে তাঁর জীবনের একটি সত্য প্রকাশ করতে উদ্যত হয়েছেন। পৃথিবীর কোন বিষয়েই তাঁর বিন্দুমাত্র অনুরাগ নেই। তাঁর মন পৃথিবীর কোনো জিনিসেই তৃপ্তি বোধ করতে চায় না। তাঁর চিত্ত সকল আকর্ষণে বিমুখ হয়েছে।

মন বাঁধা দিতেই আসি—সংসারে আত্মীয়স্বজনের বন্ধনে আমাদের মন বাঁধা পড়ে যায়। যাঁরা অশেষ শক্তিধর পুরুষ তাঁরা সংসার অতিরিক্ত কোনো সাধনায় চিত্তকে নিবিষ্ট করতে পারেন। কিন্তু সাধারণ লোকের মন যাতে স্বাভাবিক চাঞ্চল্যবশত বিক্ষিপ্ত হয়ে না যায়, এইজন্য সংসারের বন্ধন প্রয়োজন। সংসার লঘুচিত্তের মন বেঁধে রাখে।

আমি চিরকাল আপনার রহিলাম ইত্যাদি—কমলাকান্ত বিবাহ করেননি। তিনি সংসারের আকর্ষণেও কোনদিন বাঁধা পড়েননি। পরের জন্যে তিনি কোনোদিন সামান্য চিন্তাও করেননি। এইজন্য তাঁর মন কোনো কিছুতে বাঁধা না পড়ায় কোনো কিছুতেই তিনি সুখ পাচ্ছেন না।

পরের জন্য আত্মবিসর্জন ইত্যাদি—এইটাই রচনাটির মূল কথা। মানুষ নিজের জন্য যে সুখ আহরণ করে তা ক্ষণস্থায়ী। সে পরের জন্য যা করে তাই হয় স্থায়ী সুখের নিদান।

মানসম্ভ্রম মেঘমালার ন্যায় শরতের পর আর থাকে না—সুখের সময় মানসম্ভ্রম থাকতে পারে। কিন্তু যখন অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে, তখন মানসম্ভ্রম লুপ্ত হয়। এখানকার প্রকাশভঙ্গীতে বুঝতে হয়, মেঘমালা যেমন শরতের পর হেমন্ত বা শীতকালে আর থাকে না, তেমনি মানসম্ভ্রমও অবস্থা ক্ষুণ্ণ হওয়ার পর আর থাকে না। কিন্তু হেমন্ত বা শীতে মেঘের উদয় যে ঘটতে না পারে তা নয়; আসলে লেখকের উদ্দিষ্ট ভাবটি ছিল শরতের বিত্তবিহীন মেঘের ক্ষণস্থায়িত্বের দৃষ্টান্তে মানসম্ভ্রমের অস্থায়িত্ব প্রকাশ করা।

বিদ্যা তৃপ্তিদায়িনী নহে ইত্যাদি—পৃথিবীতে জ্ঞাতব্য বিষয়ের সীমা নেই। সুতরাং জ্ঞান অর্জন করে কেউ পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে না। বিদ্যা সম্পর্কে যদি এই কথা, তাহলে বাহ্য অন্য বিষয় যে তৃপ্তি বা স্থায়ী সুখ দিতে পারবে না, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আমি মরিয়া ছাই হইব—বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাসের দৃঢ়তা লক্ষণীয়। তিনি ঘোরতর আদর্শবাদী। বর্তমান পৃথিবীশুদ্ধ লোক ধন, মান প্রভৃতি অসার বস্তুর দিকে উন্মত্তভাবে ছুটে গেলেও মানুষের চিত্ত যে স্থায়ী সুখের মূল অনুসন্ধান করতে ভবিষ্যতে উৎসুক হবে তা তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। তবে মানুষের ইতিহাসে সেদিন কবে আসবে তা তিনি সাগ্রহে প্রশ্ন করেছেন। এই অংশে তাঁর অন্তরের আকুল আবেগ ব্যক্ত হয়েছে।

শাক্যসিংহ এই কথা ইত্যাদি—বুদ্ধদেব দুঃখ-নিবৃত্তির কথা বলেছেন। বাহ্য সম্পদের আধার এই সংসারে যাতায়াতের মধ্যে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নেই—সংসারের আকাঙ্ক্ষার নির্বাণ হলে মানুষের দুঃখ ঘুচবে, এই তাঁর বাণীর মূল কথা। তিনি সেইসঙ্গে অহিংসা ও মৈত্রীর কথা বলেছেন। তাঁর মৈত্রী-ভাবনা এবং বঙ্কিমের পর সুখচিন্তা একই বস্তু।

ভারতবর্ষের অন্যান্য দেবমূর্তি সকল ইত্যাদি—ভারতবর্ষের অন্য যে সব আদর্শ ছিল, তা পাশ্চাত্যের বাহ্য উন্নতির প্রয়াসের প্রাবল্যে উপেক্ষিত ও বিলুপ্ত হয়েছে।

কতটুকু মনের সুখ বাড়িবে—কেবলমাত্র বাহ্য সম্পদের সাধনা করিলে তাতে মনের তৃপ্তি সাধিত হতে পারে না। বাহ্য সম্পদ কিছুটা আরাম বা ক্ষণিক সুখ দেয় এইমাত্র—মনের তৃপ্তিসাধন করবার শক্তি তার নেই। সুতরাং ইংরেজী সভ্যতার প্রসারের ফলে দেশের মধ্যে বাহ্য সম্পদের বৃদ্ধি হয়েছে বটে, কিন্তু মনের শান্তি সুদূর-পরাহত হয়ে উঠেছে। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্যসম্পদ-সর্বস্বতার ফলে আমাদের জীবনে যে ঘোরতর অশান্তি এসেছে, একথা একাধিক রচনায় প্রকাশ করেছেন।—অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রকে এখানে প্রাচীনপন্থী বা প্রতিক্রিয়াশীল মনে করা সংগত হবে না। 'সাম্য', 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি ইংরেজ আমলে যে সাধারণ লোকের অবস্থা আগের চেয়ে কিছুটা ভাল হয়েছে, তা স্বীকার করেছেন। বস্তুত প্রাচীন ভারতবর্ষ বাহ্যসম্পদ ও আন্তর শান্তি দুইয়ের সামঞ্জস্য

বিধানের কথা বলেছে। ইংরেজী সভ্যতার বাহ্য আড়ম্বরের দিকটাই দেশের মধ্যে ব্যাপক প্রসারলাভ করায় মানুষের অন্তরের দিকটি উপেক্ষিত হয়েছে। এর ফলেই সারা দেশ জুড়ে ঘোরতর মানসিক অশান্তি দেখা দিয়েছে।

হর হর বম্ বম্ ইত্যাদি—এই অংশে বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের মুখ দিয়ে বর্তমান ধনপ্রীতিকে তীব্র ভাষায় ব্যঙ্গ করেছেন।

হৃদয় ইহাতে ছাগবলি—এই ধনের সাধনায় হৃদয় বলে মানুষের যে একটি পদার্থ আছে তা ভুলে যেতে হয়। অর্থের ক্ষেত্রে হৃদয় উপেক্ষিত হয়। আগেই বঙ্কিমচন্দ্র এডাম স্মিথ ও মিলের উল্লেখ করেছেন। এঁদের রচনায় অর্থনীতি বা শৃঙ্খলাবিধির স্থানই সর্বোচ্চ—হৃদয়বৃত্তিকে এঁরা আমল দেননি। পরেই তিনি বাহ্যিকতাসর্বস্ব হিতবাদকেও ব্যঙ্গ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'উদর-দর্শন' রচনাটিও স্মরণীয়।

আমি পরের জন্য ইত্যাদি—যে পরের সুখ সাধন করতে চেষ্টা করেনি, সুখে তার অধিকার নেই, বঙ্কিমচন্দ্র এই মতটি মানবিক ধর্মসুলভ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কমলাকান্তের সরসোজ্জ্বল স্নিগ্ধ মূর্তির সঙ্গে চিন্তাবীর, আদর্শবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের দৃঢ়তার সংমিশ্রণ দপ্তরের মধ্যে বহুস্থলেই হয়েছে।

যদি পারিবারিক স্নেহের গুণে ইত্যাদি—পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা—এটি এদেশের প্রাচীন মত। পাশ্চাত্য আদর্শে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিই বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য। বঙ্কিমচন্দ্র এই দুটিকে অস্বীকার করে প্রীতি-শিক্ষাকেই বিবাহের চরম উদ্দেশ্য বলেছেন। বিবাহ করে মানুষ প্রথমে স্ত্রী-পুত্রকে ভালোবাসে। সেই ভালোবাসাই ক্রমে পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডি পার হয়ে সর্বজনীন প্রীতিতে পরিণত হলেই বিবাহ সার্থক হবে। এই আদর্শ উপেক্ষিত হলে পৃথিবী থেকে মানুষ নাম মুছে যাওয়াই উচিত—ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত।

কমলাকান্তের একটি বিবাহ দিতে পার—বঙ্কিমচন্দ্র এখানে কৌতুকের মধ্যে ফিরে এসেছেন। রচনাটির মূল উদ্দেশ্য গরুগম্ভীর হলেও, মূল প্রকৃতি রসাত্মক রাখাই পরিকল্পিত। রসের আবরণে তত্ত্ব-ব্যাখ্যা, এই হলো পরিকল্পনা। সেই আবরণটি নিটোল রাখবার জন্যই উপসংহারে এই রসিকতার সুর ধ্বনিত হয়েছে। অকৃতদার বৃদ্ধের এই উক্তি উতরোল হাস্যরস সৃষ্টি করে। তাঁর চরিত্রটি নির্মল; রাজীব-লোচনের ন্যায় আত্মকেন্দ্রিক নয়।

ষষ্ঠ সংখ্যা

চন্দ্রালোকে

কথাসার ও সমালোচনা : দপ্তরের এই সংখ্যাটি অক্ষয়চন্দ্র সরকারের রচনা। অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সাহিত্যিকমণ্ডলীর মধ্যে অন্যতম ছিলেন। অনেক বিষয়েই তাঁদের দু'জনের মত অভিন্ন ছিল। কমলাকান্তের দপ্তর বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হবার সময় বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ের অপ্রতুলতাবশতঃ বা অক্ষয়চন্দ্রের আগ্রহবশতঃ এই সংখ্যাটি রচিত ও প্রকাশিত হয়। অক্ষয়চন্দ্র এমন নিপুণভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার ভাব ও ভঙ্গী অনুসরণ করেছেন যে, মূলগ্রন্থ থেকে এটিকে সহজে পৃথক করা যায় না —বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার সঙ্গে এটি প্রায় বেমালুম মিশে গেছে।

তবে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার সঙ্গে এই সংখ্যাটির পার্থক্য অনুভব করা যায়। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রটির কাল্পনিকতার আতিশয্যের জন্য ভীষ্মদেব খোসনবীশের মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। -বাস্তবিকপক্ষে এই সংখ্যাটিতে যে ভাব ব্যক্ত হয়েছে, তা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবের সঙ্গে প্রায় পনেরো আনাই মিলে যায়—শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রৌঢ় বয়সের রচনায় বর্ণনার মধ্যে উপকরণের বাহুল্য নেই। কমলাকান্তের দপ্তরে অনতিদীর্ঘ বাক্য ও বর্ণনার ঋজুভঙ্গী লক্ষণীয়। যেখানে দীর্ঘ বাক্য আছে, সেখানে বক্তব্য বিষয় তীব্রতর ভঙ্গীতে প্রকাশিত হয়েছে এইমাত্র। অক্ষয়চন্দ্র যা বর্ণনা করেছেন তা অতি অলংকৃত ও অতি বিস্তৃত বিশ্লেষণের রূপ নিয়েছে। যেমন—'উচ্চশিক্ষার ফল কি ? ছাপরখাট —রূপার কলসী, গরদের কাচা এবং স্বর্ণালংকারভূষিতা পট্টবসনাবৃতা একটি বংশ-খণ্ডিকা। হরি হরি বল ভাই! তৃণগ্রাহী পাণ্ডিত্যাভিমানী, বি. এ. উপাধিধারী উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত নব বঙ্গবাসীর, কলসী-বস্ত্র বংশখট্টাসমেত সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হইল!!! প্রথমে উপাধি পাইয়াছিলেন, এখন সমাধি পাইলেন। তিনি বিলাতী ব্রহ্মে লীন হইলেন। বঙ্গীয় যুবক সংসারী হইলেন। তাঁহার উচ্চশিক্ষা তাঁহাকে তাঁহার চরম-ধামে পৌঁছিয়া দিয়াছে।'—এই ধরনের বিশ্লেষণের ফলে বর্ণনার রস তরল হয়ে পড়েছে —তা ছাড়া প্রাচীন সাহিত্য বা পুরাণের বিষয়াদির উল্লেখও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার তুলনায় সুপ্রচুর। -এ সত্ত্বেও অনেক স্থলেই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণনাভঙ্গীও বঙ্কিম-চন্দ্রের রচনার অনুরূপ হয়েছে। মোটের উপর সমগ্র দপ্তরটি পাঠ করবার সময় প্রথম থেকে জানা না থাকলে এটিকে অপর হাতের লেখা বলে মনে হয় না—গ্রন্থের মূল রস এতে একরকম অব্যাহত আছে।

কালিদাস রায় তাঁর 'পরম্পরা'-গত শ্রেণীবিন্যাসে এই রচনাটিকে বলেছেন যুক্তি-মূলক (logical), যেমন 'বিড়াল' বা 'স্ত্রীলোকের রূপ'। যুক্তি ছাড়াও এখানে আছে মননের দীপ্তি, আছে বাগ্‌বিন্যাসের নৈপুণ্য, রূপক-রচনায় পারদর্শিতা এবং দেশী-বিদেশী প্রচুর গ্রন্থ-পরিচয়ের উজ্জ্বল প্রমাণ প্রয়োগ। হাস্যরসসৃষ্টিতেও কমলাকান্তী

ঢঙটি বজায় আছে ঠিকই, তবে একদিকে কথার পাণ্ডিতী মারপ্যাঁচ, ও অপরদিকে কষ্ট-কল্পনা ও অতি-কৃত ব্যাখ্যা ও বর্ণনার জন্য হাস্যরস হয়েছে বেশ কিছুটা বিড়ম্বিত। তা ছাড়া, এখানে কমলাকান্তের বিবাহ-বাতিকের বাড়াবাড়িটা ভীষ্মদেব খোশনবীশের ফুটনোট সত্ত্বেও কমলাকান্ত-চরিত্রের সৌষম্য ক্ষুন্ন করেছে বলে মনে হয়। এই দপ্তরের সমালোচনায় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "হয়ত বঙ্কিম নিজে কমলাকান্তের বৈবাহিক স্পৃহাকে এতটা প্রাধান্য দিতেন না, সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ও ক্ষণস্থায়ী উচ্ছ্বাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিতেন। তার পরে মন্তব্যগুলির মধ্যে তীক্ষ্ণাগ্র চিন্তাশীলতার ছাপ থাকিলেও মোটের উপর চন্দ্রের প্রতি উপদেশ-দানের মধ্যে কতকটা স্থূলতর হস্তাবলেপের চিহ্ন মিলে।"

পাঠ প্রসঙ্গে—ট্রৈলস শর্ম্মা ট্রয়ের উচ্চ প্রাচীরে ইত্যাদি—ট্রয়লাস ও ক্রেসিডার প্রণয়-কাহিনী। 'মার্চেণ্ট অফ ভেনিসে' এই প্রসঙ্গ আছে।

কমলাভিসারিণী—কমলাকান্তের অভিমুখে অগ্রসর হয়েছে এমন।

সাতাইশ ইনী—পুরাণে কথিত আছে যে, চন্দ্র প্রজাপতি দক্ষের সাতাশটি কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। এরা হলো অশ্বিনী, ভরণী ইত্যাদি সাতাশটি তারা।

আমার সহধর্ম্মিণীদ্বয়ের স্কন্ধে ইত্যাদি—অশ্লেষা ও মঘা এই দুইটি তারা অযাত্রা বলে প্রসিদ্ধ। সুতরাং কমলাকান্ত যদি কোনো কাজ করতে গিয়ে ব্যর্থমনোরথ হন, তা হলে অন্য লোকের মতো এদের নামে দোষ দেবেন।

উলুবনে মুক্তা ইত্যাদি—চন্দ্র তার মুক্তাশুভ্র জ্যোৎস্নারাশি উলুবনে ছড়িয়ে দেয়। কমলাকান্ত তাঁর মুক্তার মতো মূল্যবান্ বাণী যত্রতত্র বিতরণ করবেন।

বল্লালসেনের প্র-পরা-অপ পৌত্রেরা—বল্লাল সেন বাংলায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গুণানুসারে কৌলিন্য-প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। পরবর্তী কালে কৌলিন্য-প্রথা কেবলমাত্র বিবাহের ব্যাপারে সহায়ক হয়েছিল। সকলেই কুলীনের হাতে কন্যা সম্প্রদান করতে চাওয়ায় অকুলীনের বিবাহ কোনো কোনো সময় দুর্ঘট হয়ে উঠতো। এখন নূতন কৌলিন্য-প্রথা স্থাপিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি সেই কৌলীন্য।

ছাপরখাট রূপার কলসী—বিবাহে পাত্র যে দান পণস্বরূপে পায়, কমলাকান্ত তাকে শ্রাদ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

একটি বংশখণ্ডিকা—বাঁশের টুকরোয় প্রাণের স্পন্দন নাই। যার সঙ্গে বিবাহ, তার সঙ্গে যেন প্রাণের যোগ দরকার হয় না। কমলাকান্ত সেই নির্জীব বা নির্বোধ নববধূকে বংশখণ্ডিকা বা বংশদণ্ডিকা বলেছেন।

সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হইল—কমলাকান্ত শিক্ষিত নব্যযুবকের বিবাহকে মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর কল্পনার আতিশয্যের জন্য ভীষ্মদেব পাদটীকায় এই রাত্রে কমলাকান্তের বাতিকের বাড়াবাড়ি হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন।

কামস্কাটকা দেশের নদী ইত্যাদি—পাশ্চাত্য শিক্ষার অসার ও নিষ্প্রয়োজন অংশের দিকে লেখক কটাক্ষ করেছেন। এই শিক্ষার ফলে অনেকেই বিভিন্ন দেশের

নানাবিষয় সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করেছেন কিন্তু স্বদেশ সম্পর্কে তাঁরা একেবারেই অজ্ঞ।

সার্লিমান— মধ্যযুগের ফরাসী সম্রাট সার্লেমান।

টাউন হলে বক্তৃতা ইত্যাদি—লেখক তথাকথিত বক্তাদের অসারতাকে ব্যঙ্গ করেছেন। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি নিজেদের দেশসেবী বা রাজনীতিবিদ্ বলে মনে করে; কিন্তু তাদের বাগ্‌জাল-বিস্তারমাত্রই সার।

যদি জীবপ্রবাহ বৃদ্ধি ইত্যাদি—কমলাকান্তের উক্তির তীব্রতা লক্ষণীয়। অক্ষয়চন্দ্র কমলাকান্তের মুখ দিয়ে 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা' এই পুরাতন আদর্শ ও এ-যুগের অর্থের জন্য বিবাহের আদর্শ দুটিকেই ব্যঙ্গ করেছেন।

অঞ্জনার অঞ্চল লইয়া ইত্যাদি—পবনদেব বানরী অঞ্জনার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করেছিলেন। হনুমান অঞ্জনারই পুত্র। চন্দন বৃক্ষ ও এলালতায় সমাচ্ছন্ন মলয় পর্বত থেকে দক্ষিণ বাতাস প্রবাহিত হয় বলে প্রসিদ্ধি আছে।

যদি তোমার ব্যাকরণ পড়া থাকে 'শশিন্' শব্দের প্রথমার একবচনে 'শশী' আর সম্বোধনে 'শশিন্'। কমলাকান্ত শশীকে ঈ-ভাগান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দরূপে গ্রহণ করে তার সম্বোধনে 'শশি' পদটি কল্পনা করেছেন।

আবার সেই তুমিই ইত্যাদি চাঁদ যে দুষ্কর্মের সাক্ষী এই মতটি বঙ্কিমের আদর্শের প্রতিকূল না হলেও এ বঙ্কিমের উচ্চ কবিকল্পনার উপযুক্ত নয়। বঙ্কিমচন্দ্র নীতিবিদ্ হলেও তাঁর নীতিবোধ গভীরতর অনুভূতি ও কল্পনা থেকে উদ্ভূত।

তুমি ক্রিয়াশীল শিশুর ইত্যাদি— এই অংশে বর্ণনার বাহুল্য রচনার পক্ষে কিছুটা ভারস্বরূপ হয়েছে।

বিলাতী শর্মাদের মতে- ইংরাজী ব্যাকরণে চাঁদ স্ত্রীলিঙ্গ—এর পরিবর্তে সর্বনামের স্ত্রীলিঙ্গবাচক শী (she) ব্যবহৃত হয়।

যে ওয়াজিদ আলি শাহ ইত্যাদি—এই অনুচ্ছেদটির রচনা-নৈপুণ্য লক্ষণীয়। এখানে ভাবে ও ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়েছে। অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন—সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব তাঁর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে পড়া স্বাভাবিক। আবার এমনও হতে পারে যে, রচনাটি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র সমগ্র অনুচ্ছেদটি বা এর কিছু অংশ নিজে সংযোজন করে থাকবেন। ওয়াজিদ আলি অযোধ্যার শেষ নবাব।

যে মহিষী দেশবাৎসল্যে ইত্যাদি—কমলাকান্ত এখানে পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের স্ত্রী ঝিন্দনকুমারীর কথা বলছেন।

জোয়ান অর্লিয়ান্স—ফরাসী দেশের অর্লিয়ান্স (অরলেআঁ) প্রদেশের কৃষককন্যা জোয়ান ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ লাভ করে নিজে পুরুষের বেশ ধারণ করে যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্য বিতাড়িত করে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করেন। ইংরেজরা তাঁকে বন্দী করে ডাইনী অপবাদ দিয়ে বিচারের ছলে হত্যা করে।

কোমৎ—অগস্ত কোমৎ বা কোঁৎ। প্রখ্যাত ইউরোপীয় দার্শনিক।

রোমকপত্তনের কৈসরগণ—রোমের সর্বাধিনায়ক সীজার এই উপাধিতে পরিচিত ছিলেন—'কৈসর'-এর অপর উচ্চারণ। এই শব্দ থেকে এসেছে কাইজার ও জার। প্রাচীন ইউরোপে রোমক সাম্রাজ্যই সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল এবং সীজারই প্রধান পুরুষ ছিলেন।

মৈসরী রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা ইত্যাদি—মিশরের রাণী ক্লিওপেট্রা নিজে দেশশাসন করতেন। তিনি নিরতিশয় বিলাসপরায়ণা ছিলেন। রোমের একাধিক প্রধান পুরুষের সঙ্গে তাঁর প্রণয়-সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

বিকল্পে ইট্—ইট্ (it) শব্দটি ক্লীবলিঙ্গবাচক। নব্যযুবকেরা অনেক সময় নির্জীবতা প্রাপ্ত হন বলে কমলাকান্ত তাদের বিকল্পে 'ইট্' হওয়ার কথা বলেছেন। কৌতুকটি ব্যাকরণের ব্যাখ্যার ধরনে করা হয়েছে।

দশাবতার—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি।

প্রথম রামের স্থানে ইত্যাদি—পরশুরাম কুঠারাঘাতে মাতৃহত্যা করেছিলেন, রামচন্দ্র বিনা দোষে গর্ভবতী পত্নীকে ত্যাগ করেছিলেন এবং বলরাম বারুণী অর্থাৎ সুরা পান করতেন।

কল্কিমতে সংহার মূর্ত্তি—কল্কি ম্লেচ্ছ সংহার করবেন, নব্যযুবকরা সবকিছু সংহার করতে উদ্যত।

শাক্তমতে ভোজ্য—শাক্তমতে মাংসাদি আহার প্রস্তুত করা হয়। শক্তিপূজায় মাংসাদি বিহিত।

শৈব ত্রিশূলে—ত্রিশূলাকৃতি কাঁটা। যা দিয়ে খাদ্য বিদ্ধ করে মুখে তোলা হয়।

সৌর পান—মদ্য পান। 'সৌর' শব্দটি সূর্য থেকে বিশেষণে হয়, এখানে সুরা' থেকে বিশেষণ হয়েছে।

প্রথম গৌরাঙ্গ—যীশুখৃষ্ট।

মেজো গৌরাঙ্গ—চৈতন্যদেব।

রাধানগরের ছোট গৌরাঙ্গ—রাজা রামমোহন রায়। রামমোহন উপনিষদের উপর ভিত্তি করে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম প্রচার করেন। তিনি যে উপাসনার প্রবর্তন করেন, সংস্কৃত শ্লোক বা স্তোত্রাদি পাঠ তার অঙ্গ।—রামমোহনের আত্মীয়সভা ও ব্রহ্মসভা থেকেই পরবর্তী কালে ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব হয়। বঙ্কিমগোষ্ঠী ব্রাহ্মসমাজের উপর কিছুটা বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিলেন; এখানে তার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষীয় কবিগণের কবিত্ব লোপ হইল—কবিপ্রসিদ্ধি এই যে, কমল সূর্যের প্রিয়া। সূর্য অস্ত গেলে কমলের দলগুলি বুজে যায়—অর্থাৎ কমলবিরহে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। সূর্য অস্ত গেলে চাঁদ ওঠে; সুতরাং চাঁদ উঠলেই কমল আঁখি মুদে। কিন্তু চাঁদ উঠলে এই কমল অর্থাৎ কমলাকান্ত আনন্দিত হবে।

তুমি তোমার রূপগৌরবে ইত্যাদি— এই উপদেশটির মূলে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবাদর্শের প্রভাব আছে। যে শোকাহত, দগ্ধহৃদয় বা যে ব্যক্তি সব কিছুতে বীতরাগ তার সৌন্দর্যের কোনো প্রয়োজন নেই।

ধর্ম্মযাজকতার ভণ্ড হয়— খৃষ্টীয় ধর্মযাজক বা ব্রাহ্ম ধর্মোপদেষ্টাদের প্রতি কটাক্ষ লক্ষণীয়।

ক্ষীরোদ সাগরজা—কথিত আছে যে সাগর মন্থন করে চন্দ্রের উৎপত্তি হয়েছিল।

তুমি পাষাণী— বৈজ্ঞানিকেরা বলেছেন, চাঁদে জল ও মৃত্তিকা নেই--চাঁদ কেবল পাথর দিয়ে গড়া।

বৈতরণীর নবীন বৎস— চান্দ্রায়ণ-কালে গোবৎসের লেজ ধরতে হয়—এর ফলে মৃত্যুর পর যমদ্বারে প্রবাহিত বৈতরণী নদী সহজে পার হওয়া যায় বলে বিশ্বাস।

যখন দেখিব শাখাস্কন্ধ হইতে ইত্যাদি— কমলাকান্ত সৌন্দর্য-পিপাসু। যেখানে সে সৌন্দর্য দেখবে সেখানেই সে বিবাহ করবে। প্রকৃতিতে এই ধরনের মানবত্ব কল্পনা বঙ্কিমের রচনায় বিশেষ দেখা যায় না। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের রচনায় এর প্রাচুর্য আছে; অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কল্পনার মূলে কালিদাসের প্রভাব সক্রিয়।

সপ্তম সংখ্যা

বসন্তের কোকিল

সারকথা ও সমালোচনা: রচনাটিকে মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম ভাগে কমলাকান্তের বক্তব্য, তুমি বসন্তের কোকিল, শীত-বর্ষার কেউ নও। মানুষের মধ্যে ঠিক এমনি বসন্তের কোকিল অনেক আছে, তারা কেবল সুখের ভাগীদার, সুসময়ের বন্ধু, অসময়ের কেউ নয়। দ্বিতীয় ভাগে বলা হয়েছে, কোকিল বিশ্ব-নিন্দুক; তার চোখে সবই 'কু'। সে নিজে কালো—পরের প্রতিপালিত, তাই পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর, সে সবের-ই প্রতি তার হিংসা-ঈর্ষা বসন্তের পরিবেশে সবই সৌন্দর্যময়, কিন্তু সর্বত্র-ই কোকিলের নিন্দাসূচক ঘোষণা 'কু-উঃ'। হিংসা-ঈর্ষায় জর্জরিত একশ্রেণীর মনুষ্য-প্রকৃতিই কোকিলের এই সার্বিক নিন্দায় প্রকটিত। তৃতীয় ভাগে কমলাকান্তের বক্তব্য, পঞ্চম স্বরের মহিমা অশেষ। সমস্ত সৌন্দর্য-মাধুর্যের আসরে গিয়ে কোকিল যে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করে দেয় 'সবই কু', আর বিশ্বমুগ্ধ মানুষ তাই হাসিমুখে মেনে নেয়, এ শুধু তার কণ্ঠস্বরে, অর্থাৎ গলার জোরে বা গলাবাজিতে। কোকিলের এই যে কাণ্ড, এর প্রতিরূপ কমলাকান্ত খুঁজে পেয়েছেন ইতিহাসের বড়ো বড়ো ব্যাপারে, এদেশ-সেদেশের সাহিত্যে এবং আমাদের গার্হস্থ্য জীবনেও। তাই এসেছে গ্লাডস্টোন-ডিস্রেলির দৃষ্টান্ত, ম্যাকিণ্টশ-মেকলের

দৃষ্টান্ত, ভারতচন্দ্র-কবিকঙ্কণের উল্লেখ ও অবশেষে গৃহিণীর কথায় বাবুর ওষ্ঠ-ঘোস করার দৃষ্টান্ত।

চতুর্থ ভাগে রচনার মূল সুর ভেসে চলেছে ভিন্ন আকাশে। এখানে কোকিলের সঙ্গে কমলাকান্তের এক অদ্ভুত অভিন্নতা-বোধ—সমান দুঃখের দুঃখী, সমান সুখের সুখী। একই কাজ দুজনের, একই লক্ষ্য জীবনের। কোকিল গান গায়, কমলাকান্ত দপ্তর লিখে বেড়ান। পঞ্চমে তান ধরে দু'জনে বুঝি একজনকেই ডাকে। কে যে সেই একজন, তা কেউ জানে না। তবে কমলাকান্তের এই উপলব্ধি যে কোকিলের ডাক লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাতে অব্যর্থ, কিন্তু তাঁর নিজের ডাক্‌তো পৌঁছায় না। তাঁর নিজের মনের কথা, তাই, এ জন্মে আর বলা হলো না। তাই কোকিলকেই তিনি অনুরোধ জানান, তাঁর হয়ে একবার ডাকুক তো।

'বসন্তের কোকিল' একটি উচ্চাঙ্গের কমলাকান্তী রচনা। আঙ্গিকে, ঢঙে ও ভাবে এটি বঙ্কিমের একটি নিটোল সৃষ্টি। শ্রেণীবিন্যাসের দিক দিয়ে দপ্তরটি সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যাদের বলা হয় কবিত্ব, মন্ময়তা ও গীতিমূর্ছনা প্রধান রচনা। এই শ্রেণীতে আছে, 'বসন্তের কোকিল' ছাড়া, 'একা', 'একটি গীত' ও 'আমার দুর্গোৎসব'। এর কল্পনা ও পরিকল্পনা যেমন কবিসুলভ, ভাষা ও ভাববিস্তারও তেমনি। বাগ্‌ভঙ্গি ও কাঠামো রচনায় পুরো কমলাকান্তী ঢঙ বজায় রয়েছে। এখানে 'বিড়াল-মনুষ্যফল-বড়বাজার-পতঙ্গ-ঢেঁকি'র মতো কোন ব্যাপক সমাজ-সমীক্ষা বা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য নেই, অথবা বুদ্ধিদীপ্ত মননের ঐশ্বর্য নেই বা ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা-ভঙ্গিরও প্রকাশ নেই,—এখানে যেন একান্ত আত্মগত কোনো গভীর জীবন-বোধ ব্যঙ্গময় হয়ে উঠতে চেয়েছে। রচনার এই মন্ময়তা এর প্রকাশ-ভঙ্গিকে, বিশেষত, এর শেষাংশটিকে অপূর্ব গীতিমূর্ছনায় ধ্বনিময় করে তুলেছে। বস্তুত এখানে পরিহাস-রসিকতা বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আধিপত্য কিছুই নেই, অথচ একটা অতি মৃদু, অতি শান্ত, নির্মল হাস্যরসের হালকা দোলায় দুলছে এর রচনার কাঠামো। সমাজ-সমীক্ষা বা সমালোচনার কোনো কড়া সুর এখানে নেই বটে, তবু দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে নসীবাবুর সুসময় ও দুঃসময়ের সংযত-সংক্ষিপ্ত নক্‌সার মধ্যে সমাজের বসন্তের কোকিলদের প্রতি যে কটাক্ষ আছে, তা বড়ই উপভোগ্য। সংসারে বিষয়-কুটিল মানুষগুলোর মধ্যে ঈর্ষা-হিংসার মাতামাতির কথা বলা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কোকিলকে নিয়ে রহস্য করার ভঙ্গিতে লেখকের মাতোয়ারা ভাবটি এমন বজায় রাখা হয়েছে যে, ঐ মন্তব্যের আঘাত কোথাও কারও গায়ে লাগবার কারণই ঘটেনি।

এইভাবে দপ্তরী রচনার আপাতলঘুতায় ও রসময়তার ঢঙটি এখানে অক্ষুণ্ণ রেখেও বঙ্কিম তাঁর একটি ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাসকে অমর করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। বাইরে কোকিলের গান, অন্তরে কমলাকান্তের প্রাণের গান, এই হলো 'বসন্তের কোকিল' দপ্তরটির স্বরূপ-পরিচয়। অবার কমলাকান্তের এই যে প্রাণের কথা, এ বঙ্কিমের একান্ত নিজস্ব হয়েও সর্বজনীন। তাই বিশুদ্ধ লিরিক হিসেবে এর স্থান বাংলা সাহিত্যে অনন্য।

এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর অধ্যাত্মানুভূতি অধ্যাত্মপ্রবণ পাঠকের হৃদয়ে যে দোলা লাগায়, তাতে রচনাটির সমাদর অবশ্যই বৃদ্ধি পায়।

এ ছাড়া, রচনাংশের আরও যে একটি বৈশিষ্ট্যের দাবী আছে তা হলো, সাহিত্য ও সাহিত্যিকের লক্ষ্য কী, সে সম্পর্কে বঙ্কিমের একটি সুস্পষ্ট ধারণা ও গভীর সত্যানুভূতি এখানে প্রকাশ পেয়েছে। 'বল দেখি পাখী, কারে?'—কোকিলকে অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্র এই যে প্রশ্ন তুলেছেন, এই তো সাহিত্য-জিজ্ঞাসার শেষ প্রশ্ন। আমাদের সমস্ত সৌন্দর্য ও শিল্পসাধনার লক্ষ্য যে কী তার বুঝি শেষ মীমাংসা হয় নি। কিন্তু বঙ্কিম একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 'যে সুন্দর তাকেই ডাকি', এই উত্তরের মধ্যে রয়েছে ঐ সিদ্ধান্তের সংকেত। সাহিত্যের চরম লক্ষ্য সৌন্দর্য। আবার তিনি নিজেই বলেছেন, 'কাব্যের মূল উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে, কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য—অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি।' সুন্দরের পূজা, রসের আস্বাদন চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত সম্ভব নয়। মোহিতলাল বুঝিয়েছেন, 'কাব্যের রসাস্বাদন সময়ে সেই মুহূর্তের জন্যও চিত্তশুদ্ধি ঘটে।' অতএব, বঙ্কিম যে সৌন্দর্যের উপসনাকেই সাহিত্যের কাজ বলে বিশ্বাস করতেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই; এবং সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর সেই অনুভূত পরম সত্যটিই এখানে গভীর ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে।

পাঠ-প্রসঙ্গে মনুষ-কোকিলে ইত্যাদি—এখানে কোকিল যে কেবল বসন্তবিহারী কমলাকান্ত সেই কথাই বলছেন। বস্তুতঃ এটি রচনার মূল বিষয় নয়;—মূল বিষয়ের সঙ্গে কোকিলের যোগ আছে বলে, কোকিলের প্রকৃতিধর্ম ও সেই সূত্রে সাধারণ মানুষের প্রকৃতিধর্মের একটা সমীক্ষার আয়োজন এখানে। পৃথিবীর অনেকেই যে কেবল সুসময়ের বন্ধু, অসময়ের কেউ নয়, এই অনুচ্ছেদটিতে নসীরামবাবুর প্রসঙ্গে তাই বলা হয়েছে।

টিকি ফোঁটা তেড়ি চশমার হাট কি প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা কি আধুনিক যুবকেরা নসীবাবুর সুদিনে সকলেই ভিড় জমায়।

হেটো ইংরেজী ইত্যাদি—ইংরেজী-জ্ঞানের শোচনীয় দুর্বলতা সত্ত্বেও মুখে ইংরেজীর অক্ষম আড়ম্বর দেখানোর স্বভাবটির প্রতি বঙ্কিমের তীব্র কটাক্ষ।

মাত্রা চড়ায়—অতিরিক্ত মদ্যপান করে।

টেবিলের নীচে গড়ায়—মাতাল হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে।

কাহারও অসুখ ইত্যাদি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার বাঁধুনি ও স্নিগ্ধ কৌতুকরসের আবরণে তীব্র ব্যঙ্গ লক্ষণীয়।

জ্বলন্ত আগুনের মধ্যগত কালো বেগুনের মতো—উপমাটি মনোজ্ঞ হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে ভাবাবেগময় রচনার মধ্যে এইরূপ অদ্ভুত একটি উপমা প্রয়োগ করেছেন।

পরান্ন প্রতিপালিত—কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়ে, কাক সেই ডিম থেকে বাচ্ছা ফুটিয়ে তাকে লালন-পালন করে।

বকুলের অতি ঘন বিন্যস্ত ইত্যাদি—এই অংশে বর্ণনার প্রসাদগুণ ও মাধুর্য উপযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাকৌশলে বসন্তের স্নিগ্ধ-মধুর সৌন্দর্য প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। বকুলের পাতার স্পর্শে শরীর শীতল করে কোকিলের কু-উঃ বলে ডাকের কল্পনা অতি সুন্দর।

শুভ্রমুখী শুভ্রশরীরা ইত্যাদি—বঙ্কিমচন্দ্র এখানে জীবন্ত ছবির মতো বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী বাক্যে বালিকাদের পুষ্পের সহিত তুলনা ও তাদের মধ্যে লতা পুষ্পের গুণরাজি আরোপ সুন্দর হয়েছে। বঙ্কিমের এই স্নিগ্ধ-সৌন্দর্য প্রেমের পরিচয় অন্যত্র বিশেষ পাওয়া যায় না।

গ্লাডস্টোন (১৮০৯-১৮৯৮)—ইংলন্ডের অন্যতম প্রধান রাজনীতিবিশারদ্। ইনি প্রথমে রক্ষণশীল দলের সভ্য ছিলেন—পরবর্তী কালে উদারনৈতিক দলে যোগদান করেন। ইনি প্রায় আট—বৎসরকাল ইংলন্ডের রাজনীতিক্ষেত্রে অতিবাহিত করেন এবং একাধিকবার উদারনৈতিক দলের নেতৃরূপে ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গ্লাডস্টোন তাঁর বক্তৃতাশক্তির জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন।

ডিস্রেলি—ইনিও ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। তিনি কূটনীতির জন্য খ্যাত।

জন স্টুয়ার্ট মিল—ইংলন্ডের প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও নৈয়ায়িক; এক সময় এঁর অভিমত বঙ্কিমচন্দ্রকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছিল।

সিংহাসন হইতে হেস্টিংস পর্য্যন্ত—সিংহাসনের অধীশ্বর সম্রাট্ থেকে প্রতিনিধি হেস্টিংস্ পর্যন্ত। হেস্টিংস্ ভারতবর্ষের প্রথম গভর্ণর-জেনারেল। এডমন্ড বার্ক পার্লিয়ামেন্টে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কোকিলও তার কুহুধ্বনিতে অনুরূপ আলোড়ন সৃষ্টি করে, কমলাকান্ত তাই বলতে চান।

মেকলে—ইংলন্ডের প্রসিদ্ধ কবি ও ইতিহাসলেখক। ভাষার ওজোগুণে এঁর রচনা জনপ্রিয় হয়েছিল।

ভারতচন্দ্র—(১৭১২-১৭৬০)—ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ কবি। 'অন্নদামঙ্গল' এঁর শ্রেষ্ঠ রচনা—'বিদ্যাসুন্দর' এই কাব্যেরই একটি অংশ। 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে আদিরসের প্রাবল্য দেখা যায়।

কবিকঙ্কণ—(ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী)—মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করে কবিকঙ্কণ' উপাধি লাভ করেন। ভারতচন্দ্রের কাব্যের রচনারীতির ঔজ্জ্বল্যের তুলনায় কবিকঙ্কণের কাব্য আপাতদৃষ্টিতে নিষ্প্রভ বলে মনে হয়। তবে তাঁর কাব্য বস্তুনিষ্ঠ ও জীবনরস-রসিকতায় উজ্জ্বল।

গুজরী পঞ্চম—গুজরী অঙ্গুরীর মতো একপ্রকার পদাভরণ—চলবার সময় ঝমঝম করে বাজে। পায়ের পাঁচ আঙ্গুলের জন্য পঞ্চম শব্দটি যুক্ত হয়েছে।

এটি হাতির ডাক ইত্যাদি—সংগীতশাস্ত্রে ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম,

ধৈবত ও নিষাদ এই সাতটি সুর যথাক্রমে ময়ূর, বৃষভ, ছাগ, ক্রৌঞ্চ, কোকিল, ঘোটক ও হস্তী এই সাতটির প্রাণীর ডাক থেকে উদ্ভূত বলা হয়েছে।

তাহার গর্জ্জন শুনিয়া ইত্যাদি—কালোয়াতী সংগীত-সাধকদের মধ্যে অনেকে কণ্ঠে কৃত্রিম গাম্ভীর্য আরোপ করেন—কমলাকান্ত তাকেই কটাক্ষ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সংগীতের অনুরাগী ছিলেন—তবে নিছক কসরতের উপরে তাঁর আকর্ষণ ছিল বলে মনে হয় না।

তোতে আমাতে একবার পঞ্চম গাই—কোকিল পঞ্চমসুরে গান গেয়ে সারা পৃথিবী ভুলায়। কমলাকান্তও পঞ্চমস্বরে কথা কয়ে পৃথিবীশুদ্ধ সকলকে যেন ভোলাতে চাহেন। প্রথম অংশের তুলনায় এই অংশে ভাবান্তর লক্ষণীয়। কমলাকান্ত প্রথমে কোকিলকে কেবল সুখের দিনের পাখি বলে অনুযোগ করেছেন; তার পর তাকে বিশ্ব-নিন্দুক বলে অভিযোগ করেছেন; এর পর বলেছেন কোকিল কেবল তার পঞ্চমস্বরের জন্যই বিশ্বজয় করেছে; সর্বশেষে তিনি কোকিলের সঙ্গে আপনার সাজাত্যের কথা ব্যক্ত করেছেন। কোকিলের মতো কবি বা সাহিত্যিকও অকারণ আনন্দে গান গেয়ে ওঠেন। কোকিল পঞ্চমস্বরে গান করে—কবিও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় নানা কথা বলেন। কমলাকান্ত দুজনের একই উদ্দেশ্য বলে মনে করেছেন।

বল দেখি পাখী কাকে—কমলাকান্তের মুখ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই যে প্রশ্নটি করেছেন, এটাই সাহিত্য-জিজ্ঞাসার শেষ প্রশ্ন। আমাদের সমস্ত সৌন্দর্য ও শিল্প-সাধনার লক্ষ্য যে কি, তার শেষ মীমাংসা হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তী অনুচ্ছেদে এই প্রশ্নটির একটি উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন।

সে সুন্দর যাকেই ডাকি ইত্যাদি—এই অংশে সাহিত্য সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের যথার্থ বোধটি ব্যক্ত হয়েছে। অনেকে তাঁকে মুখ্যতঃ নীতিবাগীশ বলে মনে করেন। এই ধারণাটি ভ্রান্ত। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলেছেন 'কাব্যের মূল উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে, কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য -অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি।' বস্তুতঃ, "কাব্যের রসাস্বাদন সময়ে সেই মুহূর্তের জন্যও চিত্তশুদ্ধি ঘটে।" [মোহিতলাল]—বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ণ-মনুষ্যত্বের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন বলে তাঁর রচনায় জীবনের রহস্য ও গূঢ়নীতি দেখা যায় বটে, কিন্তু সৌন্দর্যের উপাসনাকেই তিনি কাব্যের প্রধান লক্ষ্য বলে স্বীকার করেছেন।

এই যে আশ্চর্য্য ব্রহ্মাণ্ড ইত্যাদি—বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-প্রকৃতি বিশ্বের অপূর্ব সৌন্দর্য ও রহস্য দেখে আকুল হয়ে উঠেছে। এই সুন্দর ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যিনি চরমতম সত্য তাঁর সন্ধানের জন্যও তাঁর চিত্ত উৎসুক। এই অংশটি বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর অধ্যাত্মানুভূতির পরিচয় দান করে। এখানে তিনি পাণ্ডিত্য পরিহার করে জীবনের গভীর সত্য অনুসন্ধান করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

জানিয়া ডাকি ইত্যাদি—মানুষের সকল সাধনা তার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে পরম পুরুষের অভিমুখী হয়েছে।

অষ্টম সংখ্যা

স্ত্রীলোকের রূপ

কথাসার ও সমালোচনা : কমলাকান্তের দপ্তরের এই সংখ্যাটির লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম অন্তরঙ্গ সাহিত্যসেবক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। 'চন্দ্রালোকে' রচনাটির মতো এর মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবাদর্শ ও রচনাভঙ্গির সঙ্গে নিকট সাদৃশ্য আছে। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা স্মরণ করা যেতে পারে—"বঙ্কিম তাঁহার চতুর্দিকে এমন এক প্রতিবেশমণ্ডলী রচনা করিয়াছিলেন, এমন একটি লেখক-সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন, যাঁহারা তাঁহার প্রতিভার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার ভাবোচ্ছ্বাস ও রচনারীতি সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। অথচ এই অনুকরণের মধ্যে অক্ষমতার চিহ্ন নাই. ইহা মৌলিক গুণে সমৃদ্ধ। খুব সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে এইটুকুমাত্র প্রভেদ ধরা পড়ে যে, বঙ্কিমের শিষ্যদের উচ্ছ্বাসের মধ্যে একটু অসংযম ও আতিশয্যের লক্ষণ আবিষ্কার করা যায়; বঙ্কিমের ন্যায় নিখুঁত ভাবসংযম ও সূক্ষ্ম পরিমিতি-বোধ হয়তো ইঁহারা আয়ত্ত করিতে পারেন নাই।— 'স্ত্রীলোকের রূপ' প্রবন্ধে অসাধারণ ভাষানৈপুণ্য ও শব্দসমৃদ্ধি থাকিলেও মোটের উপর বিদ্রূপাত্মক কৌতুকরস হইতে নারীর গুণমাহাত্ম্য-কীর্তনের সুর পরিবর্তনের মধ্যে যেন একটু ওস্তাদির অভাব—এই উভয় সুরের মধ্যে বিচ্ছেদ-রেখা বেমালুম ঢাকা পড়িয়া যায় নাই।"

'স্ত্রীলোকের রূপে' নানাদিকে লেখকের কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হয়েছে। নারীর রূপের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় জগৎ-সংসারে যেন তাণ্ডব-লীলা চলতে থাকে। তাই লেখকের কটাক্ষ সেই নারী সম্প্রদায়ের প্রতি যাঁরা মনে করেন রূপসীর রূপের প্রভাবে পুরুষ সব কুপোকাৎ, আবার কটাক্ষ পুরুষদেরও প্রতি যাঁরা রূপবতীদের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হয়ে রমণী-সৌন্দর্যের উপমা অনুসন্ধানে সম্ভব-অসম্ভব কিছুই বিচার করেন না। 'গজেন্দ্রগামিনী' পরিচয়টি নিয়ে তো তিনি টিপ্পনী কেটেছেন। অতঃপর স্ত্রীলোকের অলংকার-প্রিয়তার মূল অনুসন্ধান করে কমলাকান্ত পেয়েছেন তাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্যের অভাব। অলঙ্কারই যে তাদের জপ-তপ-ধ্যান-জ্ঞান এর কারণ তাদের সৌন্দর্যের অভাবকে যতরকমে সম্ভব ঢাকা দিয়ে পুরুষের মন ভোলানো! পুরুষ যেখানে বিনা ভূষণে সন্তুষ্ট, সেখানে স্ত্রীলোক বিনা ভূষণে লোকালয়ে মুখ দেখাতে লজ্জা পায় কেন? এই থেকেই প্রমাণিত হয় সৌন্দর্যবিষয়ে নারী পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট। যুক্তি-বুদ্ধিবাদী রচনা হিসাবে 'স্ত্রীলোকের রূপ' যে কত বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে এই ধরনের যুক্তিবিন্যাসে তারই প্রমাণ পাওয়া যাবে। সেই সঙ্গে মিলিত হয়েছে লেখকের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও নিপুণ আবিষ্কার। সেই সূত্রেই এসেছে ময়ূর-ময়ূরী,

সিংহ-সিংহী, বৃষ-গাভী ও কুক্কুট-কুক্কুটীর সৌন্দর্যের তারতম্যের কথা, আরও এসেছে 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের নামকরণে পুরুষদের সুন্দর বলে অভিহিত করার মধ্যে কল্পিত চাতুরীর প্রতি ইঙ্গিত।

কিন্তু লেখকে ঈপ্সিত বিদ্রূপের মাত্রা যেন যথেষ্ট কড়া হচ্ছে না, তাই কাব্যরসের সামান্য মধুর ছিটে দিয়ে তিক্ত সত্য নিক্ষেপ করেছেন লেখক নারী-যৌবনের ক্ষণস্থায়িত্ব জানিয়ে এবং প্রণয়দেবের অন্ধতার প্রতি ইঙ্গিত ক'রে।

রচনাটির শেষ পর্বে বক্তব্যের সুর সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নয়, হাস্য-পরিহাস নয়; যুক্তি-বুদ্ধির দীপ্তিচ্ছটা অথবা বাক্‌চাতুরী দেখানোর পালা শেষ। 'রূপ রূপ করিয়া স্ত্রীলোকের সর্বনাশ হইয়াছে' এই বলে যে শেষের পর্বটি সুরু হলো, একেবারে সমাপ্তি পর্যন্ত; ঋজু-ভাষণের মাধ্যমে চলেছে বঙ্গনারীর প্রকৃত মাহাত্ম্যের বিস্তারিত প্রসঙ্গ, যার ফলশ্রুতিও লেখকের সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা—যারা মূর্তিমতী সহিষ্ণুতা, ভক্তি ও প্রীতি, মিছে রূপের বড়াইয়ে তাদের কাজ কি?

এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলা যায়, এতে যেমন আছে একজাতীয় সমাজ-সমীক্ষা তেমনি আছে যুক্তিপ্রধান সমালোচনা, উদ্ভাবনীশক্তি ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ। রঙ্গ-রসিকতা ও ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যের প্রয়োগেও লেখক বেশ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। বঙ্কিম যেমন মাঝে মাঝে হাস্য-পরিহাসের পালা ছেড়ে দিয়ে গম্ভীর বিষয়ের অবতারণা করেন, এখানকার শেষ পর্বেও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রচনার সেই ছাঁচ দেখিয়েছেন। তবে সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন, বঙ্কিমের মতো কৌতুকরস ও বিষয়-গাম্ভীর্য, এই দুয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ-রেখা বেমালুম মিশিয়ে দেওয়া এই লেখকের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

পাঠ প্রসঙ্গে **রূপের গৌরবে**—কমলাকান্ত ইতিপূর্বে স্ত্রীলোকের রূপ সম্পর্কে 'মনুষ্যফল' রচনাতে বলেছেন, 'ছোবড়া স্ত্রীলোকের রূপ। যেমন নারিকেলের বাহ্যিক অংশ, রূপও স্ত্রীলোকের বাহ্যিক অংশ। দুই বড় অসার; পরিত্যাগ করাই ভাল।'

অপমানিত করিয়া পাঠান—অর্থাৎ রূপের বিচারের তুলনায় হীন প্রতিপন্ন করে ছাড়েন।

কমল-কুমুদে কীট পতঙ্গের অধিকার—ভ্রমর প্রভৃতি পতঙ্গ কমলের সঙ্গে প্রণয় সম্পর্ক স্থাপন করে।

স্বর্ণকারের বিদ্যায় মন দিবেন—কারণ তা হলে তারকামালা থেকে সুন্দরতর স্বর্ণহার গড়তে পারবেন।

পায়ের নখ—তুলনীয়—'কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা। চরণ নখরে পড়ে আছে কতগুলো।'

উচ্চ কৈলাসশিখর ইত্যাদি—নারীর স্তন তার কোমলতার জন্য কুসুমকোরকের সঙ্গে তুলনীয়। একে উচ্চতার জন্য পর্বতশৃঙ্গের সঙ্গেও তুলনা করা হয়ে থাকে।

তা ছাড়া, সুন্দর গঠনের জন্য দাড়িম্ববিদম্ব এমন কি বিশালতার জন্য করিকুম্ভের সঙ্গেও তুলনা করা হয়ে থাকে। লেখক স্তন শব্দটি ব্যক্ত না করে শালীনতার পরিচয় দিয়েছেন! এই শালীনতাবোধ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের অনেক লেখকের রচনায় দেখা যায়।

উভয়েই রমণীকুলচরণবিন্যাসের অনুকারী—হংস ও হস্তী দুলে দুলে চলে অপেক্ষাকৃত ধীরমন্থর গতিতে, রমণীর এই ধরনের চলন মনোজ্ঞ বলে মনে করা হয়। কবিরা তুলনামূলক কল্পনার আতিশয্যে হংস ও হস্তিকেই রমণীর গতির অনুকরণকারী বলে মনে করেন।

গজেন্দ্রগামিনী মেয়ের ডাক কৌতুকের কড়া সুরটি লক্ষণীয়।

চীনদেশে পূজা পাইতে যাও—ইংরেজ প্রমুখ কয়েকটি পাশ্চাত্য জাতি জোর করে চীনদেশে আফিম চালাতে চেষ্টা করে। এর ফলে চীনদেশ আফিমের বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। চীন সরকার আফিমের ব্যাপক প্রচলনের বিরোধী ছিলেন—ফলে, ইংরেজদের সঙ্গে চীনের যুদ্ধ হয়। কমলাকান্ত আফিমের প্রতি কোনো বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করেছেন বলে মনে হয় না—সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে এই কারবারের নৈতিক বা রাজনৈতিক দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। রবীন্দ্রনাথ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে 'চীনাম্যানের চিঠি' নামে একটি প্রবন্ধে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

কুটিল কটাক্ষে ইত্যাদি—কমলাকান্ত নারীর শক্তির যে পরিচয় দেন তাতে প্রাচীন কবিজনোক্তি এবং তাঁর স্বকীয় রসিকতা মিশে গেছে। কুটিল কটাক্ষে কালকূট-বর্ষণ, বেণী দ্বারা বন্ধন ও ভ্রূধনুতে শর আরোপের কল্পনা প্রাচীন কবিদের রচনায় পাওয়া যায়। নথের ফাঁদে হস্তীর বন্ধন, নোলকের আঘাতে মানুষ খুন হওয়া বা চন্দ্রহারের চন্দ্রের আঘাতে হাত-পা ভাঙার কল্পনা মৌলিক। লেখক এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের রসিকতার ভঙ্গীটি সুনিপুণভাবে পরিবেশন করেছেন। এই গ্রন্থ ছাড়া অনেক উপন্যাসেও বঙ্কিমের অপরূপ কৌতুকের পরিচয় পাওয়া যায়।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৌত্তলিক—যারা প্রতিমা নির্মাণ করে, তাকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করে তাদের পৌত্তলিক বলা হয়। যারা স্ত্রীজাতির প্রকৃত মূর্তির পরিচয় না পেয়ে তার বিকৃত মূর্তির উপাসনা করে, কমলাকান্ত তাদের পৌত্তলিক বলে অভিহিত করেছেন।—কবিকুল তার রূপময়ী ভাবমূর্তিকে পূজা করে।

যাহার হৃদয় ভাল নহে ইত্যাদি এখানে হৃদয় অর্থে বাহ্যত বক্ষোভাগ বোঝালেও অন্তঃকরণের প্রতি ইঙ্গিত আছে। পুরুষেরা সাতনরী হার দেখে আতঙ্কিত—পাছে ঐ হারের ফাঁসে আবদ্ধ হতে হয়। শিশুরা স্তন্যপান করতে গিয়ে বক্ষের উপর লম্বমান সাতনরী হার দেখে ভীত হয়।

উচ্চ শ্রেণীর জীবগণের মধ্যে—কমলাকান্ত ময়ূর, সিংহ, বৃষভ ও কুক্কুটকে উচ্চশ্রেণীর জীব বলে মনে করেন। তিনি মানুষকেও এইরূপ উচ্চশ্রেণীর জীবগুলির পর্যায়ভুক্ত করতে চেয়েছেন।

স্ত্রীলোক যতই বিদ্যাবতী ইত্যাদি—বিদ্যাসুন্দরের নায়িকা বিদ্যা বিদ্যার অধিকারিণী ছিল—কিন্তু সে নায়ক সুন্দরের সৌন্দর্যে ও বুদ্ধিতে মজেছিল। কমলাকান্ত এখানে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীটিকে রূপক-রূপে গ্রহণ করে পুরুষের সৌন্দর্য ও বুদ্ধির নিকট নারীর পরাজয়ের তত্ত্বটি স্থাপন করতে উদ্যত হয়েছেন।

বেশ ভূষারূপ তেঁতুল ইত্যাদি—অর্থাৎ স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য যখন আর থাকে না তখন বেশভূষা ও প্রসাধনের জোরে নিজেকে রমণীয় করে রাখে।

অপর কারণেও—পুরুষেরা স্ত্রীজাতির প্রতি অনুরাগপরায়ণ বলে তাদের রূপের অত্যধিক প্রশংসা করে।

অন্ধ বলিয়াছেন—বাস্তবিকপক্ষে পাত্র-অপাত্র বিবেচনা করে না, এ সম্পর্কে সে একেবারে অন্ধ। সুতরাং প্রণয়দেবতা কিউপিডকে অন্ধ বলে কেউ কেউ কল্পনা করেছেন।

বাঙ্গালা দেশে—কমলাকান্ত এখানে পূর্ববঙ্গের প্রতি কটাক্ষ করছেন।

পরস্পরের সৌন্দর্য স্বীকার করিতে চাহেন না—কমলাকান্ত এখানে অনেক নারীর স্বাভাবিক দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অনেক স্ত্রীলোকই অপরকে সুন্দরী বলে স্বীকার করতে চান না।

ইহাতেই পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোকের দাসীত্ব—এই সিদ্ধান্তটি যুক্তি-পরম্পরায় আসে না। রূপকে স্ত্রীলোকের দাসীত্বের কারণ বলে নির্দেশ করার উপযুক্ত যুক্তি লেখক দেননি। রূপ ভোগের নিমিত্ত পুরুষ রূপবতী স্ত্রীকে গৃহের মধ্যে আবদ্ধ করেছে।

তাঁহারা মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা, ভক্তি ও প্রীতি—এই হলো নারীসম্পর্কে ঊনবিংশ শতাব্দীর আদর্শবাদীদের মনোভাব। নারীর সেবাপরায়ণা মূর্তিই তাঁহাদের চোখে আদর্শ বলে মনে হয়েছিল। তাঁরা একেই ভারত-নারীর প্রকৃত আদর্শমূর্তি বলে মনে করতেন।

আমি যখন উৎকৃষ্টা যোষিদ্বর্গের বিষয়ে ইত্যাদি—বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এই মত পোষণ করিতেন কি না, সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। সহমরণেই নারীত্বের শ্রেষ্ঠ গৌরব এই প্রতিক্রিয়াশীল মত বঙ্কিমচন্দ্র পোষণ করতেন বলে মনে হয় না। এই অংশটিতে কমলাকান্তের স্বাভাবিক সরসতা অন্তর্হিত হয়ে একটা গোঁড়া গুরুগম্ভীর ভাব এসে গেছে। পতিপ্রেম হেতু সাধ্বী স্ত্রীলোকগণের সহমরণে গমনের গৌরবোজ্জ্বল দিকটি রবীন্দ্রনাথও বর্ণনা করেছেন।

নবম সংখ্যা

ফুলের বিবাহ

কথাসার ও সমালোচনা : 'ফুলের বিবাহ' যার শিরোনাম, তার মধ্যে সারবস্তু আর কী থাকতে পারে? সে তো পুরোপুরি কল্পনাবিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। তার ওপর, সত্যিই যখন একটি বিস্তারিত বিবাহ-চিত্রেই রচনাটির কলেবর রচিত, আর সে বিবাহ ফুলের বিবাহই বটে, তখন আর এর মধ্যে সারবস্তু কী পাওয়া যেতে পারে, সে-বিষয়ে সন্দেহ হয়।

প্রথম কথা, সারবস্তু দেওয়ার সুস্পষ্ট আয়োজন বা প্রতিশ্রুতি কমলাকান্তের দপ্তরে নয়। প্রধানত খেয়াল-খুশির রচনা। যদি সেই খুশির ফুল ফোটানোর মধ্যে কোথাও কোথাও ফল ধরে থাকে, তবে সেটা আনুষঙ্গিক ব্যাপার এবং উপরি-পাওনা। 'ফুলের বিবাহ' কল্পনাবিলাস বা 'fantasy-ধর্মের' পরিচায়ক হলেও খাঁটি দপ্তরী রচনা।

তথাপি এই রচনার বিষয়-মূল্য কিছু আছে বৈ কি। নকসাটি বাহ্যত নসীবাবুর ফুলবাগানের, কিন্তু আসলে আমাদের সমাজের। "ভবিষ্যৎ বরকন্যাদিগের শিক্ষার্থে লিখিয়া রাখিতেছি", ফুলের বাগানে বসে যিনি স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে মল্লিকা ও গোলাপের বিবাহ দেখছেন, তাঁর মুখে এই কথা হালকা হাসির খোরাক ছাড়া আর কী হতে পারে? কিন্তু আসলে ভবিষ্যৎ বরকন্যাদের এখানে বেশ কিছু শিক্ষণীয় আছে। তারা লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে, বাংলাদেশে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার বিড়ম্বনা, বরপক্ষের কুলের দেমাক বা মেজাজ; যোগাযোগের অন্য উপায় না থাকায় সমাজে ঘটকের আধিপত্য। দেনাপাওনা ও ঘটকালীর চটক ইত্যাদি নিয়ে গোটা সমাজের কী চিত্রই না এখানে সংকেতে ব্যক্ত হয়েছে। কুলাচার্যের ভূমিকা বিশেষ লক্ষণীয়। তিনি কুলীনের মর্যাদা রক্ষায় বিশেষ তৎপর। যেখানে যত কুলীন আছে, তা তাঁর 'কুলজী' দপ্তরে সংগৃহীত হয়। বংশ-পরিচয়ে কোন্ মেল, কার সন্তান ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য। কুলীনের ঘরে কলঙ্ক যেন লেগেই থাকে, কিন্তু কুলীনের সাত খুন মাপ। তাই তো এখানে কুলাচার্য মহাশয় নির্বাচিত পাত্র গোলাবের মহিমা কীর্তনে বলেন, গোলাববংশ বড় কুলীন, এরা 'ফুলে' মেল, সাক্ষাৎ বাগানমালীর সন্তান; যদি বল এ ফুলে (কুলে) কাঁটা আছে, কোন্ কুলে বা কোন্ ফুলে নেই?

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, আমাদের সমাজে বিবাহ মানেই আড়ম্বর, বাজি-বাজনার ধুম, বরযাত্রীর সমারোহ; তাদের মধ্যে উগ্রবিলাসী কেউ ব্রাণ্ডি টেনেও আসতে পারে, আসতে পারে নেশায় লাল-হওয়া যুবকের দল, মোসায়েবের দল, আর বিশেষ করে এমন একটি দল যাদের কাজই হলো বরযাত্রী রূপে মেয়ের বাড়ীতে গিয়ে তোয়াজ-তম্বির পাওয়া সত্ত্বেও কথায় কথায় ঝগড়া বাধিয়ে অশান্তি ও আতঙ্ক সৃষ্টি করা।

'ফুলের বিবাহ' বরযাত্রীরূপী এক পাল পিপড়া ঐ শ্রেণীর প্রতিনিধি। "তাহাদের গুণের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, কিন্তু দাঁতের জ্বালা বড়—কোন্ বিবাহে না এরূপ বরযাত্র জোটে আর কোন বিবাহে না তাহারা হুল ফুটাইয়া বিবাদ বাধায় ?"

আরও দেখবার বিষয়, সর্বস্বান্ত হয়ে কন্যার পিতা বরপক্ষের সমস্ত দাবী-দাওয়া মেটাতে রাজী হলেও, প্রায়ই কোনো গূঢ় কারণে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে প্রমাদ গুণতে হয় যথাকালে বর এসে হাজির না হওয়ায়,—কেননা নির্দিষ্ট লগ্নে কন্যার বিবাহ না হ'লে আমাদের সমাজে কন্যার ও কন্যাকুলের কুল যাওয়ার আতঙ্ক একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার। এই নিবন্ধে ঐ বস্তুটির দিকে আঙ্গুলি সংকেত করার জন্য কমলাকান্ত এর ফাঁকে এ'কে দিয়েছেন মল্লিকাদের কুল যাওয়ার উপক্রমসূচক চিত্র। কমলাকান্ত বর, বরযাত্রী সকলকে তুলে নিয়ে মল্লিকাপুরে গেলেন।

রচনাটির মধ্যে এই যে সমাজের আলেখ্যটি স্থান পেয়েছে, তা থেকে কি ভবিষ্যৎ বরকন্যাদের তথা গোটা সমাজের শিখবার মতো বিষয় আছে।

এ ছাড়া, কেবল বিবাহ-কেন্দ্রিক সমাজজীবনের নক্সা হিসাবেও রচনাটির আকর্ষণ কিছু কম নয়। ফুল উপলক্ষ করে উদ্দিষ্ট সমাজের বিভিন্ন আঙ্গিক চিত্রিত ও তাদের যথাযোগ্য রস বিশ্লেষিত হওয়ায় কৌতুকের মশলাযোগে সবটাই হয়েছে পরম উপভোগ্য। কেবল বরপক্ষ-কন্যাপক্ষ ঘটক-বরযাত্রীই নয়, আরও অনেক খুঁটিনাটি জীবন-কথা, আচার-আচরণের কথা ব্যক্ত হয়েছে এখানে। লজ্জাশীলা কন্যার বিবাহপূর্ব সরম-জড়িমা ঠানদি'র আদর-মাখা পীড়াপীড়ি, বিবাহবাড়ীতে হাসি ঢল-ঢল তরুণীদের জড়াজড়ি-হুড়োহুড়ি এয়োদের স্ত্রী-আচার, জামাই-বরণ, কন্যা-সম্প্রদান, গাঁটছড়া-বাঁধা ইত্যাদিও যেমন এখানে ঘটনা-পরম্পরা বজায় করে সুসম্বন্ধ হয়েছে, তেমনি একখানি মধুময় বাসরঘরের ছবিও আঁকা হয়েছে নিখুঁত বিশ্বস্ততায়। সেখানে ঠানদি টগরের সাদা প্রাণে বাঁধা রসিকতা, বরের ঠাট্টা-তামাসা, রঙ্গনের রাঙ্গা মুখে হাসি, বালিকা রূপিণী বকুলের গুণবতী হওয়া সত্ত্বেও রূপ না থাকায় এক কোণে কোণ-ঠাসা হওয়া, বড় মানুষের গৃহিণী ঝুমকো ফুলের 'মোটা মাগী নীল শাড়ী ছড়িয়ে জমিয়ে বসা'—ইত্যাদিতে নক্সাটি হয়েছে সুন্দর বাস্তবতায় ভরা।

আরও যে একটি বৈশিষ্ট্য এই নিবন্ধটিতে উল্লেখযোগ্য সে হলো, বঙ্কিমের নিসর্গ-প্রীতি ও নিখুঁত পর্যবেক্ষণ। বিভিন্ন ফুলের আকৃতি-প্রকৃতি তিনি যে লক্ষ্য করেছেন সঠিকভাবে এবং তাদের একটা সজীব সত্তা রচনা করেছেন সুনিপুণভাবে, এর মূলে আছে তাঁর গভীর নিসর্গ-প্রীতি, প্রকৃত কবিসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী।

পাঠ প্রসঙ্গে ভবিষ্যৎ বরকন্যাদিগের শিক্ষার্থ—এই সাড়ম্বর ঘোষণায় হাস্যোদ্রেক হওয়াই স্বাভাবিক। বিশেষ তো এমন কল্পনা-প্রধান রচনায়, যেখানে পাঠকের শিক্ষামূলক কিছু সংগ্রহের দায় বলে কিছু নেই, সেখানে এমন ঘোষণা বিশেষত চিরকুমার কমলাকান্তের কৌতুকরস সৃষ্টির সহায়ক মাত্র। কিন্তু তবু যে কিছু শিক্ষণীয় আছে, তা সন্ধানী বিশ্লেষণে ধরা পড়বে।

কন্যার পিতা বড়লোক নহে ইত্যাদি—ফুলের বিবাহ দিতে গিয়ে কমলাকান্ত বাংলার সমাজের রীতিনীতি প্রভৃতির দিকেও কটাক্ষ করেছেন। বাংলাদেশে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা ধনী না হলে এবং তাঁর কন্যার সংখ্যা বেশি হলে বিশেষ ভাবনার কথা। বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন, তখন পণপ্রথার প্রচলন পুরামাত্রায় ছিল। পরবর্তী কালে গিরিশচন্দ্র পণপ্রথার কুফল নিয়ে 'বলিদান' নাটক রচনা করেন।

বড় উঁচু—কমলাকান্ত এখানে উঁচু কুলের কথা বলতে চেয়েছেন। বিবাহের সময় কৌলীন্যসম্পন্ন লোকেরা বা অন্য উচ্চ কুলজাত পাত্ররা অপেক্ষাকৃত নিম্নবংশে বিবাহ করতে চাইত না।

ভ্রমররাজ ঘটক—ভ্রমরের ফুলে ফুলে গতি। কমলাকান্ত সেইজন্যই তাকে ঘটক-রূপে কল্পনা করেছেন।

লজ্জাশীলা কন্যা কিছুতেই ঘোমটা খোলে না—কুমারী বাঙালী মেয়ে ঘোমটা দেয় না—তবে বাংলার বাইরে অন্যত্র কুমারীর ঘোমটা দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। বঙ্কিমচন্দ্র মল্লিকার কুঁড়ির অর্ধস্ফুটতা ও কুমারীসুলভ ব্রীড়ার প্রতি ইঙ্গিত করে তার ঘোমটা দেওয়ার কল্পনা করেছেন।

সন্ধ্যা ঠাকুরাণী দিদি আসিয়া ইত্যাদি—সন্ধ্যা হলেই মল্লিকা ফুলটি ফুটলো। কমলাকান্ত কল্পনা করেছেন যে, সন্ধ্যা মুখ দেখাবার জন্য অনুরোধ করেছে বলেই মল্লিকা মুখ খুলেছে। বঙ্কিমচন্দ্র সুন্দরভাবে প্রকৃতির ঘটনাবলী তাঁর কল্পনার সঙ্গে মিলিয়েছেন।

ঘরে মধু কত—বিবাহের সম্বন্ধ করবার সময় কন্যাপক্ষের অর্থব্যয় করবার সামর্থ্য সম্পর্কে বরপক্ষ নানা প্রশ্ন করেন। কমলাকান্ত সামাজিক সেই রীতি অনুসারেই কন্যাপক্ষের ঘরে কত মধু সে প্রশ্ন করেছেন।

গোলাবলাল গন্ধোপাধ্যায়—'বন্দ্যোপাধ্যায়'-এর ধ্বনিসাদৃশ্য যুক্ত এই পদবী-পরিচিতি রচনার মধ্যে শিল্পী যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। গন্ধের জন্যই গোলাপের খ্যাতি তাই এমন পদবী তার স্বাভাবিক প্রাপ্য।

খদ্যোতেরা ঝাড় ধরিল—এই অনুচ্ছেদটিতে ঊনবিংশ শতকের একটি ধনিপুত্রের বিবাহের শোভাযাত্রার বর্ণনা পাওয়া যায়। জোনাকিরা ইতস্ততঃ আলো জ্বালতে জ্বালতে চলেছে—কমলাকান্ত মনে করেছেন যে, তারা ঝাড় বয়ে নিয়ে চলেছে। যাত্রার উদ্যোগে ঝিঁঝিঁরা নহবৎ বাজাতে লাগলো, মৌমাছিরা সানাইয়ের বায়না নিয়ে যেতে পারলো না, কেননা তারা রাতকানা।

রাজকুমার স্থলপদ্ম-দিবাবসানে অসুস্থকায়—সূর্য অস্ত যাবার পর স্থলপদ্ম ম্লান হয়ে পড়ে—কমলাকান্ত তাকে অসুস্থ কল্পনা করেছেন।

জরদ—হলদে রঙের।

সেকালে রাজাদের মত ইত্যাদি—রাজারা হাতী, ঘোড়া, রথ প্রভৃতি উচ্চ আসনে চড়ে যেতো। করবী উচ্চ শাখায় উচ্চ আসনে চড়েছে এই কল্পনা করা হয়েছে।

বেটা ব্রাণ্ডি টানিয়া আসিয়াছিল—চাঁপাফুলের গন্ধ উগ্র বলে কমলাকান্ত ব্রাণ্ডি খাওয়ার কল্পনা করতে পেরেছেন। এই কল্পনায় ধনীমহলে সুরাপানের প্রচলনের প্রতি কটাক্ষ করার সুযোগ নেওয়া হয়েছে।

এক পাল পিপ্‌ড়া ইত্যাদি—অনেক গাছে কাঠপিঁপড়া থাকে—কামলাকান্ত সেগুলিকে মোসাহেব বলেছেন। মোসাহেবরা প্রভু ছাড়া অপরকে আঘাত করে—পিঁপড়াও দংশন করতে ছাড়ে না। তাছাড়া, অবাঞ্ছিত বরযাত্রীর অত্যাচারের কথাটি এখানে এই পিঁপড়ার দল উপলক্ষে অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। বিবাহে এই বরযাত্র দল অকারণ বিবাদ সৃষ্টি করে।

হুম্-হুম্ করিয়া ইত্যাদি—বাতাসের শব্দ পাল্‌কি-বাহকদের শব্দের সহিত তুলনা করা হয়েছে। বাতাস গন্ধ বহন করে—এইজন্যই সে বাহক হবে এমন কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু সন্ধ্যার সময় বাতাস হঠাৎ পড়ে যাওয়ায় সকলে স্থিরভাবে থাকতে বাধ্য হয়েছে।

বর বরযাত্র সকলকে তুলিয়া ইত্যাদি—কমলাকান্ত বাস্তবিকই গাছ থেকে ফুল তুলেছেন।

দেখিলাম পাতায় পাতায় জড়াজড়ি ইত্যাদি—বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনার সরলতা লক্ষণীয়। ভাবগম্ভীর রচনাতেও যেমন, অপেক্ষাকৃত লঘু ও মাধুর্যপূর্ণ রচনাতেও তেমনি তিনি সিদ্ধহস্ত।

প্রাচীনা ঠাকুরাণী দিদি টপর সাদাপ্রাণে ইত্যাদি—কমলাকান্ত সুন্দরভাবে ফুলের রূপের সঙ্গে তার প্রকৃতির সাদৃশ্য কল্পনা করেছেন।

মনে করিলাম, সংসার অনিত্যই বটে ইত্যাদি—কমলাকান্ত এখানে সাহসা দার্শনিক-তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। এই দার্শনিকতার মধ্যে কৌতুকের পরিচয় থাকলেও সত্যানুসন্ধানের প্রয়াস আছে। বিশ্বের সব কিছুই স্মৃতির অতলে ডুবে যায়—অতীতের মধ্যে লুপ্ত হয়ে যায়। কেবলমাত্র কোনো বিষয়ের ভোগ থাকে অর্থাৎ ভোগা-কাঙ্ক্ষার বোধটি আছে বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু কমলাকান্ত বলেছেন যে, ভোগ্য বস্তু লয় পায়, সুতরাং ভোগও থাকে না। কেবল স্মৃতি থাকে কিনা তিনি সেই প্রশ্নে কতকটা আত্মগতভাবে বিভোর হয়েছেন।

এই যে মালা গাঁথিয়াছি—কুসুমের আহ্বানে স্বপ্ন ভেঙ্গে যাওয়ায় কমলাকান্ত দেখলেন যে কুসুমলতার মালায় তাঁর বরকন্যা বাঁধা পড়েছে।

দশম সংখ্যা

বড়বাজার

কথাসার ও সমালোচনা :—কমলাকান্ত কয়েকটি দপ্তরে প্রতীকের সহায়তায় নব-সমাজের কয়েকটি বিভাগের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। এগুলির মধ্যে নুষ্যফল' এবং 'বড়বাজার' এই দুটি রচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেবল মলাকান্তের দপ্তরেই নয়. 'লোকরহস্যের' অন্তর্গত কোনো কোনো রচনার মধ্যেও •কমচন্দ্র অনুরূপ কল্পনার পরিচয় দিয়েছেন। তবে এখানে আফিমের সহায়তায় •কমের কল্পনা একেবারে নিরঙ্কুশ ও ত্রিলোকে ব্যাপ্ত হতে পেরেছে।

কমলাকান্ত যে বিশ্বসংসারকে বড়বাজার অর্থাৎ আর্থিক বিনিময়ের কেন্দ্ররূপে কল্পনা করেছেন, এর মূলে আছে প্রসন্ন গোয়ালিনীর সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য। প্রসন্ন কমলাকান্তকে দুধ খাওয়াত; কমলাকান্তের ধারণা ছিল যে, প্রসন্ন তার নিজের পারলৌকিক সদ্‌গতির জন্য তাঁকে দুধ খাওয়ায়। তিনি প্রসন্নর সদ্‌গতি প্রার্থনা করতেন। কিন্তু একদিন প্রসন্ন দুধের দাম চাওয়ায় তাঁর সেই ধারণা আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেল. তিনি বুঝলেন যে, পৃথিবীতে ভক্তি, প্রীতি, প্রভৃতি সবই মিথ্যা—সকলেই স্বার্থপর। এ সংসারে সকল জিনিসই মূল্য দিয়ে কিনতে হয়—দুধ, দই থেকে আরম্ভ ক'রে বিদ্যা, ধর্ম, যশ, মান এমন কি বিষের মতো জিনিসও অর্থের বিনিময়ে পেতে হয়। সুতরাং বিশ্বসংসার একটি বাজার—সকলেই কিছু-না-কিছু লাভের বিনিময়ে বেচতে চায়। কমলাকান্তের মতে 'সস্তা খরিদের অবিরত চেষ্টাকে মনুষ্যজীবন বলে'।

খাঁটি কমলাকান্তীয় শিল্পরীতির দিক থেকে 'বড়বাজার' একটি রসোত্তীর্ণ রচনা। যেমন মনন-সমৃদ্ধ, তেমনি বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ও রূপকাত্য, আবার তেমনি সরস এই রচনা। ব্যঙ্গ-হাস্যের মৃদুমন্দ দোলায় দুলতে দুলতে সহৃদয় পাঠকচিত্ত এখানে এগিয়ে চলে একটার পর একটা বাজার অতিক্রম ক'রে। রূপের দোকান. বিদ্যার বাজার, সাহিত্যের বাজার, কলু পটি, যশের ময়রাপটি ও বিচারের বাজার, একে একে এই ছটি সমাজ-বিভাগ আমাদের চোখের উপর তুলে ধরা হ'লে সপ্তমস্থানে কমলাকান্ত এঁকেছেন 'দইয়েহাটা'র চিত্র। যেমন ভূমিকা-রচনার বাহাদুরি, তেমনি ওস্তাদি এই সপ্তম বাজার 'দইয়েহাটা'র নক্‌সা ও তার অদ্ভুত টীকা-রচনার। এখানে দপ্তর-রূপে পচা ঘোলের হাঁড়ি নিয়ে কমলাকান্ত বসে আছেন। তিনি নিজে ঘোল খাচ্ছেন ও অন্যকে খাওয়াচ্ছেন। তিনি কাজের কথায় দোকান খুলে সকলকে ঠকাচ্ছেন।

দুনিয়ায় যে সবই অর্থকেন্দ্রিক লেনদেনের ব্যাপার, সুতরাং গোটা বিশ্বসংসারই একটা বড়বাজার মাত্র. এই পরিকল্পনার বনিয়াদটি কতো না পাকা, কেননা এবংবিধ চিন্তার মূল উৎস একটা কঠিন বাস্তব অভিজ্ঞতা। যে প্রসন্ন গোয়ালিনীর কেবল পরলোকার্থ পুণ্যসঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে গরীব ব্রাহ্মণকে দুধ-দই খাইয়ে চরিতার্থ হওয়ার

কথা, সে কিনা এখন ভক্তি-প্রীতি-স্নেহ-প্রণয়াদির গুরুত্ব বিসর্জন দিয়ে দুধ-দইয়ের মূল্য দাবী করে! এমন কঠিন অভিজ্ঞতার আঘাতে তো আপনিই দিব্যচক্ষু খুলে যাওয়ার কথা! তার উপর আছে অহিফেনের মহিমা! সুতরাং কমলাকান্তের মতো ব্যক্তির চোখে এখন বিশ্বসংসার যে বৃহৎ বাজাররূপে প্রতীয়মান হবে, তাতে আর বিচিত্র কী! সত্যই ভূমিকাটি অপূর্ব।

কবিশেখর কালিদাস রায় তাঁর 'পরম্পরা'গত বিন্যাসের সূত্রে এই দপ্তরটিকে যে 'আলংকারিক' বা rhetorical পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত করেছেন, সেটি বড়ই সার্থক। এই দপ্তরে বক্তব্যের উপস্থাপন ও রসের পরিবেশন হয়েছে বিশেষার্থপূর্ণ ও নিখুঁত-নিটোল। প্রথমেই যে রূপের বাজার, সেটিকে আসলে মেছো হাটা ক'রে, রকমারি মাছ, মেছনী, তাদের রকমারি হাঁক-ডাক, বোল-চাল ইত্যাদির মাধ্যমে কমলাকান্ত এ সংসারে রূপসী রুণীদের প্রভাবের কথা, এবং রূপসী-রূপ মাছের দর যে 'জীবন-সর্বস্ব' আর এই দরে কেনা-বেচার মাছের দালাল অর্থাৎ পুরোহিতের কথা রসাল ক'রেই ব্যক্ত করেছেন। 'বিদ্যার বাজারে' রসিকতার সঙ্গে মেশানো আছে লেখকের নিজস্ব পাণ্ডিত্যের বিদ্যুৎ-ঝলক এবং সমঝদারি টীকা-টিপ্পনী। সেখানে ভট্টাচার্যগণ ছোবড়া খাবার উপদেশ দেন। কিন্তু সাহেবগণ ঝুনা নারিকেল কেড়ে নিয়ে বিলাতী শস্যের সহায়তায় সুখে আহার করতে লাগলো। এর নাম 'Asiatic Researches'. সাহিত্যের বাজারে এসে বাংলা সাহিত্যকে 'অপক্ক কদলী'র রূপকে পরিচিত করার মধ্যে কমলাকান্ত কী বড়া ব্যঙ্গের মাধ্যমেই না জানিয়েছেন তদানীন্তন সাহিত্যের তুচ্ছতা। 'কলু পটি'তে সাজানো হয়েছে উমেদার-মোসায়েব-জাতীয় মানুষগুলোকে, যাদের কাজ হ'লো যুত-মতো মানুষের পায়ে তেল দিয়ে স্বার্থ-সিদ্ধ করা। 'যশের ময়রাপটি'তে ফোটানো হয়েছে সংবাদপত্রাশ্রয়ী লেখক ও লেখার দুর্দশা। লেখক-যশ এখানকার বিক্রেয় পদার্থ। সস্তা দরেই তা বিক্রী হয়ে থাকে। তবে দরও যেমন সস্তা, মালও তেমনি পচা যার দুর্গন্ধে পথচারীকে নাকে কাপড় দিয়ে পালাতে হয়। ময়রাপটির রূপক রচনার যৌক্তিকতা এইখানে যে, যশ-কে কল্পনা করা হয়েছে সন্দেশ-রূপে, তবে বৈশিষ্ট্য এই যে, সেটা বিনা ছানায় শুধু গুড়ের আশ্চর্য সন্দেশ। পরিকল্পনা ও উপস্থাপনারীতির বাহাদুরিতে কৌতুকরসও যেমন উপভোগ্য হয়েছে, তেমনি সমালোচনাও হয়েছে মূল্যবান। এই প্রসঙ্গটির শেষের দিকে যশ-সম্পর্কে এসেছে গম্ভীর মন্তব্য যে খাঁটি যশ বা অনন্ত যশের বিক্রেতা কাল ও তা বিক্রীত হওয়াই সম্ভবপর, অন্য পথে নয়।

সকলের শেষে যে ন্তম বাজার 'দইয়ে হাটা'— এইখানে এসে কমলাকান্ত অদ্ভুত একটি রসের অবতারণা করেছেন। এর কৌতুকরসও যত, গভীর-রসও তত,— এ হাসায়ও যত আবার ভাবায়ও তত। 'সেখানে খোদ কমলাকান্ত চক্রবর্তী নামে গোয়ালা দপ্তররূপ পচা ঘোলের হাঁড়ি লইয়া বসিয়া আছে—আপনি ঘোল খাইতেছে, এবং পরকে খাওয়াইতেছে।' বর্ণনাটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এতক্ষণের মৃদু হাস্যতরঙ্গ সহসা

অট্টহাস্যে প্লাবন ঘটাতে চায়। নিজেকে নিয়ে এই ব্যঙ্গ খাঁটি হাস্যরসের পরিচয় দেন। এখানে তাহ'লে কোন দরদস্তুরের বালাই নেই। পসারী তার নিজের মাল নিজেও খাচ্ছে, পরকেও খাওয়াচ্ছে, এতো ভারি অদ্ভুত! মালের পরিচয় হলো 'দপ্তররূপ পচা ঘোল'। পচা জিনিস লোকে খাবে কেন? তাই নিজে খেয়ে অপরের খাওয়ার প্রবৃত্তি জাগানোর চেষ্টা। কী প্রয়োজন এই অদ্ভুত কাণ্ডে ব্যাপৃত হওয়ার? অবশ্যই কোনো গূঢ় রহস্য আছে। প্রথমত, যে জিনিসকে পচা বলা হচ্ছে সেখানে বুঝতে হবে সেটা বিনয়ের লক্ষণ ছাড়া আর কিছু নয়। অতঃপর, 'ঘোল খাওয়া' বা 'ঘোল খাওয়ানো' প্রয়োগের যে বিশিষ্টার্থ সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হোক, এই হলো বঙ্কিমের লক্ষ্য। কমলাকান্তের দপ্তর এমনই এক ধরনের সাহিত্য যার স্বরূপ বা মূল্য নির্ধারণে সাধারণ পাঠককে যে হিমসিম খেতে হয়, এইটাই তো ব্যংগার্থ। শুধু তাই নয়, এই দপ্তর সৃষ্টির নিজস্ব এমন একটি রহস্যময় আকর্ষণ আছে যার আবর্তে পড়ে স্বয়ং কমলা-কান্তও দিশেহারা হয়ে পড়েন। এখানে তিনি কী বলবেন, কেমন করে বলবেন, তার যেন কিছুই ঠিক-ঠিকানা নেই। নিতান্তই ভিতরের তাগিদে যে কোনো বিষয়ে যা বলতে ইচ্ছা হয়েছে, তিনি তাই বলে গেছেন। তার উপযোগিতা বা উদ্দেশ্যসিদ্ধির কোনো দিকেই তাঁর লক্ষ্য নেই। এখানে বিষয়কে আশ্রয় করে রসপ্রেরণা বড় হয়ে উঠেছে। কমলাকান্তের দপ্তরের এটি হলো বৈশিষ্ট্য।

পাঠ-প্রসঙ্গে ঃ

পুণ্যরূপ মৃগ ধরিবার জন্য ইত্যাদি—সংসারে এমন অনেক পুণ্যলোভাতুর আছেন যাঁরা কোনো মতে শাস্ত্রনির্দিষ্ট উপায়ে পুণ্য সঞ্চয় করতেই চেষ্টিত। ব্রাহ্মণভোজন বা অনুরূপ সহজসাধ্য উপায়ে পুণ্য অর্জনের প্রয়াস তাঁরা করে থাকেন। উত্তীর্ণযৌবনা প্রৌঢ়াদের মধ্যেই সচরাচর এই ধরনের পুণ্যসঞ্চয়ের প্রচেষ্টা দেখা যায়। পরবর্তী কালে এরূপ সস্তায় ধর্মসাধনার দ্বারা পারলৌকিক কোম্পানীর কাগজ তৈরীর আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন। বঙ্কিমের কটাক্ষের মধ্যে তীব্রতা নেই। আছে উপভোগ্যতা। হিন্দুধর্মের অনেক বিষয় সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ঔদার্য ও সহিষ্ণুতা ছিল।

হায় মনুষ্যজাতির কি হইবে ইত্যাদি—প্রসন্নর ব্যবহারই কমলাকান্তকে ব্যথিত করেছে। কিন্তু তিনি তার ব্যবহারকেই বিশ্বশুদ্ধ সকলের ব্যবহারের প্রতীকরূপে গ্রহণ করে মানব জাতির লোভের কথা স্মরণ করে আক্ষেপ করেছেন। প্রসন্নর গোরু চুরি যাবার প্রসঙ্গটি বেশ কৌতুকাবহ হয়েছে।

গোরু গোরুর নিজের ইত্যাদি কমলাকান্তের যুক্তি তাঁর স্বকীয় কল্পনার পরিচায়ক। কমলাকান্ত মঙ্গলা গাইকে প্রসন্নর বলে স্বীকার করেননি। জুনিয়ার খোসনবীশ প্রণীত কমলাকান্তের জবানবন্দীতে দেখা যায় যে, কমলাকান্ত বিচারালয়েও অনুরূপ যুক্তি দেখিয়েছেন।

হিন্দুরা সচরাচর মূল্য দিয়া ধর্ম্ম কিনিয়া থাকেন— দেবতা-ব্রাহ্মণকে অর্থদান ধর্ম অর্জনের উপায় বলে কল্পিত হয়। কোনো কোনো ব্রতও আবার কাঞ্চনমূল্যে পালিত হয়। স্মার্ত বিধানে নানা বিষয়ে কাঞ্চনমূল্য ধরে দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে। —বাস্তবিকপক্ষে ধর্ম অর্থ দ্বারা ক্রয় করবার বস্তু নয়—তা জীবন দিয়েই সাধ্য। অর্থ দিয়ে ধর্ম ক্রয়ের ব্যবস্থাকে কমলাকান্ত কটাক্ষ করেছেন।

খরিদ্দারের চোখে ধূলা দিয়া ইত্যাদি—সকলেই অপরকে ঠকিয়ে নিজে লাভবান হতে চায়। 'উদর দর্শন' সংখ্যাটিতে কমলাকান্ত দোকানদারকে প্রতারক বলেছেন; কারণ, দোকানদার জিনিস বেচে আবার মূল্য চাইতে থাকে। মূল্যদাতা মাত্রেরই মত যে, তিনি ক্রয়কালীন প্রতারিত হয়েছেন।

সস্তা খরিদের অবিরত চেষ্টাকে মনুষ্যজীবন বলে—কমলাকান্ত মানবজীবনের এই যে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন, এটা কৌতুককর হলেও এর মূলে জীবনের অভিজ্ঞতা বর্তমান। সাধারণ মানুষ ফাঁকি দিয়ে জীবনে সিদ্ধিলাভ করতে চেষ্টা করে। সৎ পরিশ্রমের বিনিময়ে জীবনে সিদ্ধিলাভ করতে চায়, এমন লোকের সংখ্যা বিরল। ধন, বিদ্যা প্রভৃতি মানুষ সস্তায় কিনতে চায়। উক্তিটির মধ্যে যে কৌতুকের ভাব আছে, তাতেই তিক্ততার সুর চাপা পড়ছে।

রূপের দোকানে গেলাম—কমলাকান্ত রূপসীর সন্ধানে দোকানে গেছেন। কমলাকান্ত অবিবাহিত, সুতরাং তাঁর বিবাহার্থ রূপবতীর প্রয়োজন।—রূপের বাজারকে মেছোহাটা কল্পনা বার্ণার্ড শ'র বাস্তবতার বিরসতা (anti-romanticism)-কেও হার মানিয়েছে। তবে বঙ্কিমচন্দ্র অতি নিপুণভাবে কল্পনার সূত্রটি বয়ন করেছেন, কোথাও বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ঘটেনি।

খরিদ্দারের জন্য লেজ আছড়াইয়া ধড়ফড় করিতেছে—বঙ্কিমচন্দ্র যে সময়ে লেখনী ধারণ করেছিলেন, সেকালে এবং কতক পরিমাণে একালেও, বাঙালীর ঘরে কন্যার বিবাহ একটা সমস্যা। মেয়ে বড় হলে তাকে পাত্রস্থ করবার জন্য যে আয়োজন চলতে থাকে, তাতে ধড়ফড় করার কল্পনা অনুপযুক্ত হয়নি। বয়স বৃদ্ধি পেলে বিক্রয়ের জন্য খাবি খায়।

কুল পুকুরের সস্তা মাছ— কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যার জন্য কুলীন পাত্র জোটা ভার ছিল। কুল-গৌরব বজায় রাখবার জন্য অযোগ্য এমনকি শ্মশানযাত্রীর হস্তে কন্যা সমর্পণ করা হত। গিরিশচন্দ্র 'বলিদান' নাটকে বলেছেন 'বাঙলায় কন্যা সম্প্রদান নয়—বলিদান'।

ধন-সাগরের মিঠা মাছ ইত্যাদি—ধনীর কন্যার সঙ্গে বিবাহের ফলের ইঙ্গিতটি মনোজ্ঞ হয়েছে। পত্নীকে সর্বস্ব বলে জ্ঞান করা, তার পায়ে ধর্ম অর্থ প্রভৃতি বিসর্জন দেওয়া, গলায় কাঁটা বাধলে শাশুড়ীর শরণাপন্ন হইয়া প্রভৃতি লেখকের সাংসারিক অভিজ্ঞতার ফল।

সরস পুঁটি ইত্যাদি এখানে সাধারণ বঙ্গললনার কথা বলা হয়েছে। ব্রীড়াবনতা বঙ্গবধূ গৃহস্থালীর সব কাজেই এগিয়ে যায়—সেই গৃহস্থের সাংসারিক সুখের মূল।

কাদা ছেঁচে চাঁদা— অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে রূপসী বা গুণবতী সংগ্রহ।

দর "জীবন সর্বস্ব"—পত্নীকে জীবনতুল্য কল্পনা নিছক পাশ্চাত্ত্য আদর্শে করা হয়নি। কমলাকান্ত তৎকালীন জীবন থেকে এই কল্পনাটি গ্রহণ করেছেন। প্রায় সকল পুরুষই পত্নীকে জীবনের সর্বস্ব বলে মনে করে। সুতরাং কমলাকান্ত পত্নীকে জীবনমূল্যে ক্রয়ের কথা বলেছেন।

পাঁচয়া গন্ধ হইবে—এখানে রূপের প্রতিই কটাক্ষ করা হয়েছে। রূপ গৌরব যায়, থাকে রূপসীর রসনা।

ঝুনা নারিকেলের দোকান—সংস্কৃতশাস্ত্র দুষ্প্রবেশ্য ; তাতে দন্তস্ফুট করা কঠিন। সেইজন্য তাকে ঝুনা নারিকেলরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ভট্টাচার্য মহাশয় এই নারিকেলের শাঁসের বাবস্থা না দিয়ে ছোবড়া খাবার উপদেশ দেন। এর ফলে সংস্কৃত সাহিত্যকে রসবর্জিত শুষ্ক বস্তু বলে মনে হয়। সংস্কৃতের প্রাণশক্তি ব্যাখ্যার অভাবে কমে আসায় তা প্রায় পুরোপুরিই স্থবিরত্ব লাভ করেছে। বিশেষ করে ন্যায় ও স্মৃতিতে বাঙালী অগ্রগণ্য ছিল ; উনবিংশ শতাব্দীতে এই শাস্ত্র দুটি চর্চার অভাবে জড় হয়ে পড়েছে।

ঘটত্ব-পটত্ব-মস্ব-শস্ব—ন্যায় ও ব্যাকরণকে কটাক্ষ করা হয়েছে। এই অংশে কমলাকান্ত সংস্কৃতশাস্ত্রের কয়েকটি তথ্য বা তত্ত্ব উপকরণরূপে গ্রহণ করে কৌতুকরস সৃষ্টি করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিষয়গুলির উপর অধিকার ছিল বলে তিনি এগুলি কৌতুকরসের মধ্যে নিপুণভাবে বিন্যস্ত করতে পেরেছেন। তৎকালীন ব্রাহ্মণপণ্ডিত-গণের বিদ্যাসর্বস্বতা, অর্থলোভ, স্ত্রৈণতা, তার্কিকতা প্রভৃতি নিয়ে তিনি এখানে কৌতুক করেছেন। এই ব্রাহ্মণপণ্ডিত সমাজের প্রতি কটাক্ষে তাঁর উষ্মা ব্যক্ত হয়নি।

কামড়াইয়া ছোবড়া খাই—সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়ন করবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে নিতান্ত অল্প ছিল। প্রবেশক গ্রন্থ বা সহজবোধ্য বিশ্লেষণের পরিবর্তে একেবারেই দুর্বোধ্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করার রীতি ছিল। পরবর্তী কালে কোনো কোনো সংস্কৃত গ্রন্থের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণাদি প্রকাশিত হওয়ায় সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়েছে।

Sufficient to break the jaws, ইত্যাদি—অনেক পাশ্চাত্ত্য গবেষক গবেষণা বা আলোচনা প্রসঙ্গে যে বুদ্ধির কৌশল দেখিয়েছেন, তাতে এদেশের ছাত্র-পাঠকদের বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। তাঁদের বুদ্ধি-প্রদর্শনের চোটে অনেক সত্য মিথ্যা বলে এবং অনেক মিথ্যা সত্য বলে পরিগণিত হয়েছে। নানা তত্ত্বের উপস্থাপনায় পাশ্চাত্য গবেষণা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

আয়, কালা বালক শ্বেতকায় ইউরোপীয়েরা কালা আদমিদের শিক্ষার জন্য অনেক সময় অতিমাত্রায় উৎসাহ দেখিয়েছেন—অনেকে কৃষ্ণকায়দের শিক্ষাদান 'শ্বেতাঙ্গদের ভার' বলে মনে করতেন। এই অংশে শিক্ষাদানের যে বর্ণনা করা হয়েছে, তার স্থূল মর্ম এই যে, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানাদি এদেশে কেবল বুদ্ধির উপর একটা

অত্যাচারে পর্যবসিত হয়েছে। যে সকল ইউরোপীয় শিক্ষাদানকার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই এদেশীয়দের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না।

ইংরেজ দোকানদাররা লাঠি হাতে ইত্যাদি—পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি আগ্রহশীল হন। তাঁরা পাশ্চাত্ত্য বিশ্লেষণাত্মক রীতিতে সংস্কৃত শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা করে ঐগুলির মর্ম গ্রহণ করেন। পাশ্চাত্ত্য পন্ডিতদের হস্তক্ষেপের ফলে অনেক বিষয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের অধিকার থেকে চলে যায়। কমলাকান্ত পাশ্চাত্ত্য বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যা-রীতির প্রতি কটাক্ষ করেছেন।

অমৃতফল বেচিতেছেন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি কমলাকান্ত তথা বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ লক্ষণীয়।

নীচু, পীচ, পেয়ারা ইত্যাদি—কমলাকান্ত বিদেশজাত কয়েকটি ফলের উল্লেখ করে, সেগুলিকে বিদেশী সাহিত্যরূপে নির্দেশ করেছেন। অবশ্য উল্লিখিত ফলগুলির প্রায় সবকটিই এখন এদেশেও ফলে।

শিশুগণ এবং অবলাগণ ক্রয় বিক্রয় করিতেছে ইত্যাদি—তৎকালীন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে কমলাকান্তের এই কটাক্ষ একটু অতিরঞ্জিত হলেও ভিত্তিহীন নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে অনেক অক্ষম লেখক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের অনেকেই বুদ্ধির দিক দিয়ে নিতান্ত অপরিণত ছিলেন। কমলাকান্ত তাঁদের শিশুরূপে কল্পনা করেছেন। যাঁরা পাঠক তাঁদের অনেকেও শিশুবৎ অল্পবুদ্ধি। কোন কোন মহিলা লেখিকারূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এবং মহিলারাই বাংলা সাহিত্যের পাঠিকা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র একাধিক রচনায় মহিলা পাঠিকাদের বাংলা গ্রন্থে অনুরাগের কথা বলেছেন। লোকরহস্যের 'বাঙ্গলা সাহিত্যের আদর প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

পদ্যাবলী নামক গ্রন্থে পাইবেন অপর লেখকদের গাধা বা গোরু বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বিনা ছানায়, শুধু গুড়ে আশ্চর্য্য সন্দেশ—যা সস্তায় পাওয়া যায়। এদের ছানা বাদ দিয়ে শুধু গুড়ের সন্দেশ। এ অতি অসার পদার্থ।

দোকানের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার ইত্যাদি কমলাকান্ত এখানে লঘু কৌতুকের ভঙ্গি ত্যাগ করে ভাবগম্ভীর কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। যথার্থ যশ অনন্তকালে পরীক্ষিত এবং জীবনমূল্যেই লভ্য।

দেখিলাম সেই কশাইখানা—বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বহু বিচার করেছিলেন। সুতরাং বিচারবিভাগে সাধারণ লোকের যে কী দুর্ভোগ হয়, তা তাঁর অজানা ছিল না। ব্যবহার-জীবিগণ অনেকেই মক্কেলদের প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ করতে দ্বিধাবোধ করেন না। বঙ্কিমচন্দ্র 'বিবিধ প্রসঙ্গে' বিচারবিভাগের নানা ত্রুটির কথা বলেছেন।

দপ্তররূপ পচা ঘোলের হাঁড়ি লইয়া ইত্যাদি—'কমলাকান্তের দপ্তর' রসগর্ভমূলক, বক্রোক্তিজীবিত নানা প্রবন্ধের সমষ্টি। কৌতুকরসে, মননের দীপ্তিতে ও দার্শনিক

জিজ্ঞাসায় প্রবন্ধসমূহ উজ্জ্বল। যেহেতু প্রবন্ধটিতে পাণ্ডিত্যের প্রকাশ নেই, আছে রসগত সৃষ্টির প্রকাশ, সেজন্য কমলাকান্ত একে পচা ঘোলরূপে অভিহিত করেছেন। পাঠকগণের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু মনকে হয়ত এই প্রবন্ধসমূহ তৃপ্ত করবে না। তাঁর মনে হয়েছে যে, দপ্তর বাজে কথার সমষ্টি। এখানে আছে অপ্রয়োজনের আনন্দ।

একাদশ সংখ্যা

আমার দুর্গোৎসব

কথাসার ও সমালোচনা: বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবজীবনের একটি প্রধান অবলম্বন তাঁর স্বদেশপ্রেম। কমলাকান্তের দপ্তরের দু'টি প্রবন্ধে এই বৃত্তিটির পরিচয় পাওয়া যায়—একটি 'আমার দুর্গোৎসব' অপরটি 'একটি গীত'। 'আমার দুর্গোৎসব' প্রবন্ধটিতে তাঁর স্বদেশের প্রতি নিবিড় অনুরাগ, বঙ্গভূমিকে দুর্গা প্রতিমারূপে কল্পনা, বাংলার সর্বাঙ্গীণ গৌরব স্মরণ, সেই গৌরবের অবসানজনিত ক্ষোভ এবং বঙ্গমাতাকে তাঁর গৌরবের আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য একটি মহৎ সংকল্প ব্যক্ত হয়েছে।

রচনাটিতে যে কেবল দেশপ্রীতিমূলক ভাবালুতা প্রকাশিত হয়েছে তা নয়, এরই মধ্যে উচ্চারিত হয়েছে এক মহাশক্তিশালী স্বদেশমন্ত্র জাতিগঠনের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেশকল্যাণ ঠিক কোন্ পন্থায় সম্ভব হতে পারে, কোন্ ত্রুটির জন্য আমরা সব হারিয়েছি, আবার কিভাবে সংশোধিত হলে আমরা হৃত সম্পদ্ ফিরে পেতে পারি, এ সবেরই একটা সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ ও সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এখানে। সুতরাং কেবল ভাবাবেগ নয়, কাজের কথাও আছে খুব জোরালো ভাষায়, সুনির্দিষ্ট রূপরেখায়। "এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব— তোমার মুখ রাখিব।** এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা!' এই তো স্বদেশমন্ত্র! এর প্রয়োজন হলো সর্বাগ্রে দেশের প্রকৃত কল্যাণ-সাধনে। কুসন্তান হয়ে অসৎপথে চলাতে দেশের মুখ রক্ষা হয়নি। হীন স্বার্থপরতা ও ভ্রাতৃবিদ্বেষই এ দেশের স্বাধীনতা লুপ্ত হওয়ার মূল কারণ। আলস্য ও ইন্দ্রিয়াসক্তি-জাগানো কোমল ভাবের অতিরিক্ত চর্চার ফলেই লক্ষ্মণসেনের আমলে এ দেশ বিজাতি-কর্তৃক বিজিত হয়। সুতরাং এখানে কমলাকান্তরূপী বঙ্কিমের সেই সব মূলোৎপাটনের সংকল্প। "মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?" এমন অগ্নিগর্ভ দেশপ্রেমের বাণী বঙ্কিমের আগে আর একবার মাত্র শোনা যায় রঙ্গলালের 'পদ্মিনী' কাব্যে "স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে" আহ্বানে ও মধুসূদনের ইন্দ্রজিতের মুখে। গোটা বাঙালি জাতির হয়ে আত্মসংশোধনের বিধি-বিধান বঙ্কিম এখানে দিয়েছেন আবেগময় অথচ দৃঢ়ভঙ্গিতে;—"দেবক ছাগকে হাড়িকাটে ফেলিয়া সৎকীর্তি খড়্গে মায়ের কাছে বলি দিব—"এই তো জাতীয় ঐক্য নির্মাণ ও জাতীয় চরিত্র-গঠনের প্রথম ধাপের কাজ।

পাঠ প্রসঙ্গে :

যাহা কখনও দেখিব না—এই রচনায় কমলাকান্ত বাংলাদেশের শ্রীসম্পদময়ী মূর্তি কল্পনা করেছেন। বঙ্গভূমির সেই পূর্ণৈশ্বর্যময়ী মূর্তি তিনি দেখতে পাবেন বলে মনে করেন না। বাংলা যে দুর্দশায় পতিত হয়েছে তা থেকে উদ্ধার পাবার সম্ভাবনা তাঁর জীবদ্দশায় নাই।

কালের স্রোত দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে—কমলাকান্ত এখানে ইতিহাসের পথ বেয়ে অতীতের দিকে ফিরে যাননি, তিনি ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। এই ছত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে।

ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি—বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে যে গৌরবময় ভবিষ্যৎ ফুটে উঠেছে তা সহজলভ্য নয়। বাংলাদেশে যে অধঃপতন ঘটেছিল, তা থেকে উদ্ধার লাভ সুকঠিন; জননী বঙ্গভূমিকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তাঁর যে সাধনা তা অকূল সমুদ্রে ভেলা-ভাসানোরই অনুরূপ।

উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ—দেশের মহান সন্তানবর্গ, অথবা অন্যান্য স্বাধীন দেশ।

আমি নিতান্ত একা—বঙ্কিমচন্দ্র যে স্বদেশপ্রেমের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন তাতে তাঁর সঙ্গী বিশেষ ছিল না—তিনি নিতান্ত একাই ছিলেন। এ প্রসঙ্গে দপ্তরের প্রথম সংখ্যা 'একা' স্মরণীয়। অবশ্য এখানে তাঁর অনুভূতির দিক দিয়ে একাকিত্ব ব্যক্ত হয়েছে।

কালসমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি বঙ্গজননীর গৌরবদীপ্ত মূর্তি প্রত্যক্ষ করবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র কালস্রোত বেয়ে চলে এসেছেন।

কোথায় কমলাকান্তপ্রসূতি বঙ্গভূমি—কমলাকান্ত যে বঙ্গভূমিকে আপনার জননী বলে মনে করেন, সেই বঙ্গভূমি কোথায়! বঙ্গমাতার যে মূর্তি কমলাকান্তের কল্পনা-নেত্রে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, তা তাঁর দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পূর্ণ হইল ইত্যাদি—কমলাকান্ত বঙ্গজননীর যে মূর্তি কল্পনা করেছেন, তা দিব্যমূর্তি। সুতরাং সে মূর্তি দর্শন করবার পূর্বে স্বর্গীয় বাদ্য ও দিব্য আলোক কল্পিত হয়েছে। বঙ্গভূমি যখন সুবর্ণমূর্তি হবে, তখন সারা দেশে যে অপূর্ব সমৃদ্ধি দেখা যাবে, এই ছত্রে সেইটাই আভাসিত হয়েছে।

সুবর্ণমণ্ডিতা এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা—বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গজননীকে দুর্গা প্রতিমার সঙ্গে একাত্মরূপে কল্পনা করেছেন। এইটাই তাঁর 'বন্দেমাতরম্' সংগীতের মূল কল্পনা। হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার করে তাঁর স্বদেশকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন - এমন কোনো কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরে ছিল না। তিনি স্বদেশের গৌরবোজ্জ্বল মূর্তি কল্পনা করে তাকেই হিন্দু আরাধ্যা দেবীমূর্তির সঙ্গে অভিন্নরূপে বর্ণনা করেছেন। দুর্গাপ্রতিমার সঙ্গে শক্তি-উপাসক বাঙালীর চিত্তের যোগ আছে; সুতরাং এই কল্পনা সহজেই বাঙালীর পক্ষে হয়েছে হৃদয়গ্রাহী। বঙ্কিমচন্দ্রের এই কল্পনা অবশ্য গোঁড়া হিন্দুকে তৃপ্ত করবে না, কারণ সনাতন ধর্মের কথা এখানে

নেই। কিন্তু বাঙালীর সংস্কৃতির ধারায় দেশমাতৃকার এই মূর্তি কল্পনা করে বঙ্কিমচন্দ্র যে জাতির সম্মুখে একটি উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপনা করেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—দেশ মাটিতে গড়া ; দুর্গাপ্রতিমাও মৃন্ময়ী।

এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা—কালক্রমে বঙ্গভূমির সেই রত্নমণ্ডিতা সুবর্ণময়ী মূর্তি অন্তর্হিতা হয়েছে। এখন বাংলাদেশ তার গৌরব হারিয়েছে।

রত্নমণ্ডিত দশভুজ ইত্যাদি বঙ্কিমচন্দ্র অতি নিপুণভাবে বঙ্গজননী ও দুর্গা-প্রতিমার অভেদ কল্পনা করেছেন। দুর্গাপ্রতিমাকে দেশমাতৃকার প্রতীকরূপে গ্রহণ করে নানাদিক দিয়ে উভয়ের অভেদ প্রতিপন্ন করেছেন। দশ হাত দশ দিক রূপে কল্পিত হয়েছে ; তাতে নানা আয়ুধ নানা শক্তির দ্যোতক। দক্ষিণে লক্ষ্মী দেশের শ্রীর প্রতীক, বামে সরস্বতী দেশের জ্ঞানের প্রতীক। কার্তিকেয় দেশবাসীদের শক্তি ও গণেশ কার্যসিদ্ধির প্রতীক। অসুর দেশের শত্রু এবং সিংহ দেশের বলশালী পুরুষবৃন্দ।

কিন্তু একদিন দেখিব ভবিষ্যতে একদিন যে বাংলার সুদিন আসবে, এটি বঙ্কিম-চন্দ্রের ধ্রুব বিশ্বাস।

ভক্তি, প্রীতি, বৃত্তি, শক্তি করে লইয়া—দেবীর চরণে যে পুষ্প অঞ্জলি দেওয়া হয়, কমলাকান্ত তাকে মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণগুলির প্রতীকরূপে কল্পনা করেছেন। ভক্তি, প্রীতি, বৃত্তি ও শক্তি এই চারটি উপাদানই মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ—দেবীর পুজায় এই কয়টির প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশি।

জগৎসমীপে প্রকাশ কর—বাংলাদেশ একসময় শ্রী ও সমৃদ্ধি লাভ করে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করেছিল। বর্তমানে তার সেদিন নেই। বাংলাদেশ আবার গৌরব লাভ করে বিশ্বসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করবে, সমগ্র বিশ্ব তাকে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করবে, এই বঙ্কিমের মনোগত বাসনা।

নবরাগরঙ্গিনী, নববলধারিণী ইত্যাদি—ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে নবজাগরণ হয়েছিল। বঙ্কিমের কল্পনায় সেইটাই প্রতিফলিত হয়েছে। দেশে যে এক নবযুগ এসেছে, জাতির প্রাণে যে নূতন শক্তির আবির্ভাব হয়েছে, নূতন স্বপ্ন যে তাকে জীবনের প্রেরণা দান করেছে, তা বঙ্কিমচন্দ্র অনুভব করেছিলেন। তিনি দেশমাতৃকাকে নব রূপে ও শক্তিতে প্রত্যক্ষ করতে চান।

নগাঙ্গশোভিনি নগেন্দ্রবালিকে বাংলাদেশ পূর্বে সমুদ্রে ঢাকা ছিল। হিমালয় থেকে কয়েকটি নদীর বেগে পলিমাটি নেমে আসায় ক্রমে বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে। এইজন্য বাংলাদেশকে হিমালয়ের কন্যারূপে কল্পনা করা হয়েছে। তার সন্তানের জন্য তাকে হিমালয়ের ক্রোড়ে বা অঙ্গে শোভিত বলে কল্পনা করা হয়েছে।

শরৎসুন্দরী চারুপূর্ণচন্দ্রভালিকে—বঙ্গপ্রকৃতির প্রশস্তিই এখানে প্রধান। বাংলার শরৎ অপরূপ শোভা-সৌন্দর্যের আধার। তাই এখানে বঙ্কিমের কবি-কল্পনায় শরৎ যেন এক অনুপমা সুন্দরী যার কপালে মনোরম পূর্ণচন্দ্রের শোভা। কল্পিত বঙ্গ-মূর্তিটি এই শরৎ-মূর্তির সঙ্গে অভিন্ন, তাই এই সম্বোধন।

সিন্ধুসেবিতে ইত্যাদি—দেশমাতৃকার পদযুগল সমুদ্রের দ্বারা বিধৌত। দেশজননী ও দেবী দুর্গা অভিন্নরূপে কল্পিত হয়েছে।

যাঁহার ছয় কোটি সন্তান ইত্যাদি—'বন্দে মাতরম্' গানের মধ্যে এই সুরটি ব্যক্ত হয়েছে।

দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না—কমলাকান্তের স্বপ্নদৃষ্টি সহসা অপসারিত হওয়ায় তিনি রূঢ় বাস্তবলোকে নেমে এসেছেন। কল্পনায় তিনি যে সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা দেখেছিলেন, তা শূন্যে মিলিয়ে গেল।

এবার সুসন্তান হইব ইত্যাদি—দেশপ্রেমিদের স্বদেশব্রত সাধনার এই হলো শপথবাণী। এদেশ যে ডুবেছে, তার কারণ অন্বেষণ করতে গিয়ে ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে, দেশাত্মবোধের অভাব, স্বার্থপরতা, আলস্য, ইন্দ্রিয়াসক্তি ও অধর্মাচরণই এই জাতির অধঃপতনের কারণ।

কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা—দেশসেবকের গভীর আর্তি।

এস ভাই সকল—একটা দেশের, একটা জাতির উদ্ধার ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় হবার নয়; তার জন্য অসংখ্য মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন। সেইজন্য কমলাকান্ত বঙ্গজননীকে কালসমুদ্র থেকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে তাঁর স্বদেশবাসীকে আহ্বান করেছেন।

অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে এই কালসমুদ্র তাড়িত মথিত ব্যস্ত করিয়া—দেশসেবার সাধনায় বঙ্কিমের কল্পনার সবল রূপটি লক্ষণীয়।

মাতৃহীনের জীবনের কাজ কি—যে জাতির গৌরব গিয়েছে, স্বাধীনতা লুপ্ত তার জীবন বিফল। ব্যক্তির জীবনকে প্রথমে উন্নত করতে হলে জাতির জীবনকে প্রথমে উন্নত করতে হবে, এই ছিল বঙ্কিমের ধারণা। ব্যক্তিকে বড়ো করে তুলবার জন্য তিনি প্রথমে সারা দেশকে উন্নত করবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। উচ্চশ্রেণীর শিল্পপ্রতিভার অধিকারী হয়ে এইজন্যই বঙ্কিমচন্দ্র লেখনীকে রসসাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে টেনে এনে গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করেন।

দ্বেষক ছাগকে বলি দিয়া ইত্যাদি—বঙ্কিমের প্রতীক কল্পনার নিপুণতা লক্ষণীয়। দুর্গাপূজার সময় যে সমারোহ হয়, তাকে তিনি বঙ্গের গৌরবের দিনের সমারোহরূপে কল্পনা করেছেন। তাই পূজার মধ্যে বলিদানের যে জাঁক সেই দিনকে লক্ষ্য রেখে, এখানে দেশমাতৃকা পূজার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানকে ঐ বলিদানের রূপকে উপস্থাপিত করেছেন। সংকীর্তি স্থাপনের কঠিন সংকল্প থাকলে আর দ্বেষ-হিংসার উপদ্রব দেখা দিতে পারে না। বলিদানের উদ্দেশ্য হলো হিংসাদ্বেষ প্রভৃতি বিসর্জন দেওয়া।

কমলাকান্ত যে স্তবটি গেয়েছেন তার প্রথমাংশ বঙ্কিমচন্দ্রের স্বরচিত। বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্কৃতে সংগীত রচনার বিশিষ্ট নিদর্শন 'বন্দে মাতরম্' গান। বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত গান লিখতে গিয়ে সংস্কৃত ছন্দোবিধি অনুসরণ করেননি।

দ্বাদশ সংখ্যা

একটি গীত

সারকথা ও সমালোচনা : 'একটি গীত' সমগ্র দপ্তর'-এর মধ্যে একটি প্রশস্ত ও প্রাণবন্ত সৃষ্টি। এর সুপ্রশস্ত দেহে নানা কথা ছড়িয়ে আছে; তাদের কমলাকান্ত গেঁথেছেন একটি গীতের সূত্রে, তাই রচনাটির শিরোনাম 'একটি গীত'। গীতটি যেখান থেকে নেওয়া, বৈষ্ণবপদাবলীর সেই শ্রেষ্ঠ মহাজন চণ্ডীদাসের রচনায় এর অবশ্যই এত সব ব্যঞ্জনা ছিল না যা ভাবুক কবি ও মহামনীষী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বলিষ্ঠ মননের বলে উদ্ঘাটন বা সংযোজন করেছেন। সেখানে গোপীকন্ঠে উদ্‌গীত হয়েছে এই গান কৃষ্ণের উদ্দেশে। সুতরাং 'বঁধু', 'মনের মানস', 'ধন', মণি-মাণিক্য', 'গুণনিধি',—সবই সেখানে 'কৃষ্ণ'। কিন্তু কমলাকান্ত এদেরই এখানে গ্রহণ করেছেন বিভিন্ন ভাব প্রকাশের সহায়ক প্রতীকরূপে। রচনার শেষাংশে জননী জন্মভূমি এই বঙ্গদেশ বা বঙ্গরাজলক্ষ্মী সমস্ত গীতের উদ্দিষ্ট মানুষটির বা কৃষ্ণের স্থলাভিষিক্ত হলেও প্রথমার্ধে ঐ বঙ্গলক্ষ্মীই সমস্ত বক্তব্যের লক্ষ্যস্থল নয়, এমনকি দেশপ্রীতিও নয় সেখানকার মূল সুরের অবলম্বন। প্রথমদিকে বঙ্কিমচন্দ্র একে একে এগিয়ে চলেছেন কতিপয় তত্ত্বের আলোকে বিখ্যাত বৈষ্ণব-গীতিকাটির অভিনব ভাষ্য রচনায়।

প্রথম প্রতিপাদ্যকে বলা যায় হৃদয়-তত্ত্ব, যার পটভূমিকায় সম্ভবত লুকিয়ে আছে বঙ্কিমের প্রিয় প্রীতিতত্ত্ব। "এসো এসো বঁধু এসো" বঙ্কিমের নূতন ভাষ্যে এ কোনো বিলাসপ্রিয়া রমণীর কথা নয়, বিশ্বের সকল মানব-হৃদয়ের কথা। এক হৃদয় অন্য হৃদয়কে যেন নিয়তই ডাকছে 'এসো এসো বঁধু এসো' এই বঙ্কিমের উপলব্ধি। সংসারে বিচিত্র কাজে আমরা যে ব্যাপৃত থাকি, তারও যেন নিহিত উদ্দেশ্য জনসমাজের হৃদয়ের সঙ্গে আমাদের হৃদয়কে মিলিত করা। এই থেকেই দার্শনিক ভাবের তরঙ্গে বঙ্কিম চলে গেছেন জগৎপ্রবাহের আরও গভীর রহস্যের মধ্যে। তিনি বলতে চান, কেবল মনুষ্যহৃদয় নয়, সমগ্র জড় জগতেও চলেছে এই বিরাট আকর্ষণের লীলা। গ্রহে-উপগ্রহে, জগৎ থেকে জগদন্তরে, পরমাণুতে পরমাণুতে চলেছে এই 'এসো - এসো' আহ্বান। এর মধ্যে এক দিকে যেমন আছে পাশ্চাত্ত্য Panthestic Philosophy-র প্রতিধ্বনি, তেমনি আছে ভারতীয় দর্শনের প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বের সহায়তা। 'নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি', কিন্তু কেন যে এই প্রার্থনা, কেন যে নয়ন ভরে না, তার ব্যাখ্যায় বঙ্কিম এনেছেন, জগতের অনন্ত-গতিশীলতার কথা, চিরপরিবর্তনশীলতার কথা। নয়ন ভরে দেখবার আগেই সবকিছুর পরিবর্তন হয়ে যায়। ফুল দেখতে দেখতে শুকোয়, ফল বিনষ্ট হয়, পাখী উড়ে যায়, চাঁদ ডুবে যায়; শিশুর হাসি রোগে হরণ করে, যুবতীর ব্রীড়া কিসে না যায়? এইভাবে এখানে স্থান পেয়েছে গতিতত্ত্বের প্রসঙ্গ। আবার এরই আনুষঙ্গিকভাবে জীবনরহস্য বা সৃষ্টি-লীলারহস্যের প্রতিই

ইঙ্গিত করা হয়েছে এই বলে যে, এই যে চিরচঞ্চলতা, এটা দুরদৃষ্ট কি শুভ-দৃষ্ট, নির্ণয় করা ভার। গতিই সংসারের সুখ-চাঞ্চল্যই সংসারের সৌন্দর্য। পরিতৃপ্তি কখনই কাম্য নয়, কারণ তাতে সংসার দুঃখময় হওয়া অপরিহার্য। জগৎ পরিবর্তনশীল, নয়নও অতৃপ্ত, অথচ বাসনা—নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি,—এই তো লীলা-রহস্য।

পঞ্চম প্রস্তাবটি খানিকটা সুখ-দুঃখ-তত্ত্বের মতো। সুখ আছে বলেই দুঃখীজন দিবস গণনা করে থাকে। দিবস-গণনা দুঃখ-বিনোদন। তাতে সত্যিই একটা সুখ আছে। যদি এমন দুঃখী কেহ থাকে যে, তার জীবনে দিবস-গণনার কোনো সূত্র নেই, তবে তার মতো হতভাগ্য কেউ নেই। কমলাকান্ত চক্রবর্তী কি সেই অধম শ্রেণী মানুষ?

এইভাবে পাঁচটি তত্ত্বালোচনামূলক একটা ভূমিকা সেরে নিয়ে কমলাকান্ত তাঁর মূল প্রস্তাবে এসেছেন। প্রসঙ্গে টেনেছেন এইভাবে যে, না, অত অধম মানুষের দুর্ভাগ্য তাঁর নয়। তাঁরও দিন গণনার, অর্থাৎ বিগত সুখের স্মৃতি-চারণার একটা সূত্র আছে বৈকি। যে গম্ভীর দেশাত্মবোধের সুরে রচনাটির মূল সুর বাঁধা, সেই প্রসঙ্গে কমলাকান্ত এসেছেন ঠিক এইখানে। বঙ্গভূমির স্বাধীনতা-বিলুপ্তির দিন থেকেই কমলাকান্তের দিন-গণনা। এই প্রস্তাবটির প্রতিষ্ঠা থেকে রচনার শেষ পর্যন্ত পদাবলী-ধৃত গানটির সঙ্গে মিল রেখে চলেছে একটা রূপক-বিন্যাসের মতো। রাধার অনেক দিবসে 'মনের মানসে' বিধি মিলিয়েছেন। কিন্তু কমলাকান্তের 'মনের মানস' মিললো কৈ? অর্থাৎ রাধার কাছে যেমন 'কৃষ্ণ', কমলাকান্তের কাছে তেমনি বাংলার স্বাধীনতা বা বঙ্গরাজলক্ষ্মীর পুনরুদ্ধার। তিনি যা চান, তা এত দীর্ঘকাল দিন-গণনার পরেও পেলেন কৈ? এইভাবে কমলাকান্ত একটা অবসর রচনা করেছেন বাংলার প্রাচীন গৌরবের স্মৃতি-রোমন্থনের। মনুষ্যত্ব বা জাতীয় ঐক্য এখনও বাঙ্গালীর জাগলো না, এও যেমন আক্ষেপের, তেমনি আক্ষেপের, যে আজ আর সেই শ্রীহর্ষ নেই, ভট্টনারায়ণ নেই, নেই হলায়ুধ, লক্ষ্মণ সেন, দেবপাল, জয়দেব বা অপরাপর বাংলার গৌরবস্থল।

'মণি নও, মাণিক নও যে হার করে গলে পরি''—এই গীতাংশটিতে রাধার যে অন্তর-বেদনা ব্যক্ত হয়েছে, কমলাকান্তের মধ্যে অবিকল সে বেদনা নয়; তাঁর কথা হলো, বঙ্গভূমিকে কণ্ঠহারের মতো বক্ষে ধারণ করে রাখতে পারলে, বিজাতীয় শাসক এসে আগে তাঁকে পদাহত না করে বাংলামায়ের পবিত্র দেহ তাদের পাদস্পর্শে কলুষিত করতে পারতো না। রাধার উক্তিতে কৃষ্ণ-গুণনিধিকে নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোর যে কল্পনা, যে কেবল অনুরাগের গভীরতাব্যঞ্জক। 'আমার নারী না করিতে বিধি' ইত্যাদির ভাষ্যেও কমলাকান্তের মৌলিকতা ও স্বাধীন মননের পরিচয় লক্ষণীয়। গোপীর দুঃখ বিধাতা গোপীকে নারী করেছেন কেন, আমাদের দুঃখ, বিধাতা আমাদের নারী করেননি কেন—তাহ'লে আর এ মুখ কাউকে দেখাতে

হতো না—বাঙ্গালীর এই কল্পিত দুঃখনিবেদনের ভঙ্গিতে বেশ একটুখানি ধিক্কারের সুর ফোটানো হয়েছে।

অবশেষে 'তোমায় যখন পড়ে মনে, আমি চাই বৃন্দাবন পানে'—রাধার মুখের এই উক্তিটি অবলম্বন করে কমলাকান্ত তাঁর রচনাটার উপসংহারের জন্য প্রস্তুতির আয়োজন করেছেন। সুখ বিলুপ্ত হলেও সুখের স্মৃতি থাকে; সেই স্মৃতিও সুখকর। কিন্তু কেবল স্মৃতির বেদনা যথেষ্ট। স্মৃতির সঙ্গে যেখানে সুখের নিদর্শন থাকে সেখানে একটা স্বস্তি পাওয়া যায়। রাধার বঁধু চলে গেছে, কিন্তু বৃন্দাবন আছে, কিন্তু যার বঁধুও গেছে, বৃন্দাবনও গেছে, তার দুঃখের অন্ত নেই। কমলাকান্তের কি সেই অবস্থা? বাংলার গৌরবের স্মৃতি তাঁর মধ্যে প্রবল কিন্তু নিদর্শন কৈ? সে গৌড় কৈ? আর্য-রাজধানীর চিহ্ন কৈ? ইতিহাস কৈ? জীবনচরিত কৈ? তাঁর বঁধুও নেই, বৃন্দাবনও নেই, সুখ নেই, সুখ চিহ্নও নেই।

পড়ে আছে শ্মশানভূমি নবদ্বীপ, যেখান থেকে লুপ্ত হয় বাংলার সেই রাজলক্ষ্মীর রূপ। বাকী অংশে বঙ্গজননীর উদ্দেশে কমলাকান্তের যে হৃদয়াবেগ ও সুগভীর আর্তি, প্রকাশ পেয়েছে তাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রীতি লাভ করেছে এক অমর অভিব্যক্তি, এক স্বর্ণোজ্জ্বল সাহিত্যিক মহিমা।

'একটি গীত'-এর সঙ্গে 'আমার দুর্গোৎসব'-এর সজাতীয়তা সর্বাগ্রে চোখে পড়ে যেহেতু এই দুটি দপ্তরেই কমলাকান্তের ভূমিকায় প্রকাশ পেয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের সুগভীর দেশপ্রীতি। কিন্তু মূল সুরের এই সাদৃশ্য সত্ত্বেও 'একটি গীত'-এর স্বাতন্ত্র্যও যথেষ্ট। এখানে কমলাকান্তের যে দার্শনিকতার পরিচয় ফুটেছে, 'আমার দুর্গোৎসব'-এ তার কিছুই দেখা যায় না। বরং সেদিক থেকে এবং আনুষঙ্গিক প্রীতিতত্ত্বের সংকেত-বহনের দিক থেকে এই দপ্তরটি 'একা'র সমশ্রেণীভুক্ত হতে পারে। তবে যেভাবে এক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব-ব্যাখ্যা বা ভাষ্য-রচনার বিস্তৃত আসর 'একটি গীত'-এর প্রথমার্ধ জুড়ে নিয়েছে, ঠিক তেমন কোনো মানস-আয়োজন 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর আর কোথাও দেখা যায় না। ব্যঙ্গ-পরিহাস-বর্জিত যে তিনটি মাত্র দপ্তর আছে 'একটি গীত' তাদেরই অন্যতম, অপর দুটি হলো 'একা' ও আমার 'দুর্গোৎসব'। গীতিমূর্ছনায় ও মর্মময়তায় অনুভূতির প্রগাঢ়তায় ও আবেগের তীব্রতায় এরা পরস্পর তুল্যামূল্য।

পাঠ প্রসঙ্গে এসো এসো বঁধু এসো—পদটি চণ্ডীদাসের রচনা।

নীলাকাশতলে ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া ইত্যাদি—এই কল্পনাটি বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ প্রিয়। 'বসন্তের কোকিল নামক সংখ্যাটিতেও অনুরূপ কল্পনা আছে।

একা এই গীত গাই—আপনার অন্তরে ভালো করে এই গীতের তাৎপর্য অনুভ করবার জন্য বিজনে একা বসে গান গাইবার কল্পনা করা হয়েছে। বস্তুত এই একাকিত্ব প্রতিভার স্বধর্ম।

কমলাকান্ত চক্রবর্তী বুঝিতে পারিল না ইত্যাদি—বঙ্কিমচন্দ্র ইন্দ্রিয়সুখকে সুখ

বলে স্বীকার করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র ইন্দ্রিয়কে কোথাও প্রাধান্য দেন নি—এমন কি ইন্দ্রিয়-সংযমকেও তিনি খুব বড়ো কাজ বা বড়ো আদর্শ বলে স্বীকার করেন নি—চিত্তশুদ্ধিকে তার বহু ঊর্ধে স্থান দিয়েছেন। সুতরাং ইন্দ্রিয়জ সুখকে তুচ্ছজ্ঞান করে তিনি মানস সুখ ও হৃদয়ের পরিতৃপ্তিকেই গ্রাহ্য করেছেন। হৃদয়ের সংঘাত ও হৃদয়ে হৃদয়ে মিলনই তাঁর কাছে মানব জীবনের সবচেয়ে বড়ো সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বহুস্থলে উপদেশচ্ছলে অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু 'ইহজন্মে মনুষ্যহৃদয়ে একমাত্র তৃষা—অন্যহৃদয় কামনা' এই বাণীটিতে তাঁর জীবনের সুগভীর প্রীতিবোধ প্রকাশিত হয়েছে।

জড় জগতের নিয়ম আকর্ষণ—বঙ্কিমচন্দ্র আধ্যাত্মিক সত্যকে স্থূল প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যেও প্রত্যক্ষ করেছেন। জগৎ ব্যাপী চলেছে আকর্ষণের পালা। গ্রহ গ্রহকে, পরমাণু পরমাণুকে, প্রকৃতি পুরুষকে মিলনের জন্য আহ্বান করে চলেছে।

এই তৃণশস্পসমাচ্ছন্ন ইত্যাদিতে—এই সংখ্যাটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য-রচনা বর্ণনার মাধুর্যে ও আবেগের প্রাবল্যে কাব্যের শ্রী ও গভীরতা লাভ করেছে। এই অংশে তার পরিচয় অনুপম। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম জীবনের গদ্যে সাধারণত দীর্ঘ বাক্য দেখা যায়। পরিণত বয়সের রচনায় হ্রস্ব অথচ আবেগ-গভীর বাক্যে মনোভাবকে সংহত রূপ দেবার প্রয়াস লক্ষণীয়।

যেখানে ফুলটি ফুটে ইত্যাদি—বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা করে তার পর বালক, যুবতী ও প্রৌঢ়ার সৌন্দর্যের কথা বলেছেন। তাঁর সৌন্দর্যগ্রাহী চিত্ত বিশ্বের সকল বিষয়ের মধ্যেই সৌন্দর্যের সন্ধান পেতে চেয়েছে! এটি যথার্থ সৌন্দর্যবোধের নিদর্শন।

গতিই সৌন্দর্যের সুখ—সৌন্দর্য যদি চিরস্থায়ী হ'তো তা হলে আমাদের চিরকাল আকর্ষণ করত না। সৌন্দর্য সম্ভোগ করতে করতে আমাদের অন্তর পরিতৃপ্তির ক্লান্তি, জড়ত্ব ও গ্লানি অনুভব করতো। সৌন্দর্য চিরপলাতক বলেই তার জন্য মানুষ এত পাগল। বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবত এই কল্পনাটি ইংলণ্ডের রোমাণ্টিক কবিকুলের ভাবাদর্শ থেকে আহরণ করেছিলেন। ভারতীয় সাহিত্যে চলিষ্ণু সৌন্দর্যের কল্পনা ক্বচিৎ থাকলেও অক্ষয় সৌন্দর্যই ভারতীয় কল্পনায় প্রাধান্য লাভ করেছে। এমন কি বৈষ্ণবরা শ্রীরাধার বয়স পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সৌন্দর্য অপ্রাপনীয় বলে তার জন্য আকুলতা পাশ্চাত্ত্য কাব্যেই বহুভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

যে অন্তঃপ্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট—রূপ বাহ্য—কিন্তু মানুষের অন্তঃ-প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্বন্ধ আছে। কেবল চোখেই রূপ ভালো লাগে না; তার পিছনে যে অন্তর আছে তার জন্যই রূপ ভালো লাগে।

সংস্পর্শ বা নৈকট্য ব্যতীত মনের বৈদ্যুতি বহে না—দূরে থাকলে একজনের মন আর একজনের মনকে তেমনভাবে দোলা দেয় না। একজন আর একজনের কাছে এলে তবেই দুজনের হৃদয়-বিনিময় হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের আমলে তাড়িত বিজ্ঞান তেমন

উৎকর্ষ লাভ করেনি; তবুও তিনি বিজ্ঞান থেকে উপমা গ্রহণ করে মনের ভাবটি প্রকাশ করতে চেষ্টিত হয়েছেন।

নয়নে যে পলক আছে—একবার চোখের পলক পড়লে দৃষ্টির অন্তরায় হবে। কল্পনাটি সংস্কৃত সাহিত্যে বহুস্থানে পাওয়া যায়।

কাল অপরিমেয় ইত্যাদি—কাল অনন্ত। তাকে দিনে বিভক্ত করে মানুষ দৈনন্দিন কাজ চালায়। মানুষ যে দুঃখ ভোগ করে তাকে সে সময়ের পরিমাপে বিভক্ত করে বলে তা সীমাবদ্ধ হয়; তা না হলে, অপরিমেয় কালে ব্যাপ্ত হলে দুঃখ অনন্ত হ'তো।

দিবসগণনায় সুখ আছে—দুঃখের এতদিন গিয়েছে, আরও কিছুদিন গেলে দুঃখ শেষ হবে—এই আশা থাকার জন্য দিন গণনায় সুখ আছে।

এক দুঃখ, এক সন্তাপ, এক ভরসা আছে—একটি গানের বিশ্লেষণ করতে করতে বঙ্কিমচন্দ্র সহসা স্বদেশের পরাধীনতার প্রসঙ্গে এসে পড়েছেন। দেশ বিদেশীর অধীন হয়েছে, এই তাঁর দুঃখ বা সন্তাপ; দেশ আবার স্বাধীন হবে, এই তাঁর ভরসা।

১২০৩ সাল হইতে—বখ্‌তিয়ার খিলজী ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপ জয় করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবত ঐ তারিখই নির্দেশ করতে চেয়েছেন।

সপ্তদশ আরোহী বঙ্গ জয় করিয়াছিল—ইহাই প্রসিদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনী' গ্রন্থে এবং একাধিক প্রবন্ধে এই কিংবদন্তী যে ভ্রান্ত তাহা প্রতিপাদন করতে চেষ্টা করেছেন। বিবিধ প্রবন্ধের দুই খণ্ডে সংকলিত বাংলাদেশ ও বাঙালী সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধগুলি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বঙ্গ-বিজয় কাহিনী সম্পূর্ণ অলীক কল্পনা।

মনুষ্যত্ব মিলিল কৈ ইত্যাদি—বাঙালীর মনুষ্যত্ব, একজাতীয়তা, বিদ্যা, গৌরব সবই বিলুপ্ত হয়েছে—এইটাই বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষোভ।

শ্রীহর্ষ—প্রাচীন বাঙালী সম্রাট আদিশূর যজ্ঞ করবার জন্য যে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে কান্যকুব্জ থেকে এনেছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম।

ভট্টনারায়ণ—কান্যকুব্জ থেকে আনীত অপর ব্রাহ্মণ; ইনি 'বেণীসংহার' নামক সংস্কৃত নাটক রচনা করেছিলেন।

হলায়ুদ—লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী বলে কথিত; 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' গ্রন্থের রচয়িতা।

লক্ষ্মণ সেন—সেন বংশের বিশিষ্ট রাজা—বল্লাল সেনের পুত্র। এঁর সময় বাংলাদেশ নানা বিষয়ে উন্নতি লাভ করেছিল; ঠিক এঁর রাজত্বকালেই মুসলমানেরা নবদ্বীপ জয় করেছিল কিনা সে-বিষয়ে অনেক ঐতিহাসিক সন্দেহ পোষণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ্মণসেনকে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট রূপেই স্মরণ করেছেন এবং তাঁর মতে সমৃদ্ধিশালী রাজাকে পাওয়া দেশের পক্ষে সৌভাগ্যজনক বলে মনে করেছেন।

সম্পূর্ণ অসহ্য সুখের লক্ষণ ইত্যাদি—সুখের পরিমাণ অধিক হলে তা মানুষের দেহ ও মনকে বিচলিত করে দেয়। গভীর সুখে যখন মানুষের অন্তর নিমজ্জিত

হয় তখন তার বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্র সেই অচঞ্চল সুখের কথা বলেন নি। তিনি যে স্বদেশপ্রেমজ আনন্দের কথা বলেছেন, সক্রিয়তাই তার ধর্ম।

কাতরোক্তি যত গভীর ইত্যাদি—বাঙালী বহুকাল দুঃখ ভোগ করে এসেছে; সুতরাং দুঃখ সম্পর্কে তার অনুভূতি নিরতিশয় তীব্র। কাতরোক্তি গভীর হলেও বাঙালী তা অনুভব করতে পারে।

দেবপাল দেব—বাংলার পাল বংশের তৃতীয় রাজা। ইনি রাজচক্রবর্তী ধর্মপালের পুত্র। ইনি নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করতেন। ইনি মন্ত্রী কেদার মিশ্রের বুদ্ধিবলে উৎকল, হূণ, দ্রাবিড় ও গুর্জরদের পরাজিত করে আপনার রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন।

জয়দেব—জয়দেব গোস্বামী সেন বংশের প্রথিতনামা রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন। ভক্ত বলে এঁর নাম অনেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। জয়দেবের সংস্কৃত ভাষায় রচিত গীতগোবিন্দ কাব্য প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল নিদর্শন।

গৌড়ী রীতি—সংস্কৃত বিশেষ রচনারীতি। সমাসবহুল, অলংকার-সমৃদ্ধ ও ধ্বনিময় গদ্য রচনা-রীতি গৌড়ী রীতি বলে প্রসিদ্ধ ছিল। গৌড়ের গদ্যরচয়িতারা সাধারণত এই রীতিতেই গ্রন্থ রচনা করতেন। বৈদর্ভী রীতির খ্যাতি ছিল বেশি।

শ্মশান-ভূমি আছে—নবদ্বীপ- নবদ্বীপ গৌড়ের রাজধানী। কিন্তু এখন আর এই নগরে ঐশ্বর্যের সমারোহ নেই; এটি একটি জনপদে পরিণত হয়েছে। এখানে বাংলার গৌরব ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়েছে বলে বঙ্কিমচন্দ্র একে শ্মশান বলেছেন। বঙ্গলক্ষ্মী এখানে গঙ্গাগর্ভে বিলীন হন।

মনে মনে দেখিতে পাই ইত্যাদি- বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গরাজলক্ষ্মীর তিরোধানের একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাটিতে চিত্র ও তাঁর মনের আবেগ দুইই জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অমঙ্গলের নিদর্শনস্বরূপ যে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে বলে বর্ণিত হয়েছে, পুরাতন হলেও সেগুলো বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনাগুণে নূতন আকার ধারণ করেছে।

ত্রয়োদশ সংখ্যা

বিড়াল

কথাসার ও সমালোচনাঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে মার্ক্‌স্ বা এঙ্গেল্‌স্-প্রচারিত সাম্যবাদ এ দেশে বিশেষ প্রচারিত হয়নি। ১৮৪৩ খ্রীঃ কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশিত হয়। তবে বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য সমাজতন্ত্রবাদ বা সাম্যবাদের সঙ্গে কিছুটা পরিচিত ছিলেন। যে অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও তথ্যাবলীর ভিত্তিতে আধুনিক সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত তা বঙ্কিমচন্দ্রকে আকৃষ্ট করেছিল কিনা তা জানা যায় না; তবে উদার মানব-প্রীতির দৃষ্টিতে তিনি মিলের সাম্যতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। ফরাসী

বিপ্লবের সময় থেকে একদল আদর্শবাদী মানুষ যে সাম্যের বাণী প্রচার করে আসছিলেন তা বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় স্পর্শ করে থাকবে। তিনি 'সাম্য' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করে তাতে সাম্যবাদের গোড়ার কয়েকটি কথা বলে বাংলাদেশের কৃষকদের দুর্ভাগ্যের কাহিনী কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। তবে এই গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষিত হলে তিনি এর দ্বিতীয় মুদ্রণের কোনো ব্যবস্থা করেননি। সম্ভবত, সাম্যবাদ তাঁর সময়ে এ দেশের পক্ষে অনুপযোগী হবে মনে করে তিনি এই গ্রন্থের প্রচারে বিশেষ উৎসাহিত হননি। তবে গ্রন্থটি অপূর্ব রচনা।

'বিড়াল' নামক সংখ্যাটিতে বঙ্কিমচন্দ্র বিড়াল ও কমলাকান্তের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সাম্যবাদের আদর্শগত দিকটি পরিস্ফুট করেছেন। মূল বক্তব্য এই যে, এ সংসারের ভোগ্য দ্রব্যে সকলেরই সমান অধিকার। যদি উৎকৃষ্ট ভোগ্য যা কিছু, সবই হয় শ্রেণী-বিশেষের একচেটে অধিকারে তবে সেটা যেমন ন্যায়-নীতি বিরুদ্ধ, তেমনি প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ। এ পৃথিবীতে কেউই অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে আসেনি। ক্ষুধা সকলেরই আছে, সকলেরই খাদ্য চাই, অথচ পায় না—এর কারণ ধন-বৈষম্য ও শ্রেণী-বিদ্বেষ। ধনের অসম-বন্টনের ফলে ধনীর ঘরে প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন সঞ্চিত হয়, আর তারই ফলে দরিদ্র-শ্রেণীর সৃষ্টি হতে বাধ্য। একে তো ধন-বৈষম্যেই শ্রেণী-বৈষম্য, তার উপর ধন-শক্তির জোরে সমস্ত ভোগ্যবস্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কুক্ষিগত হওয়ায় অপরে খাদ্যাভাবে পীড়িত হয় বাধ্য। যদি ভোগী সম্প্রদায় প্রয়োজনাতিরিক্ত ভোগ্য অকারণে ভাণ্ডারে আবদ্ধ না রেখে দরিদ্রের অভাব-মোচনে ব্যয় করে, তবে হয়তো সমস্যা উৎকট হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু কার্যত দেখা যায়, ধনীরা প্রকৃতিতে কৃপণ ও স্বার্থান্ধতার সংকীর্ণচেতা। পরের দুঃখে কাতর হওয়া তাদের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। ধনতান্ত্রিক সমাজে এইভাবে ধনী ও দরিদ্রে একটা ভয়ঙ্কর শ্রেণী-বৈষম্য ও শ্রেণী-বিদ্বেষ দিন দিন প্রবল হতে থাকে। আর এই থেকে সৃষ্টি হয় আরও অনেক সামাজিক অনর্থ। উপরের তলার লোকেদের মধ্যে চলে পরস্পরের তোষণ, দেখা দেয় তোষামুদি, মোসায়েবি, কৃত্রিম আচার-আচারণ আর, তেলা মাথায় তেল দেওয়া। ওদিকে নীচের তলায় অভাবের তাড়নায় মানুষ দুর্নীতি, অন্যায়, অধর্ম করে। পেটের জ্বালায় ভাল মানুষও হয় চোর। সমাজের জীবন হয় বিপন্ন। বিদ্রোহ, আন্দোলন বা উপদ্রবে ঐ জীবনের কেবল বিড়ম্বনাই বাড়তে থাকে। ধনী ও ভোগী সম্প্রদায়ের মুখে শোনা যায় সমাজ বিশৃঙ্খলার অভিযোগের কথা, আর অপর সম্প্রদায় নিজেদের বঞ্চিত-লাঞ্ছিত-শোষিত মনে করে ঐ শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে সমাজতন্ত্রবাদের জিগীর তুলে।

এই যে এ যুগের প্রকাণ্ড একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক (socio economic) সমস্যা, এরই উপর আলোকপাতের উদ্দেশ্যে অথবা সাম্যবাদ-আদর্শের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে চিন্তা জাগানোর উদ্দেশ্যে 'বিড়াল' দপ্তরটি পরিকল্পিত। বাস্তব জীবনের সমস্যায় ভরা এমন একটি কঠিন তাত্ত্বিক আলোচনা যে কী করে 'কমলাকান্তের দপ্তর'

এর অন্তর্ভুক্ত হলো সেইটাই দেখবার বিষয়। দপ্তর রচনার মৌল প্রকৃতির সঙ্গে এখানকার বিষয়বস্তুর বতোই না বিরোধ। প্রকৃতি-পরিচয়ে বা রস-সাহিত্য বা রস-সন্দর্ভ, তার মধ্যে অর্থনৈতিক তত্ত্বালোচনার স্থান কিরূপে সম্ভব হলো? বস্তুত 'বিড়াল' প্রবন্ধে বঙ্কিমের রস-সন্দর্ভোচিত কলানৈপুণ্য-প্রদর্শনের কৃতিত্ব রীতিমত বিস্ময়কর। এখানে মনন-গভীরতার সঙ্গে নিপুণ পরিকল্পনা ও নিপুণতর উপস্থাপনার যে পরিচয় দিতে হয়েছে, আঙ্গিক-রচনায় যে উদ্ভাবনশক্তি, কল্পনা-বিস্তারে যে শিল্প-চাতুরী ও ভাবের বাণীমূর্তি-রচনায় যে রস-সৃষ্টির দক্ষতা দেখাতে হয়েছে, তার তুলনা সত্যই বিরল। 'বিড়াল' যেন একটি ক্ষুদ্র নাটিকা: যেখানে সংলাপে অংশ গ্রহণ করেছেন এক ব্রাহ্মণ ও এক মার্জারী। নিঃসন্দেহে এর আস্বাদন কৌতুক-নাট্যের, আবার রূপক-নাট্যেরও। ব্রাহ্মণ এখানে ব্রাহ্মণ নয়, মার্জারীও মার্জারী নয়। তারা এক এক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বা প্রতীক স্থানীয়। তাদের মুখে ব্যক্ত হয়েছে সেই সেই সম্প্রদায়ের কথা অথচ সঙ্গতি বজায় রাখা হয়েছে ঐ ব্রাহ্মণ বা মার্জারীর নিজস্ব জীবনধারা, প্রকৃতি-ধর্ম ও পরিবেশ-পরিমণ্ডলের সঙ্গে। বিড়াল-জীবনের যা বাস্তব পরিবেশ তার সমস্ত খুঁটিনাটি অদ্ভুতভাবে বজায় রাখা হয়েছে এমন কি তার 'মেও-মেও' ডাকটিকেও কাজে লাগানো হয়েছে যেমন আঙ্গিকপূরণে তেমনি কৌতুক-রস-সঞ্চারে। বঞ্চিত সর্বহারা দরিদ্র সমাজের প্রতিনিধি বিড়াল ও ভোগী ধনি সমাজের প্রতিনিধি কমলাকান্তকে দিয়ে উভয় সমাজের বাদ-প্রতিবাদ সাজানো হয়েছে এমন ভাবে যে আসল সমস্যাটির বিশ্লেষণ বড়ো না হয়ে, বড়ো হয়ে উঠেছে কৌতুকরসোচ্ছল রচনার আস্বাদন। এখানকার বাগ্‌ভঙ্গিতে নিয়ত ঝরে পড়ছে যে ব্যঙ্গগর্ভ পরিহাস-রস, তারই আবর্ষণে পাঠক এমন মুগ্ধ হয়ে পড়ে যে, তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের শুষ্কতা তার মনে কোনোই আমল পায় না। শুধু হঠাৎ যখন কমলাকান্ত অসহ্য হয়ে বলে ওঠেন, "থাম! থাম! মার্জার পণ্ডিতে! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিষ্টিক। সমাজবিশৃঙ্খলার মূল!" তখন পাঠক চকিতচিত্তে-আবিষ্কার করেন সত্যই তো, এতক্ষণ তা হ'লে 'সোশিয়ালিজম্'-এর বক্তৃতা হচ্ছিল বিড়ালের মুখে! অথচ কী রসালো ঐ সমাজতত্ত্বের ব্যাখ্যা। আবার কমলাকান্তের মুখে ধনীর ধনবৃদ্ধির পক্ষে—ওকালতি শোনা যায়, আর অমনি বুঝতে হয়, তবে বুঝি এটা ধনতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ-এর আলোচনার আসর। কিন্তু তাতেই বা ক্ষতি কি! প্রচুর কৌতুক-পরিহাস-রসের সংযোগে অমন একটা তত্ত্বালোচনা যদি সুনিষ্পন্ন হয়, তবে তো আমাদের লাভ দ্বিবিধ। এক তত্ত্ব-ব্যাখ্যা, আর এক রস-রচনা।

'বিড়াল'-এর ভূমিকাটি অতীব রমণীয়। হাস্যরস-সৃষ্টির কী উপভোগ্য কৌশলই না এখানে অবলম্বিত হয়েছে। আফিমের মহিমা দপ্তরী-রচনার বহুস্থলেই অনুভব করতে হয়, কিন্তু এখানকার মহিমা বুঝি আর সকলকে ছাড়িয়ে গেছে। "ডিউক বলিল, "মেও!"—এমন একটা ব্যাপার আর কোথাও ঘটতে দেখা যায়নি। আফিমের অঘটন ঘটন-পটীয়সী শক্তিতে ওয়াটার্লু-যুদ্ধজয়ী ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের

বিড়ালত্ব-প্রাপ্তি ঘটেছে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ কমলাকান্ত ওয়াটার্লুর মাঠে ব্যূহ-রচনায় ব্যস্ত থাকায় লক্ষ্য করতে পারেননি যে, তাঁর ব্যূহ-রচনার স্বপ্নের ফাঁকে এক মার্জারসুন্দরী প্রসন্ন-দত্ত নির্জল দুগ্ধ পানে পরিতৃপ্ত হয়ে আপন মনের সুখ এ জগতে প্রকটিত করার অভিপ্রায়ে, অতি মধুর স্বরে বলছে, "মেও!" 'সমাজতন্ত্রবাদ বনাম ধনতন্ত্রবাদ' যে প্রবন্ধের বিষয়-পরিচিতি তার কি না এমন একটি উদ্দাম হাস্যরসাত্মক ভূমিকা! কৌতুকোদ্দীপ্ত কৌতূহল পাঠকচিত্তকে এক মুহূর্তে একাগ্র করে তোলে রচনাটির প্রতি। লেখকও সুবিচার করেন বাঞ্ছিত রসের অজস্র পরিবেশনে পাঠকের ঐ প্রত্যাশার প্রতি। মার্জার ও কমলাকান্তের প্রথম পরিচয় বা মন-বোঝাবুঝির পালাটি বেশ প্রশস্ত করেই রচিত হয়েছে, এবং ঐ সূত্রে ব্যঙ্গ-কৌতুকে আসরটি জমিয়ে নিয়ে তবে শুরু হয়েছে দিব্যকর্ণ প্রাপ্তিপূর্বক মূল বক্তব্যের মহড়া। মধ্যবর্তী অংশে অনেক মূল্যবান মন্তব্য স্থান পেয়েছে, যাদের মধ্যে কোথাও কড়া ব্যঙ্গ, কোথাও বা মহাবচনের আমেজ, কোথাও বা রূঢ় সত্যের আবৃত্তি। "বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্যালয় সকল দেখিয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এতদিনে এ কথাটি বুঝিতে পারিয়াছ।"

'চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী।'

'যে কখন অন্ধকে মুষ্টিভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড় রাজা ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না—সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হতে রাজি। তবে ছোটলোকের দুঃখে কাতর! ছিঃ কে হইবে!'

'তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ।'

'যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল ** মূর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলোয়াড়ের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল—তবেই তাহার পুষ্টি।** তাহার রূপের ছটা দেখিয়া, অনেক মার্জার কবি হইয়া পড়ে।'

'চোরের দণ্ড আছে নির্দয়তার কি দণ্ড নাই?'

'অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।' মূল তর্ক এইখানে যে, মার্জারীর মতে সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ হলো ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হলে দরিদ্রের কি ক্ষতি? ধনী সমাজের প্রতিনিধি কমলাকান্ত বলেছেন যে, সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নেই। মার্জারীর প্রত্যুত্তর তীক্ষ্ম ও যুক্তিপূর্ণ। যদি আমি খেতে না পাই, তবে সমাজের উন্নতি নিয়ে কি হবে? কমলাকান্তের ক্রুদ্ধ বক্তব্য হলো যে, সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রদের প্রয়োজন না থাকতে পারে, কিন্তু ধনীদের আছে। চোরের দণ্ড বিধান তাই কর্তব্য।

এইভাবে এই একটি রচনায় এত বেশি স্মরণীয় মন্তব্য ও লোভনীয় বচন স্থান পেয়েছে যে, এর বিষয়গত মূল্য ও রচনা-রসের আকর্ষণ হয়েছে তুল্যানুতুল্য। বিচিত্র

আবেদনের এমন সুসমঞ্জস পরিবেশন কমলাকান্তের হাতে আর কোথাও পাওয়া যায়নি।

পাঠপ্রসঙ্গে—আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম ইত্যাদি—ইউরোপের ইতিহাস ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজে বিশেষ পরিচিত ছিল—বঙ্কিমচন্দ্র একটি পরিচিত প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন ওয়াটার্লু যুদ্ধের ইংরেজ সেনাপতি ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের কাছে পরাজিত হন।

ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া ইত্যাদি--কৌতুকের লঘু ভঙ্গিটি লক্ষণীয়। 'আমার দুর্গোৎসব' ও 'একটি গীত' এই দুইটি গুরু প্রসঙ্গের পর 'বিড়াল' ও 'ঢেঁকি, এই দুটি রচনায় লঘুকৌতুকের সুরটি ফিরে এসেছে।

দুধ আমার বাপের নয় ইত্যাদি—এখানে কমলাকান্তের বিশিষ্ট অধিকারবোধ প্রকাশিত হয়েছে। যার প্রয়োজন আছে তারই কোনো বস্তুতে অধিকার আছে সমভোগবাদের এই ভাবটির অনুসরণেই সম্ভবত কমলাকান্ত এই মতটি পোষণ করেছেন।

সকাতর চিত্তে—এই সকাতরতা বিড়ালের দুগ্ধপানের জন্য নয়—আরাম ত্যাগ করে শয্যা ছেড়ে উঠতে হয় বলে কমলাকান্ত কাতর হয়ে পড়েছেন।

প্রভেদ কি—মানুষ ও বিড়ালের মধ্যে পার্থক্য বলতে এখানে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে প্রভেদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তোমাদের বিদ্যালয় সকল দেখিয়া ইত্যাদি—বিড়াল বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চতুষ্পদ প্রাণী গর্দভের সঙ্গে তুলনা করতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করলো না।

তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকে ইত্যাদি—ধনীরা যে ধন সঞ্চয় করে, তার মধ্যে নিতান্ত অল্প অংশই তাদের প্রয়োজনে লাগে। তাদের সঞ্চিত ধনের অধিকাংশই তাদের প্রয়োজনে লাগে না। তারা যে ধন সঞ্চয় করে, তা দরিদ্রের অংশ—দরিদ্রকে বঞ্চিত করে তারা ধন সঞ্চয় করে। এই প্রয়োজনাতিরিক্ত ধনসঞ্চয় সমাজতন্ত্রবাদে নিন্দিত। এর জন্যই ধনী-দরিদ্রে বৈষম্য ঘোরতর হয়ে ওঠে এবং দরিদ্রের অভাবের সীমা থাকে না। দরিদ্রের জন্য ধনীরাই পরোক্ষভাবে দায়ী।

মাছের কাঁটা, পাতের ভাত নর্দ্দমায় ফেলিয়া দেয় ইত্যাদি- ধনীরা উদ্বৃত্ত অর্থ অপব্যয় করে অথচ তা দিয়ে কত দরিদ্রকে প্রতিপালন করা যায়। দরিদ্রের দুঃখমোচনের কথা চিন্তা না করে তারা কেবল আপনাদের খেয়ালে খাদ্য ও অর্থের অপচয় করে।

ছোটলোকের দুঃখে কাতর ইত্যাদি—এই ছত্রের অন্তরালে বঙ্কিমচন্দ্রের সহৃদয় চিত্তের গভীর ক্ষোভ তীব্র ব্যঙ্গের আকারে ব্যক্ত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র অভিজাত-সম্প্রদায়ের কথাই কেবল চিন্তা করেছেন বলে যে একটি অভিযোগ অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে এনেছেন, এই ধরণের বহু ছত্রে তা খণ্ডিত হয়েছে। স্বদেশ ও বিদেশের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অংশের সঙ্গে পরিচিত হলেও বঙ্কিমচন্দ্র নিছক বুদ্ধিজীবী ছিলেন না, তিনি আপনার হৃদয়কে দেশের সাধারণ দরিদ্র মানুষের দিকেও প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধেও এর পরিচয় আছে।

এ পৃথিবীর মৎস্য-মাংসে ইত্যাদি—এ যুগের সর্বহারাদের এই তো দাবি। সকল বিষয় থেকে বঞ্চিত হয়ে কোনো মতে জীবনযাপন করাকেই তারা ভাগ্য বলে মেনে নিতে পারে না—মানুষের অধিকার নিয়ে মানুষের মতো বাঁচবার দাবিই তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে মানবতার অধিকারের আদর্শ প্রচারিত হয়েছিল—ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লবের পর অর্থনৈতিক জীবন প্রাধান্য লাভ করায় এই নূতন সুরটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তবে আর কেহ ধন সঞ্চয় করিবে না ইত্যাদি—এটা সমাজতন্ত্র-বিরোধী পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদ্‌দের যুক্তি। ধনীরা অবাধে ধন সঞ্চয় না করতে পারলে তারা ধন সঞ্চয়ই করবে না এবং তাতে সমাজের ক্ষতি হবে—এই প্রতিক্রিয়াশীল যুক্তিকে বঙ্কিমচন্দ্র কটাক্ষই করেছেন।

আমি যদি খাইতে না পাইলাম ইত্যাদি—বঙ্কিমচন্দ্র বিড়ালের মুখে যুক্তিনিষ্ঠ সমাজতন্ত্রবাদের কথা বসিয়েছেন। সমাজের ধনসঞ্চয়ের সঙ্গে ক্ষুধার্ত ও বঞ্চিত জনসাধারণের যোগ কোথায়? ধনীর ধনবৃদ্ধি না হলে দরিদ্রের কোন ক্ষতি নেই।

বিজ্ঞ লোকের মত এই যে ইত্যাদি—যুক্তির দিক দিয়ে সমাজতন্ত্রবাদ যে অকাট্য কমলাকান্তের উক্তিতে তাহা প্রকাশ পেয়েছে। কৌতুকের ভঙ্গিটি উপভোগ্য। পরাজিত হয়ে তিনি বিজ্ঞ লোকের ধর্ম, উপদেশ প্রদান তাই গ্রহণ করেছেন।

পার্কার—থিয়োডর পার্কার। প্রখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ্ লেখক। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে যাঁরা ধর্মতত্ত্বান্বেষী ছিলেন, পার্কারের গ্রন্থাবলী তাঁদের নিত্যপাঠ্য ছিল।

পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে ইত্যাদি—বঙ্কিমচন্দ্র এখানে খ্রীস্টীয় মিশনারীদের পতিতোদ্ধারের আদর্শ এবং সম্ভবতঃ ব্রাহ্মধর্মের সংস্কারের আদর্শকে কটাক্ষ করেছেন। কটাক্ষের লক্ষ্য বোধহয় কেশবচন্দ্র সেনের মতবাদ। ব্রাহ্মধর্মের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব অনুকূল ছিল না—ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর একাধিকবার মতান্তর হয়েছিল।

চতুর্দশ সংখ্যা

ঢেঁকি

কথাসার ও সমালোচনা: ঢেঁকি নিবন্ধটির কথা-সমাবেশ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রথমে কমলাকান্ত ঢেঁকিকে লিখেছেন, আর্যসভ্যতার ফলস্বরূপ এক পরোপকারের যন্ত্ররূপে। ঢেঁকির এই মাহাত্ম্যের কারণ অনুসন্ধানে ঢেঁকিশালে গিয়ে কমলাকান্ত লক্ষ্য করলেন তার নিয়ত খানায় পড়ার আজগুবি ব্যাপার। তবে কি খানায়-পড়ার সঙ্গে মহৎবৃত্তি-চর্চার কোনো সংযোগ আছে? কিন্তু রামচন্দ্র ভায়া দুবেলা খানায় পড়ে থাকেন। তাঁর পরহিতব্রত উদ্দেশ্য নেই। তবে ঢেঁকির এমন public spirit

কোথা থেকে এলো ? এইবার কমলাকান্ত আবিষ্কার করলেন ঢেঁকির সক্রিয়তার পশ্চাতে রমণীপাদপদ্মের প্রভাব। ঐ শ্রীচরণ পিঠের উপর পেয়ে ঢেঁকি সাতকোটি বাঙালিকে অন্ন যুগিয়ে চলেছে।

এই ধরনের কল্পনা থেকে কমলাকান্ত যখন বলতে শুরু করেন, 'আয় ভাই ঢেঁকির দল! তোমাদের বিদ্যাবুদ্ধি বুঝেছি। যখনই পিঠে রমণী পাদপদ্ম ওরফে মেয়ে লাথি পড়ে, তখনই তোমরা ধান ভান' ইত্যাদি, তখনই মনে হয় বুঝি তিনি বাঙালী যুবকের অকর্মণ্যতা ও তাদের ওপর নারী আধিপত্যের প্রতি কটাক্ষ করছেন, কিন্তু আসলে এই পরিকল্পনাটির কোন সুষ্ঠু রূপ গড়ে ওঠার পথে অন্তরায় হয়েছে অব্যবহিত পরবর্তী মন্তব্যগুলি, যাতে মনে হয় 'ঢেঁকির দল' বলতে ঢেঁকিকেই বোঝানো হয়েছে, এবং 'ঘরের ঢেঁকি কুমীর' ও 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে'—এই দুটি প্রবচন অবলম্বন করে কিঞ্চিৎ বাগ্‌বিন্যাস করা হয়েছে মাত্র। এর পরে 'কমলাশ্রমে' গিয়ে আফিম চড়িয়ে তবে কমলাকান্ত জ্ঞাননেত্রে দেখলেন, এ সংসার ঢেঁকিশালা। এতক্ষণে ঢেঁকি হলো একটা রূপকের ছাঁচ, যে ছাঁচে ফেলে দেখে নেওয়া হলো সংসারের অনেকগুলি জিনিষের উদ্ভট স্বরূপ। এই ছাঁচটার আঙ্গিকে নেওয়া হয়েছে ঢেঁকি, তার গর্ত বা গড়, তার পতন বা পেষণ, ধান ও চাল। ঢেঁকি গড়ের মধ্যে ধান পিষে তা থেকে চাল বার করে। ঢেঁকিশালার এই কাণ্ডটাই কমলাকান্ত লক্ষ্য করেন, কতো বড় বড় ইমারত, বৈঠকখানা, রাজপুরী বা অনেক সাধারণ গৃহস্থবাড়ীতেও। সুতরাং এ সংসার ঢেঁকিশালাই তো। এখানে জমিদার-ঢেঁকি, আইনকারক-ঢেঁকি, বিচারক-ঢেঁকি যেমন আছে, তেমনি আছে বাবু-ঢেঁকি, গৃহিণী-ঢেঁকি, আর সর্বাপেক্ষা ভয়ানক, লেখক-ঢেঁকি। প্রতি ক্ষেত্রেই আছে যান্ত্রিক পেষণ ও তজ্জনিত পিষ্ট বস্তু থেকে ভিন্নতর বস্তু-নির্যাস।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় কমলাকান্তও একটা মস্ত ঢেঁকি। নেশার গড়ে মনোদুঃখ-ধান্য পিষে দপ্তররূপ চাল বার করাই এই ঢেঁকির কাজ। ঢেঁকির রূপক রচনা শেষ হলে একটা আফিমী স্বপ্নরচনা করা হয়েছে যার মধ্যে কমলাকান্ত-ঢেঁকির স্বর্গে অভিযান ও দেবরাজের কাছে বকশিস্‌লাভ বর্ণিত হয়েছে। নেশার ঘোর ভাঙলো প্রসন্ন'র মধুর চীৎকারে ও গালাগালিতে। উর্বশী ও একসের অমৃত-এর বাস্তব সংস্করণ হলো প্রসন্ন ও তার দেওয়া একসের দুধ।

'ঢেঁকি'-নিবন্ধের কেন্দ্রীয় বিষয়টি সম্ভবত 'এ সংসার ঢেঁকি-শালা', যেমন 'পতঙ্গ' 'মনুষ্যমাত্রেই পতঙ্গ'। কিন্তু 'পতঙ্গ'র মতো এখানকার চিন্তা কল্পনাগুলি সুসংহত হয়ে মূল ভাবটির পরিস্ফুটনে নিটোল একটা পরিমণ্ডল রচনা করতে পারেনি। এখানকার চিন্তাগুলি ছিন্ন-ভিন্ন, কেবল প্রত্যেকটিতে ঢেঁকির বস্তুরূপের ছোঁয়া লাগানো আছে মাত্র। খেয়ালী কল্পনার বিলাস ও গুরুত্বপূর্ণ ভাবের প্রতিষ্ঠা, এ দুয়ের-বাঞ্ছিত উদ্বাহ সমন্বয় এখানে দেখা যায় না। রচনাভঙ্গিতে ব্যঙ্গ-কৌতুকের আয়োজনের ঘটা যতখানি, আসল পাওনা সে অনুযায়ী নগণ্য। অজা-যুদ্ধের মতো ঐ কসরতটাকে

মনে হয় বহ্বারম্ভে লঘু-ক্রিয়া। যেন ঐ রসসৃষ্টির পরিকল্পনাটি এখানে কিঞ্চিৎ শিথিল, সংকল্প যথেষ্ট দৃঢ় নয়, তাই রস তেমন দানা বেঁধে ওঠেনি—। 'এ সংসার ঢেঁকিশালা'—সমস্ত বক্তব্য এই ভাব-কেন্দ্রের অভিমুখী হয়নি। বরং অধিকাংশ বক্তব্যই এই ভাবের সঙ্গে শিথিলভাবে সম্পৃক্ত।

ঢেঁকি যে আর্যসভ্যতার অনন্ত মহিমার ফল, আর্য সাহিত্য, আর্য দর্শন কিছুই এর কাজে লাগে না; কেননা, আর কেউ ধানকে চাল করতে পারে না,—এই ধরণের চিন্তাবিন্যাসে ব্যঙ্গের সুরটি বেশ চড়া। 'ঢেঁকিই আর্যসভ্যতার মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র,—শ্রাদ্ধাধিকারী,—নিত্য পিণ্ডদান করিতেছে', খুবই কড়া ব্যঙ্গের আয়োজন, কিন্তু কেন যে এই 'পিণ্ডদানে'র উদ্ভট কল্পনা তা বোঝা যায় না। সমাজে, সাহিত্যে, ধর্মসংস্কারে, রাজসভায়, ঢেঁকি আর্যসভ্যতাকে পিণ্ডদান করছে। তখন একটা ব্যঙ্গের ছাঁচ গড়ে ওঠে। ঢেঁকি আছে, ধান চাল হয়। এই চালের পিণ্ডদানে আর্যসভ্যতা টিকে আছে। নিত্য পিণ্ডদানে এই সভ্যতা প্রেতলোকে অবস্থান করছে। তবে শীঘ্রই তার মুক্তিলাভ ঘটবে।

রচনার ব্যঙ্গটুকুর মধ্যে আছে 'ঢেঁকি-অবতার'-এর ব্যঞ্জনা। কিন্তু এর পরেই এলো ঢেঁকির খানায় পড়ার চিত্র নিয়ে হাল্কা পরিহাসে মত্ততা, এলো রমণী-পাদপদ্মের মহিমার কথা, আর এলো 'ঘরের ঢেঁকি কুমীর' বা 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে'—এই সব প্রসঙ্গ। প্রথমদিকের ব্যঙ্গের ছাঁচটির সঙ্গে এদের সংলগ্নতা কোথাও নেই। 'এ সংসার ঢেঁকিশালা'—ঢেঁকি যত রকমেরই হোক, ঐ মেয়েমানুষের শ্রীচরণ বা পিঠে রমণী-পাদপদ্ম ওরফে মেয়ে লাথি ব্যতীত তাকে সক্রিয় দেখবার উপায় নেই, এদেশের পুরুষদের ক্ষেত্রেও নেই, তবে সমগ্র পরিকল্পনার বনিয়াদ দৃঢ় হয়ে উঠতে পারতো। কমলাকান্ত নিজেই ঢেঁকি হওয়ার জন্য ব্যস্ত। কারণ তাঁরও আছে গড়, আছে পেষণের ধান এবং আছে বার করার মতো চাল। নেশার গড়ে মনোদুঃখ ধান্য পেষণ করে কমলাকান্ত-ঢেঁকি বার করেন দপ্তর-চাল। উক্তিটি বড়ই ভাবগাঢ়। দপ্তর-এর স্বরূপ হলো রস-রচনা, ধাতু যার হিউমারে গড়া; আর কমলাকান্তীয় হিউমার-এর উৎপত্তি ব্যক্তিজীবন, সমাজ, পরাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ের বেদনাবোধ (pathos) থেকে। মানুষের জন্য, মনুষ্য-সমাজের দোষত্রুটির জন্য বেদনাতুর তাঁর হৃদয়। দপ্তরী হাস্য-কৌতুকরসের মধ্যে সেই বেদনারই মর্মস্পর্শী প্রকাশ। সুতরাং বলা যায়, এই বিচ্ছিন্ন উক্তিটুকুর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে কমলাকান্তের দপ্তরের মর্মবাণী।

পাঠ্যপ্রসঙ্গে—আর্য্য সভ্যতার অনন্ত মহিমায়—ঢেঁকি ভারতবর্ষেই দেখা যায়। সেইজন্য কমলাকান্ত একে আর্য সভ্যতার বিশেষ দানরূপে কল্পনা করেছেন। ঢেঁকির উদ্ভাবনের জন্য আর্য সভ্যতার মাহাত্ম্য-কল্পনার মধ্যে কৌতুকের ভাবটি লক্ষণীয়।

নিত্য পিণ্ডদান করিতেছে—শ্রাদ্ধের সময় তণ্ডুলাদি দিয়ে পিণ্ড দান করতে হয়। ঢেঁকি নিত্য চাল তৈরী করে বলে কমলাকান্ত তাকে নিত্য শ্রাদ্ধাধিকারী বলেছেন।

দুঃখের মধ্যে ইহাতেও আর্য্য সভ্যতা ইত্যাদি—প্রাচীন যুগের আর্য সভ্যতার

মৃত্যু হয়েছে। বর্তমানে তার যে মূর্তি দেখা যায় তাহা 'ভূতে'র মূর্তি। তবে মনে হয় যে, গয়ায় পিণ্ডদান করলে যেমন প্রেতযোনি মুক্ত হয়, তেমনিই বর্তমান যুগের ঢেঁকিদের কৃতিত্বে আর্য সভ্যতার অবসান হবে। 'ভূত' শব্দে প্রেতযোনি ও অতীত, 'গয়া' শব্দে গয়াতীর্থে মুক্তি ও বিলোপ, এবং 'ঢেঁকি' শব্দে এ যুগের অকর্মণ্য বাঙালী সম্প্রদায়—এই দুই জোড়া অর্থ লক্ষণীয়। এই অংশে কৌতুকের লঘু সুরটি ফুটে উঠলেও এর মূলে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি গভীর বেদনাবোধ প্রচ্ছন্ন আছে।

শৌণ্ডিকালয়ের বাহিরে ইত্যাদি—অর্থাৎ রামচন্দ্র শৌণ্ডিকালয়ের মদ্যপানের জন্য ব্যয় শৌণ্ডিকতার পরিচয় দিয়ে পরের অর্থাৎ শৌণ্ডিকের অর্থপ্রাপ্তিরূপ উপকার করেন।

দুগ্ধপোষ্য বাঙ্গালী জাতি—শিশু দুগ্ধপোষ্য। বাঙালী দুগ্ধ পান করে এবং সে শিশুর মতো অসহায় ও প্রতিপালনীয়। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে কৌতুকের আবরণে বাঙালী জাতির শক্তিহীনতার প্রতি কটাক্ষ করে অন্তরের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

তুমি স্বয়ং ঘটোধ্নী হইয়া ইত্যাদি—কমলাকান্তের কল্পনার অভিনবত্ব লক্ষণীয়।

সাধারণ আত্মা—public spirit শব্দগুচ্ছটির কমলাকান্তকৃত কৌতুককর বঙ্গানুবাদ। কমলাকান্তকৃত এই বঙ্গানুবাদটি ইংরেজী শব্দের আক্ষরিক অনুবাদের প্রয়াসের প্রতি কটাক্ষ; হাস্যরস-সৃষ্টির কৌশলও বটে।

ওহে ভাই ঢেঁকির দল ইত্যাদি—কমলাকান্ত এখানে বাংলার পুরুষবৃন্দকে কটাক্ষ করতে চেয়েছেন বলেই মনে হবে, কিন্তু পরবর্তী অংশে ঢেঁকির রূপকমালা রচনায় এই রমণী-পাদপদ্মের প্রসঙ্গ না থাকায় ব্যঙ্গের ছাঁচটি দৃঢ় হয়ে গড়ে উঠতে পারেনি। এখানে লেখক সম্ভবত বলতে চান,—বাঙালী পুরুষদের অনেকেই নির্জীব; কেবল পত্নীর তাড়নায় তারা কোনো কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়। রমণী কর্তৃক তাড়িত না হলে তাদের কার্যোদ্যম দেখা যায় না। বাংলাদেশের পুরুষ জড়পিণ্ডবৎ, অলস ও অকর্মণ্য।

ঘরের মধ্যে থাকিয়া ইত্যাদি—কমলাকান্ত 'ঘরের ঢেঁকি কুমীর' এই প্রবাদ-বচনটি স্মরণ করেছেন। পরে তিনি 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে' এই প্রবাদটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। 'ঢেঁকি' শব্দটি সাধারণত অপদার্থতা বা বুদ্ধিহীনতার প্রতীকরূপে গৃহীত হয়ে থাকে। কমলাকান্ত ঢেঁকিকে বিচিত্ররূপে দেখেছেন—প্রবাদ-বচনাদিতে ঢেঁকি সম্পর্কে যে ধারণাগুলি প্রচলিত, সেগুলি তাঁর কল্পনা থেকে বাদ যায়নি।

নিরিখ—খাজনার হার।

জমিদাররূপ ঢেঁকি প্রজাদিগের হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি—খাজনা আদায়ের জন্য বা অন্য কারণেও জমিদার প্রজার উপর যে অত্যাচার করে বঙ্কিমচন্দ্র তা 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন। নির্যাতিত প্রজাদের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সহানুভূতি ছিল।

মিনিট-রিপোর্টের রাশি গড়ে ভাঙিয়া-পিষিয়া—আইনকারগণ যে আইন প্রণয়ন করেন সেগুলি প্রায়ই বিচারবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। নিছক বিভিন্ন বিবরণীর উপর নির্ভর করে অনেক আইন প্রণীত হয়।

গৃহিণী ঢেঁকি একাদশীর গড়ে ইত্যাদি—গৃহিণী একাদশীর দিন বাজার খরচ কমাতে কমাতে সকলের অনাহারের ব্যবস্থা করেন। যেখানে ব্রতের উদ্দেশ্য ছিল অল্পাহার সেখানে তিনি অনাহারের বিধান দিতে চান।

সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক দেখিলাম ইত্যাদি—সাধারণ বিদ্যালয়-পাঠ্যপুস্তকে যা পরিবেশিত হয় তার মান এত নিকৃষ্ট যে, তাতে বাগ্‌দেবীকে নিপীড়ন করার কল্পনা অসংগত হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের আমলে বিদ্যালয়-পাঠ্যগ্রন্থের মান নিতান্তই নীচু ছিল।

মনোদুঃখ চাউল পিষিয়া—এখানে শোনা যায় কমলাকান্তের মর্মবাণী। দপ্তরের মধ্যে যা ব্যক্ত হয়েছে তার প্রায় সবটার মূলেই বঙ্কিমচন্দ্রের মনোবেদনা প্রত্যক্ষভাবে বা প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান। শিল্পী ও চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র আপনার হৃদয়ের বেদনাকে প্রকাশ করার জন্য দপ্তর-রচনার বিশিষ্ট ভঙ্গিটি গ্রহণ করেছেন। তাঁর মনোবেদনা জাতি ও দেশের জন্য।

কমলাকান্তের পত্র

দপ্তরগুলির রচনা ও প্রকাশের প্রায় দশ বৎসর পরে কমলাকান্তের পত্রগুলি প্রকাশিত হয়। দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির পর বঙ্কিমচন্দ্র এই কখানি পত্র নিয়ে কমলাকান্তকে পুনরায় বঙ্গদর্শনে হাজির করেন। তখন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পত্রিকার সম্পাদক। কমলাকান্ত চরিত্রটির পরিকল্পনা এমনি করা হয়েছে যে, ত্রিভুবনের যে-কোনো বিষয়ে বা মানবমনের যে-কোনো ভাব অবলম্বন করে কমলাকান্ত তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও মর্মজ্বালা বর্ষণ করতে পশ্চাৎপদ হননি। পত্রগুলিতে দেখা যায়, বিদ্রূপ তীক্ষ্ণতর হয়েছে, কবিত্ব হ্রাস পায়নি। কমলাকান্তের পরিহাস-বিজড়িত উক্তিগুলি ধারালো তীরের মত লক্ষ্য-স্থানগুলি বিদ্ধ করেছে। পত্রাবলীতে ছোট-বড় পাঁচটি পত্র আছে।

প্রথম সংখ্যা

কি লিখিব ?

সারকথা ও সমালোচনা : ভূমিকাংশে 'বস্তু-সংক্ষেপে' বলা হয়েছে এই পত্রের ভূমিকায় পাওয়া ভীষ্মদেব খোসনবীশ ও কমলাকান্তের সম্পর্ক এবং উক্ত খোসনবীশ মারফত দপ্তরটি পত্রিকা-সম্পাদকের হস্তগত হওয়ার কথা। কমলাকান্ত কি লিখবেন, তা যেমন জানতে চেয়েছেন, কেন আদৌ এই পত্র লিখছেন, তাও জানিয়েছেন বেশ ঘটা করে। আসলে কমলাকান্তের মতো এই পত্রাবলীও উৎকৃষ্ট রস-রচনা। প্রথম পত্রে কমলাকান্তের বকলমে বঙ্কিমচন্দ্র দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক অবনতির প্রতিই ইংগিত করেছেন বলে মনে হয়। সাহিত্যের বাজারে দেনা-পাওনার প্রশ্নই আজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে—টাকা দিয়ে যে-কোনো প্রকার রচনাই ক্রয় করতে পারা যায়, অথচ সাধারণ পাঠকশ্রেণীর রুচিজ্ঞান একেবারেই নেই। ভাল জিনিসের মূল্য দিতে তারা শেখেনি। তাই "বঙ্গদর্শন"-এর কাগজও জুতা মোড়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। এমন কি "বঙ্গদর্শন" বলে যে একখানা কাগজ আছে তার খবরই বা কজন রাখে ? "বঙ্গদর্শন" শব্দের প্রকৃত অর্থ কি হতে পারে, অর্থাৎ "বঙ্গদর্শন" কাগজের মূল লক্ষ্য কি, তার কথাই বা ক'জন চিন্তা করে ?

আসল কথা সাহিত্য-সংস্কৃতি, এ সব বিষয় নিয়ে কেউই গভীরভাবে মাথা ঘামায় না। নব যুগক্রম অনুযায়ী কাগজ বার করতে হয়, তাই "বঙ্গদর্শন" বেরোয়। যুগের ফরমাস অনুযায়ী পলিটিক্স্ থেকে শুরু করে ভৌগোলিক তত্ত্বালোচনা, সংক্ষিপ্ত

সমালোচনা, ঐতিহাসিক গবেষণা এমন কি নাটক-নবেল পর্যন্ত সব কিছুই নৈবেদ্য সাজিয়ে না দিলে জন-গণেশের তুষ্টি হয় না। অন্তঃসার-শূন্য রচনার মূল্য বাড়াবার জন্য তাতে অবান্তর কোটেশন, ফুটনোট এবং অলঙ্কারের গুরুভার চাপা দিতে হয়—আসল কথা পাঠকশ্রেণী যতটা না বোঝে, লেখা যেন ততই মূল্যবান হয়ে দাঁড়ায়। লেখকেরাও পেশাদার—পয়সা পেলে তাঁরা চাহিদামত সবরকম রচনার যোগান দিতে পারেন। আফিং পেলে কমলাকান্ত "বঙ্গদর্শন" সম্পাদককে যে-কোন প্রকার লেখাই সরবরাহ করতে পারেন। এ যুগে সংস্কৃতির বাজারে আড়ম্বরেরই দাম—গভীরতার নয়।

প্রসঙ্গতঃ কমলাকান্ত ভীষ্মদেব খোশনবীশ মহাশয়ের পুত্রের জন্যও সম্পাদকের নিকট সুপারিশ করতে ছাড়েননি। বস্তুতঃ, এই সর্ববিদ্যাবিশারদ অকাল কুষ্মাণ্ডটি তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের একটি শ্রেণীপ্রতীক মাত্র। "তিনি চিতোরের রাজা আলফ্রেড দি গ্রেটের একখানি জীবনচরিত দশ পনের পৃষ্ঠা লিখিয়া রাখিয়াছেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্য-সমালোচনা বিষয়ক একখানি গ্রন্থ মহাভারত হইতে সঙ্কলিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে হার্বার্ট স্পেনসারের মত খণ্ডন আছে এবং ডারউইন বলেন যে, মাধ্যাকর্ষণ বলে পৃথিবী স্থির আছে, তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে মালতী-মাধব হইতে চার পাঁচটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।" এই তো সেই বিদ্যাকুলতিলকটির বিদ্যার প্রমাণ। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র সমসাময়িক পণ্ডিতম্মন্যদের ব্যঙ্গবিদ্ধ করেছেন।

সৃষ্টিসাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেই একই অন্তঃসারশূন্য কৃত্রিম সস্তা ভাবের আমদানি করা হয়েছে। সম্ভব-অসম্ভব কথার জাল বুনে একটা রোমাণ্টিক প্রেমের গল্প খাড়া করতে পারলেই সাধারণ পাঠকের তৃপ্তি সাধিত হয়। কিংবা "ডনকুইকসোট" -এর মত কিম্ভূতকিমাকার কিছু সৃষ্টি করলেই চলে। প্রয়োজন হলে এর জন্য কুম্ভীলকবৃত্তি (চৌর্য) গ্রহণে পশ্চাৎপদ হলে চলবে না। স্বাধীন সৃষ্টিতে অপারগ হলে পরিচিত রচনাবিশেষের পুচ্ছগ্রহণে পরিশিষ্ট-রচনা অন্যায় নয়, কাব্যের ক্ষেত্রে ছন্দ-মিলের কৌশলটাকে চট করে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়, তবে শ্রীমধুসূদনের অনুকরণে অমিত্রাক্ষর কাব্যপ্রণয়ন বুঝি সহজেই চলতে পারে। আসল কথা হলো এ যুগের পত্রিকার লেখককে পয়সার জন্য যে-কোন প্রকার লেখা যেমন-তেমন করে খাড়া করতেই হয়। আফিং পেলে কমলাকান্তও এই আধুনিক রীতি গ্রহণ করতে রাজি আছেন:

বর্তমান পত্রের আলোচনা থেকে রহস্যের অন্তরালে শ্লেষটুকু আমরা সহজেই ধরতে পারি। কমলাকান্তের প্রায় সমস্ত রচনার মধ্যেই এই শ্লেষাত্মক ভাব বর্তমান। কিন্তু প্রসঙ্গতঃ এও মনে হয় যে, লেখকের "cynicism" যেন এখানে বড় বেশী তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। পূর্বে তাঁর হাসির পশ্চাতে অশ্রু টলমল করে উঠতো—স্নেহের জারক রসে শ্লেষোক্তির তীক্ষ্ণতা কিছুটা প্রশমিত হতো। কিন্তু এখন যা বেরিয়েছে তা প্রৌঢ় মনের তিক্ততার প্রকাশে ভার-মন্থর।

পাঠপ্রসঙ্গে: বঙ্গদর্শন—কমলাকান্তের পত্রাবলী সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে

প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শন নামটির ব্যাখ্যা কৌতূহলোদ্দীপক হয়েছে। একজনের মতে বঙ্গদেশ দর্শন হলো বঙ্গদর্শন, দ্বিতীয় জনের মতে বঙ্গদর্শন অর্থাৎ বাংলার দাঁত ও তৃতীয় জনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী পূর্ববঙ্গ দর্শন করিবার বিধি অর্থাৎ A Guide to Eastern Bengal.

আপনি কোটেশন ভালবাসেন না ফুটনোটে আপনার অনুরাগ—পাণ্ডিত্যাভিমানী লেখক ও লেখার ভড়ং দেখে যারা ভড়কে যায়, সেইসব সম্পাদক বা প্রকাশক উভয়ের উপর এই বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছে।

চিতোরের রাজা আলফ্রেড্ দি গ্রেট অপরিমিত দম্ভ নিয়ে যে সমস্ত শিক্ষাভিমানী গবেষণাকাজে প্রবৃত্ত হন, তাঁদের অজ্ঞতা যে কত শোচনীয় এখানকার কয়েকটি উদাহরণে সেইটাই ব্যক্ত করা হয়েছে।

একখানি নাটকের সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখিয়াছেন—এখানে কমলকান্তের পরিহাস বিদ্রূপাত্মক হয়ে উঠেছে। নাট্যকার নায়ক-নায়িকার নাম ঠিক করেছেন, এবং নায়িকা শেষ দৃশ্যে নায়কের বুকে ছুরি মেরেই—ছুরি হাতে গান গেয়ে উঠবেন এইসব উদ্ভট পরিকল্পনা খাড়া করা হয়েছে, তবে কাহিনী যে কেমন হবে, নাটকীয় জটিলতা কিভাবে বৃদ্ধি পাবে, সংলাপের চেহারা কেমন হবে, এ সব কিছুই এখনও তিনি চিন্তা করে উঠতে পারেননি।

মেকলের এসের পরিশিষ্ট—মেকলের বইখানি আসলে প্রবন্ধ না উপন্যাস, সে সম্বন্ধে যার জ্ঞান নেই তাকে নিয়ে কমলাকান্ত তাঁর বিদ্রূপ জমিয়েছেন। সাধারণ পাঠকের প্রবন্ধ ও উপন্যাসের মধ্যে পার্থক্যবোধ নেই।

দ্বিতীয় সংখ্যা

পলিটিকস্

কথাসার ও সমালোচনা : সম্পাদকের নিকট কমলাকান্ত আফিং প্রার্থনা করে যে চিঠি লিখেছিলেন তা মঞ্জুর হয়েছে। কিন্তু আফিং-এর বিনিময়ে সম্পাদক লেখা চেয়েছেন—পলিটিকস্-বিষয়ক রচনা। বলা বাহুল্য, রাজনীতি-সম্পর্কিত গবেষণার উদ্বোধন সম্পাদকের আসল উদ্দেশ্য নয়—সাময়িক হুজুক-অনুযায়ী কাগজের কাটতির প্রতি লক্ষ্য রেখে এই ব্যবস্থা। কিন্তু কমলাকান্ত গোড়াতেই বেঁকে বসেছেন। পলিটিক্স্ বলতে তিনি বোঝেন স্বার্থ-সিদ্ধির উপায়। অথচ ' কমলাকান্ত স্বার্থপর নহে—আফিং ভিন্ন জগতে আমার স্বার্থ নাই, আমার উপর পলিটিকেল চাপ কেন ? আমি রাজা না খোসামুদে, না জুয়াচোর, না ভিক্ষুক, না সম্পাদক যে, আমাকে পলিটিক্স্ লিখতে বলেন ?'' সুতরাং রাজনীতির অর্থ কখনও ভিক্ষা (আবেদন-নিবেদন), কখনও চুরি—কখনও ডাকাতি। আর একটি কথা এই যে, এ-কার্যে সূক্ষ্মবুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা প্রায় কিছুই নেই—মহতী কল্পনার অবকাশ

নিতান্তই অল্প। "কমলাকান্ত শর্ম্মা উচ্চাশয় কবি, কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবী পলিটিশ্যান নহে।"

এই জাতীয় কথার অলস রোমন্থন করতে করতে একসময় লেখক শিবে কলুর গরুগুলিকে নিশ্চিন্তে ভোজন করতে দেখে আশ্বস্ত হলেন। আর যাই হোক, গবাদি পশুর নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার মধ্যে পলিটিক্স্ নেই—স্বার্থবুদ্ধির তাগিদে তাদের প্রতিযোগিতায় নামতে হয় না। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের জীবনও ঐ গবাদি পশুর জীবনযাত্রার মতই নিস্তরঙ্গ—কোনো বড় কাজ করবার উৎসাহ আমাদের নেই আমাদের জীবনে পলিটিক্স্-এর ব্যস্ততা একটা হুজুক ছাড়া আর কি? "সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্স্ নাই। 'জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো!' ইহাই তাহাদের পলিটিক্স্!" অর্থাৎ আমাদের রাজনীতি শুধুমাত্র আবেদন-নিবেদনের দরখাস্ত রচনার ইতিহাস-মাত্র। অন্য পলিটিক্স্ যে গাছে ফলে যার বীজ এদেশের মাটিতে লাগবার সম্ভাবনা নেই।

পরবর্তী অংশে একটি রূপক সাদৃশ্য সৃষ্টি করে উপরি-উক্ত ভাবকেই স্পষ্টতা দান করা হয়েছে। শিবে কলুর পুত্র যখন খেতে বসল, তখন ক্ষুধিত কুকুরটি তার অদূরে অন্নকণার প্রত্যাশী হয়ে বসে রইলো, দু'এক মুষ্টি ভিক্ষার অন্নও জুটলো কিন্তু ভিক্ষা করে তো আর চিরকাল চলে না, শেষ পর্যন্ত তার ভাগ্যে জুটলো, ইষ্টকখণ্ড। কলুপত্নীর ঢিল খেয়ে পালিয়ে বাঁচা ছাড়া তার গত্যন্তর রইলো না। আমরাও সেদিন এই পথকুক্কুরটির মতই ইংরাজ প্রভুর নিকট দরবার করে দুই-এক মুষ্টি ভিক্ষা পেয়েছি মাত্র—প্রত্যাশা যখনই সীমা ছাড়িয়েছে তখনই রাজরোষের উদ্যত দণ্ড নেমে এসে নিমেষে আমাদের শান্ত করে দিয়েছে। এই তো আমাদের রাজনীতির ইতিহাস।

কিন্তু এর বিপরীত দৃষ্টান্তও বর্তমান। কলুর বলদের নাদায় মুখ দিয়েছিলো একটি ভীষণদর্শন বৃষ। কলুপত্নী তাকেও বাঁশ নিয়ে তাড়া করেছিল, কিন্তু ষণ্ডামার্ক ষণ্ডের শিং নাড়া খেয়ে পালিয়ে বাঁচল! কমলাকান্ত লিখছেন—"আমি ভাবিলাম যে, এও পলিটিক্স্। দুই রকমের পলিটিক্স্ দেখিলাম, এক কুক্কুরজাতীয় আর এক বৃষজাতীয়।" আবেদন-নিবেদনের প্রহসন ছাড়াও রাজনীতি আছে—আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে অত্যাচারী রাজশক্তির কাছ থেকে অধিকার ছিনিয়ে নেওয়াও রাজনীতির আর এক রূপ। বিসমার্ক এবং গর্শাকিফ-এর রাজনীতি এই শক্তির সাধনা। কার্ডিনাল উলসী-র মত তথাকথিত দেশনায়কেরা কিন্তু চিরকাল শক্তিমান প্রভুর পদলেহন করে স্বার্থসিদ্ধি করেছেন—আমাদের দেশের রায়বাহাদুর ও রাজ-বাহাদুরের দল এই পদলেহনকেই জীবনের ধর্ম করেছিলেন—তাতেই তাঁদের শ্রীবৃদ্ধি। "মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত" নামক রসরচনায় বঙ্কিমচন্দ্র যে মুচিরাম বাবুর ছবি এঁকেছেন, তিনি এই পদলেহী তোষামোদকারী শ্রেণীরই প্রতিভূ। কান্ত মুদীর সময় থেকে আজ পর্যন্ত এদেশের ইতিহাস খুঁজলে এমন বহু চরিত্র পাওয়া যাবে।

এই প্রবান্ধ কমলাকান্ত আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনকে ধিক্কার দিয়েছেন। দেশকে বঙ্কিম প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন বলেই জাতীয়-চরিত্রের বীর্যহীনতায় তাঁর এই তিক্ততা জেগেছে। "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের ঋষিও প্রশ্ন করেছিলেন—"অবলা কেন মা এত বলে?" 'একটি গীত" ও "আমার দুর্গোৎসব' প্রবন্ধদ্বয়ের মধ্যেও বঙ্কিমের বেদনা ও গ্লানি ব্যক্ত হয়েছে। তামসিকতায় আচ্ছন্ন জাতির কানে বীরাচারী তান্ত্রিকের মত, দেশমাতার বোধনকল্পে, তিনি মহামন্ত্র জপ করেছেন; তথাপি মৃত জাতির প্রাণে নবজীবনের প্রবাহ সঞ্চারিত হয়নি। এইটি হলো বঙ্কিমচন্দ্রের তিক্ত আক্ষেপের স্বরূপ। প্রসংগতঃ মনে পড়ে, পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথও তাঁর রাজনৈতিক রচনায় এদেশের ভিক্ষা-প্রবণতাকে বারংবার ধিক্কৃত করেছেন। আবেদন-নিবেদনের রাজনীতিতে তাঁর বিশ্বাস ছিল না, আত্মশক্তিতে বলীয়ান হওয়ার কথা তিনিও বহুবার বলেছেন। স্বরাজ-লাভের জন্য মনকে প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

পাঠপ্রসঙ্গে ঃ এও আর এক ধরনের পলিটিক্স—পৃথিবীতে যত পলিটিসিয়ান আছে, তাদের কেউ কুকুরজাতীয়, কেউ ষাঁড়জাতীয়।

জয় রাধে কৃষ্ণ ভিক্ষা দাও গো—প্রথম দিকে আমাদের দেশের পলিটিক্যাল এজিটেসান ছিল ভিক্ষার নামান্তর—। কেউ নরম সুরে চাইতেন, কেউ গরম সুরে চাইতেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই ভিক্ষাবৃত্তি পছন্দ করতেন না—ভিক্ষায়াম্ নৈব নৈবচ, এই ছিল তাঁর মতবাদ। আনন্দমঠের যিনি রচয়িতা তাঁর পক্ষে এটাই প্রত্যাশিত। রবীন্দ্রনাথও এই ভিক্ষাবৃত্তির যথেষ্ট নিন্দা করেছেন। তাঁরা উভয়ে আত্মশক্তি জাগ্রত করবার কথা বলেছেন।

জাত পলিটিসিয়ান না হ'বে কেন?—আবেদন-নিবেদন খানিকটা সফল হলে আবার সাহস পেয়ে আর এক প্রস্থ আবেদন-নিবেদন করা—এইভাবে কিস্তিতে কিস্তিতে কিছু আদায় করবার চেষ্টা এ এক ধরনের পলিটিক্স্, কিন্তু এরও সীমা আছে; মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে এটা সফল হয় না, অনেক সময় ভরাডুবি হয়ে যায়। কর্তাগিন্নীর তাড়ায় কুকুরের ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে এটাই প্রমাণিত হয়েছে।

বিসমার্ক—জার্মানির চ্যান্সেলার—ইনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি ঐক্যবদ্ধ করে শক্তিশালী জার্মান সাম্রাজ্য গঠন করেন ও তৃতীয় নেপোলিয়নের অধীন ফ্রান্সকে পরাজিত করে জার্মানীর শক্তিবৃদ্ধি করেন। কমলাকান্তের মতে বিসমার্ক শক্তির উপাসক। তাঁর রাজনীতির মূল ভিত্তি সামরিক শক্তি। বৃষজাতীয় রাজনীতিকের ইনি উদাহরণ।

উল্সী—রাজা অষ্টম হেন্রীর সময় ইনি একজন শক্তিশালী ধর্মযাজক ও মন্ত্রী ছিলেন। পরে নিজের ক্ষমতা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার ফলে কার্ডিন্যাল উল্সীর পতন হয়।

দুই রকমের পলিটিক্স্ দেখিলাম—পলিটিক্স্ দুশ্রেণীর—কুক্কুরজাতীয় ও বৃষ-

জাতীয়। প্রথমটিতে ভিক্ষাবৃত্তি, আবেদন-নিবেদন, আংশিক সাফল্য অথবা ব্যর্থতা আর দ্বিতীয়টিতে শক্তির পরিচয়-দান। কুক্কুরজাতীয় রাজনীতির চর্চা আমাদের দেশে বেশী। আমরা আত্মশক্তিতে বলীয়ান হইয়া উঠি নাই। চারিত্র-মাহাত্ম্যে বড় না হইয়া উঠিতে পারিলে কেহ আমাদের স্বীকৃতি দিবে না।

তৃতীয় সংখ্যা

বাঙালীর মনুষ্যত্ব

কথাসার ও সমালোচনা :—জগতের কোলাহল থেকে একান্তে একটি শান্তির নীড় স্থাপন করতে চেয়েছিলেন কমলাকান্ত। জীবনের সঙ্গে অত্যন্ত-সংযোগে আজ তিনি ক্লান্ত। সভ্যতার অত্যাচারে নিজেকে যেন নিতান্ত পীড়িত মনে হয়। ভালো লাগে না আর অতিসন্তর্পণে লোকের মন যুগিয়ে চলতে কিংবা তুচ্ছ স্বার্থের আশায় লোকের খোসামোদ করে বেড়াতে। একাকিত্বে দুঃখ নেই, কিন্তু শান্তি চাই। সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে কমলাকান্ত কুটীরের চারপাশে ফুলের বাগান করলেন। ফুলের ভালবাসা কী তার সারাজীবনের পুঞ্জীভূত গ্লানির ক্ষতিপূরণ করতে পারবে না? রূপকার্থে ধরলে এই ফুলের চাষ শিল্পচর্চার উপমান হতে পারে। প্রৌঢ় জীবনে কমলাকান্ত সাংসারিকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে শিল্পচর্চায় আত্মনিয়োগ করতে চান।

কিন্তু সংসার কি এত সহজে ছাড়ে? Wordsworth বলেছিলেন—"The world is too much with us"—কমলাকান্তের ফুলের বাগানেও তাই মধুলোভীর দল ছুটে এলো। তাদের পক্ষ-বিধুননে সেই অপরিচিত শব্দ বেজে উঠলো—সংসারের সেই অতি-পরিচিত—"ঘ্যানঘ্যানানি"। অনেক চেষ্টা করেও কমলাকান্ত এদের হাত থেকে বাঁচতে পারলেন না। সংসারে থেকে কে কবে সংসারকে এড়াতে পেরেছে? নেপোলিয়ন, হানিবল কিংবা চার্লস-এর মত কমলাকান্তকেও অবশেষে বীরের মত পরাজয় বরণ করতে হলো। তিনি ভ্রমরের হাত এড়াতে ধরণীতলে পতিত হলেন।

কিন্তু কমলাকান্ত ঠিক সংসারকে এড়াতে চান নি—তিনি চেয়েছিলেন সংসারের "ঘ্যানঘ্যানানি" থেকে বাঁচতে। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়—পতঙ্গ তাঁকে বলে দিলো—"তোমার এ বঙ্গভূমে জন্মগ্রহণ করিয়া ঘ্যান্ঘ্যান্ করিব না ত কি করিব? বাঙ্গালি হইয়া কে ঘ্যান্ঘ্যানানি ছাড়া?" "ঘ্যানঘ্যানানি" কথাটির নিহিতার্থ এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে আসছে। "ঘ্যানঘ্যানানি" অর্থ অপ্রয়োজনে বাজে কথা বলা কিংবা স্বার্থের খাতিরে স্তাবকতার বাগ্বিস্তার। খেতাবধারী রাজা-মহারাজা থেকে সামান্য চাকরির উমেদার পর্যন্ত সকলেই এই স্তাবকতার বাহক, আর উকিল-মোক্তার থেকে শুরু করে তথাকথিত দেশনেতা কিংবা সমাজসেবকের দল অথবা সাহিত্যিক

ও সম্পাদকেরা সবলেই বাজে কথায় পঞ্চমুখ। কোন্ "বাঙ্গালীর ঘ্যানঘ্যানানি ছাড়া অন্য ব্যবসা আছে?" পতঙ্গ কমলাকান্তকে যথার্থই বলেছে "একটা কাজের সঙ্গে খোঁজ নাই—কেবল কাঁদুনে মেয়ের মত দিবরাত্রি—ঘ্যান্ ঘ্যান্। একটু বকাবকি লেখালেখি কম করিয়া কিছু কাজে মন দাও—তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। মধু সংগ্রহ করিতে শেখ—হুল ফুটাইতে শেখ।" অর্থাৎ শুধু কথায় চিড়ে ভিজবে না—কাজ করতে হবে। কাজটি যে কি তাও পতঙ্গের নির্দেশ থেকে পাওয়া যাচ্ছে—মধুসংগ্রহ ও হুলফুটান। মৌমাছি যেমন মধু আহরণ করে মধুচক্র গড়ে তোলে, তেমনি আমাদেরও চিত্ত-মধুচক্র জ্ঞানে পূর্ণ করতে হবে, শিব-সুন্দরের উপলব্ধিতে ভরে তুলতে হবে। "হুলফোটান" অর্থে যে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন আছে। রসনাকণ্ডূয়ন রোগ আমাদের প্রবল বলে বিজ্ঞ ষটপদী পতঙ্গ উপদেশ দিয়েছে যে, কাজে মন না গেলে জিবে কণ্টক দিয়ে ঘা করতে। এতে উপকার হবে।

অন্যান্য পত্রের মত কমলাকান্তের এ পত্রখানিও জাতীয়-চরিত্রের সমালোচনা। জাতিকে ভালবাসতেন বলেই তাকে এমন কঠিন সমালোচনা করবার অধিকার বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল। কিন্তু বর্তমান রচনায় মার্জিত হাস্যরসের সুসমঞ্জস প্রয়োগ তীক্ষ্ণ সমালোচনাকে সরস করে তুলেছে। এ যদি মৃতকল্প জাতির প্রতি লেখকের উপদেশ হয়, তা হলে তাকে আলংকারিক অর্থে "কান্তাসম্মত" বা ব্যঙ্গমধুর রসাশ্রিত বলা চলে।

পাঠপ্রসঙ্গে : আমি কোন রিজলিউশানই দ্বিতীয়িত করিতে প্রস্তুত নহি—বঙ্কিমের ব্যঙ্গ-রসিকতার উপভোগ্য নমুনা। ঘ্যান্ঘ্যানানি নিয়ে সমাগত ভোমরার দলকে উপলক্ষ করে বঙ্কিম জানিয়ে দিলেন, বাঙালীর যত কিছু সমাবেশ, সভা-সমিতি, সমাজ, এসোসিয়েশান, লীগ, সোসাইটি, ক্লাব, সবই কেবল ঘ্যান্ ঘ্যান্ করার আড্ডা। কথায় কথায় সভা ডেকে শূন্যগর্ভ বক্তৃতা ছোটানো আর যান্ত্রিকভাবে রকমারি রেজলুশান পাশ করা সময়ের অপচয় মাত্র। Resolution পেশ করা হ'লে বিলিতি কায়দায় তাকে 'second' অর্থাৎ সমর্থন করার দরকার হয়। কৌতুক-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এখানে ঐ 'second'-এর আক্ষরিক অনুবাদ হয়েছে 'দ্বিতীয়িত'। সে যুগের ইংরেজী রীতিসর্বস্ব সভা-সমিতির কাজের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপের জন্যই বঙ্কিমের এই ধরনের শব্দনির্মাণের প্রয়াস। এই শব্দ প্রয়োগে সভা-সমিতির অসার্থকতা সূচিত হয়েছে। জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা থেকে প্রত্যাগত নবকুমার 'একেই কি বলে সভ্যতা' নামক প্রহসনে মত্ত অবস্থায় পিতার বৃন্দাবনে যাবার প্রস্তাবকে 'I second the resolution' বলে সমর্থন জানিয়ে ঔদ্ধত্যকে ব্যক্ত করেছে।

ঘূর্ণন, বিঘূর্ণন, ডীন, উড্ডীন প্রভৃতি—বঙ্কিমের এই কথার খেলা কৌতুক-সৃষ্টির অনুকূল বলেই উপভোগ্য। এখানে দু'জাতীয় কাজের জন্য দু'দফা প্রায় সমার্থক ধ্বনিসাদৃশ্যযুক্ত শব্দের শোভাযাত্রা রচনা লক্ষণীয়;—একটি কমলাকান্তের পাখা

ঘোরানো, আর একটি ভোমরার ওড়ার কৌশল দেখানো। শব্দগুচ্ছদ্বয় যে ঠিক ঐ দু'জাতীয় কাজের ভঙ্গি পৃথক ক'রে বোঝাবার উপযোগী তা বলাই বাহুল্য।

তখন ধূলাবলুণ্ঠিত শরীরে দ্বিরেফরাজের নিকট ইত্যাদি—কমলাকান্তের রচনায় রসসৃষ্টির অন্যতম কৌশল এইভাবে সামান্য কথা বলবার জন্য অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ তৎসম শব্দের সমারোহ ঘটানো। তিনি তৎসম শব্দ ব্যবহারে কৌতুক রস সৃষ্টি করেছেন।

বাঙ্গালী হইয়া কে ঘ্যান্‌ঘ্যানানি ছাড়ে?—বাঙালী চরিত্রের একটি মারাত্মক দুর্বলতা দেখানোই এখানে লেখকের উদ্দেশ্য। উমেদারি, খোসামুদি, মোসায়েবি, আবেদন-নিবেদন, অথবা সভা ডেকে, কাজের বথার পরিবর্তে, অসার্থক বক্‌বকানি,—ও প্রস্তাব পাশ এই হলো বাঙালী-চরিত্রের পরিচয়, এখানে তারই প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে।

তিনি আবার সনদী ঘ্যানঘেনে—উকীল সম্প্রদায়ের অসার বাগ্‌বিন্যাসের প্রতি কটাক্ষ। অন্য সম্প্রদায়ের লোকের বাজে বকা, আর উকীলের বকার মধ্যে পার্থক্য শুধু এই যে উকীলেরা সনন্দ (licence)-প্রাপ্ত। সুতরাং বিরক্তিকর হলেও তা সহ্য করতে হবে। এখানে হাকিম বঙ্কিমচন্দ্রকে অমন বহু বিরক্তিতে ভুগতে হওয়ায় উকীলদের ব্যঙ্গ করেছেন।

সত্যমিথ্যার সাগরসঙ্গমে প্রাতঃস্নান করিয়া—পূর্বে আরব্ধ ব্যঙ্গের হুলফোটানো চলেছে এখানে। সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য করাই উকীলদের কাজ, তাই তাঁদের সম্পর্কে এমন মন্তব্য।

স্মরণার্থ ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ করি—শোকসভাও ঘ্যান্‌ঘ্যানানির জায়গা মাত্র।

মনুষ্যের পদবৃদ্ধি হইলেই সে বিজ্ঞ বলিয়া গণ্য হয়—এখানে 'পদবৃদ্ধি' প্রয়োগটিকে বঙ্কিম তার ব্যঙ্গের উপকরণ করে নিয়েছেন বক্রোক্তি-যোগে। বিজ্ঞ ব্যক্তির পদবৃদ্ধি অর্থাৎ উচ্চ পদে সম্মানিত হওয়াই কাম্য। কিন্তু একথা ঠিক নয় যে, উচ্চপদে কাউকে ঠেলে তুললেই তার বিজ্ঞতা বাড়ে। অথচ কৃত্রিম সভ্যতার দাবী অনেকটা সেই ধরনের মানুষের এই যে ভ্রান্ত বিচারবোধ ব্যঙ্গের আলোয় তাকে স্পষ্ট করে তোলার জন্য এখানে বক্রোক্তির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। 'পদবৃদ্ধি' বলতে বোঝানো হয়েছে পদের সংখ্যাবৃদ্ধি অর্থাৎ দ্বিপদ থেকে চতুষ্পদে, চতুষ্পদ থেকে ষট্‌পদে উন্নয়ন। ভ্রমর ষট্‌পদ প্রাণী; তাই কমলাকান্তের সিদ্ধান্ত 'অবশ্য এ ব্যক্তি বিশেষ বিজ্ঞ হইবে—ইহার অসামান্য পদবৃদ্ধি দেখা যায়। এই বিজ্ঞ পতঙ্গের পরামর্শ অবহেলন করি কি প্রকারে?' পদবৃদ্ধি যখন বিজ্ঞতার লক্ষণ তখন ভ্রমর নিশ্চিতরূপে বিজ্ঞ। দ্বিপদ মনুষ্য থেকে চতুষ্পদ পশু, পদবৃদ্ধি হয়েছে এমন মনুষ্য—অধিক বিজ্ঞরূপে পরিচিত।

চতুর্থ সংখ্যা

বুড়া বয়সের কথা

কথাসার ও সমালোচনা : সম্পাদকের কাছে চিঠিতে কমলাকান্ত বুড়ো বয়সের কথা বলছেন। এ জাতীয় কথা তিনি আগেও বলেছেন, কিন্তু বর্তমানে আগের সুর যেন কিছুটা পরিবর্তিত। একটা নৈরাশ্য ও তিক্ততার বোধ যেন তাঁর সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছে। বুড়ো বয়সের একথা তাঁর শুনবে কে? বৃদ্ধেরা অধ্যয়ন পছন্দ করেন না—যুবকেরা বৃদ্ধের রচনা পড়বে কিনা সন্দেহ—তবে একটা কথা এই যে, কমলাকান্ত ঠিক পূর্ণ বৃদ্ধ নন—তাঁর যৌবনের সূর্য কিছুটা পশ্চিমে হেলেছে এইমাত্র, অর্থাৎ ছায়া পূর্বদিকে হেলেছে।

কিন্তু মানুষের যৌবন ও বার্ধক্যের প্রকৃত বিচার হবে কিরূপে? বয়সে কম হওয়া সত্ত্বেও কেউ মনের দিক দিয়ে বৃদ্ধ—আবার অনেকে বার্ধক্যেও নবীন। কমলাকান্তের মতে "প্রাচীনতা বয়সেরই ফল, আর কিছুরই নহে। ধাতুবিশেষে কিছু তারতম্য হয়।"

পৃথিবীতে চিরতারুণ্যের রাজ্য চলেছে, তবে মানুষ কেন বৃদ্ধ হবে? কমলাকান্ত ভাবতে থাকেন—"এই চির-প্রাচীন ভূমণ্ডল ত আজিও নবীন'—কোকিলের গান, বকুলের গন্ধ, নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা, গঙ্গাতরঙ্গের সৌন্দর্য ইত্যাদি কিছুই তো পুরানো হয় না, তবে তিনি কেন বৃদ্ধ হবেন? জগৎ আলোকময়, শুধু তাঁর রাত্রি সমাগত?

কিন্তু এ সকল অলস কল্পনাবিলাসে ফল কি? দেহে-মনে জরার সুস্পষ্ট পদধ্বনি কমলাকান্ত শুনতে পেয়েছেন—"আমি বুড়া প্রতি নিঃশ্বাসে তাহা জানিতে পারিতেছি।" জীবনের আশা-ভরসা—উৎসাহ-উদ্দীপনা তাঁর চলে গেছে।

জীবনের অপরাহ্নবেলায় দাঁড়িয়ে তাঁর মনে হয় পিছনে-ফেলে-আসা দিনগুলোর কথা। অতীতের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে কতকগুলি প্রিয়মুখের ছবি—'কেবল মুখ নহে—হৃদয়।' কত ফুল ঝরে গেছে; কত দীপ নিবে গেছে; কত বন্ধুত্বের বন্ধন শিথিল হয়ে গেছে। কালের পরিবর্তনই এর জন্য একমাত্র দায়ী।

কিন্তু একথা ভেবে ফল কি—পৃথিবীতে যখন একা এসেছি, তখন একাই যেতে হবে। মৃত্যুর পরে তো সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে—ঈশ্বরের শান্তি তো সেখানে সকলের জন্যই অপেক্ষা করছে।

আপন বৃদ্ধত্বকে স্বীকার করে নিয়ে কমলাকান্ত পঞ্চাশোর্ধ্বে বনগমনের প্রাচীন নির্দেশের কথা ভাবতে থাকেন। কিন্তু বৃদ্ধ হলে সত্যসত্যই বনে যাবার কি কোন প্রয়োজন আছে। তখন তো গৃহ-সংসার-সমাজই তাঁর কাছে অরণ্যতুল্য। বৃদ্ধকে কেউই আমোদ-প্রমোদে আমন্ত্রণ জানায় না—বড় জোর তার কাছ থেকে সময়োচিত উপদেশ নেওয়া চলতে পারে। বৃদ্ধকে সকলেই ভয় করে বা ভক্তি করে দূরে সরে থাকে। সন্তান কিংবা সন্তানতুল্য যাদের সঙ্গে একদিন তার নিবিড় স্নেহের সম্পর্ক ছিল, আজ হয়ত তারাই বয়োধর্মে তাঁর অবমাননা করতেও কুণ্ঠিত হচ্ছে না। বৃদ্ধের

মনের কষ্ট কে বোঝে। বৃদ্ধের কাছে তার অতীতের অতিপ্রিয় বাস্তব পরিবেশও বর্তমানে কালগ্রাসে পতিত। তার যৌবনের পৃথিবী হারিয়ে গেছে—জনপূর্ণ নগরীতে, বহু মানুষের মাঝখানে থেকেও সে তাই অরণ্যেই বাস করে।

কিন্তু তবু আবার একদিক দিয়ে বৃদ্ধ-জীবনের সান্ত্বনা রয়েছে। বৃদ্ধ তার অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের সাহায্যে মানবকল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে পারে। এই হলো যথার্থ মুনিবৃত্তি।

বিসমার্ক, মোল্টকে, ফ্রেডেরিক প্রভৃতি যাঁরা জার্মান জাতিকে গড়েছেন, কিংবা ফ্রান্সের স্বাধীনতার পুরোহিত টিয়র অথবা গ্লাডস্টোন, ডিস্রেলির মত বৃটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধারগণ সকলেই বৃদ্ধ। বুড়ো বয়সই আসলে কাজের সময়। ব্রাউনিং বলেছেন 'The best is yet to be'. "যৌবন-অতীতে মনুষ্য বহুদর্শী, স্থিরবুদ্ধি, লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং ভোগাশক্তির অনধীন, এ জন্য সেই কার্যকারিতার সময়।" যৌবনে মানুষের আত্মকেন্দ্রিকতা প্রবল থাকে, কিন্তু বার্ধক্যে আপনার কাজ ফুরিয়েছে বিবেচনা করে পরহিতে রত হতে হয়। অনেকের ধারণা বৃদ্ধবয়সে সব কাজ ফেলে বুঝি পরলোকের কাজ করতে হয়। কমলাকান্ত একথা বিশ্বাস করেন না। শৈশব থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ঈশ্বরকে ডাকতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কালোচিত জাগতিক কর্তব্যও পালন করতে হবে। স্বকার্য ত্যাগ করে মুনিবৃত্তির ভান করা অকর্তব্য।

"বুড়ো বয়সের কথা" বলতে গিয়ে কমলাকান্ত যে নৈরাশ্যবাদের পরিচয় দিয়েছেন তার প্রকাশ বঙ্কিম-সাহিত্যে আর কোথাও ঘটেনি। "কমলাকান্তের দপ্তর"-এর অন্তর্গত "একা", "আমার মন" প্রভৃতি রচনার মধ্যে কমলাকান্ত প্রায় একই কথা বলেছেন, কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধের সঙ্গে সুরগত ভিন্নতা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। "বুড়া বয়সের কথা"তে এমন একটা কঠিন অভিজ্ঞতা ও নৈরাশ্যের পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে যা পড়ামাত্রই আমাদের আচ্ছন্ন করে, কিন্তু তা আবার জীবনবোধে আমাদের প্রেরণা দেয়। প্রবন্ধের উপসংহার মনে গভীর কারুণ্য সৃষ্টি করে। 'অতিবেগে প্রবল বাতাস বহিতেছে—অন্ধকার প্রভো। চারি দিকেই অন্ধকার। আমার এ ক্ষুদ্র ভেলা দুষ্কৃতের ভরে বড় ভারি হইয়াছে। আমায় কে রক্ষা করিবে'? কমলাকান্তের আত্মসমীক্ষা ও ঈশ্বরের নিকটে আত্মনিবেদন আমাদের মনকে স্পর্শ করে।

পঞ্চম সংখ্যা

কমলাকান্তের বিদায়

কথাসার ও সমালোচনা: "কমলকান্তের বিদায়" পত্রগুচ্ছের সর্বশেষ খণ্ড। কমলাকান্ত "বঙ্গদর্শন"-এ আর লিখবেন না, তাই পত্রে সম্পাদকের নিকট বিদায় প্রার্থনা করেছেন। তাঁর এই সংকল্প একটা আকস্মিক খেয়ালমাত্র নয়—একটা সুচিন্তিত আত্মসমালোচনা এর মূলে আছে। আত্মসমালোচনা করতে গিয়ে তিনি যে সব

কথা বলেছেন তা যেন চতুর্থ পত্রেরই অনুকরণ। বার্ধক্যের গুরুভার যেন তাঁর সমস্ত জীবনরস-রসিকতার কণ্ঠরোধ করছে। রসসৃষ্টির ইচ্ছা আছে কিন্তু উপায় নেই—কারণ, আনন্দ কমলাকান্তের জীবন থেকে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়েছে। প্রিয়জনেরা ছেড়ে গেছে—প্রিয় পরিবেশ পরিবর্তিত হয়েছে। এখনকার রচনা মানে শুধু "নস্ট্যালজিয়া" (Nostalgia), ফেলে-আসা দিনগুলির স্মরণে একটু কান্নাকাটি—কিন্তু সেই করুণ সুরের শিল্পায়নও এখন তাঁর সহজসাধ্য নয়—"কমলাকান্তের আর সেই রস নাই।" সুতরাং আর লিখে কি হবে—"প্রাণ গিয়াছে ভাই, আর নিঃশ্বাস কেন? সুর গিয়াছে ভাই, আর কান্না কেন?" কমলাকান্ত অন্তরে অন্তরে সন্ন্যাসী। তাই আর বন্ধন কেন। যৌবনের কমলাকান্ত নেই। সে চাঁদ বিয়ে করতো, ফুলের বিয়ে দিত, কোকিলের সঙ্গে গান করতো। সুখ গিয়েছে—আর কান্না কেন? তথাপি সে কাঁদে। 'জন্মিবামাত্র কাঁদিয়াছিলাম—কাঁদিয়া মরিব। এখন কাঁদিব, লিখিব না।' জীবনের আনন্দ ও আশ্বাস যখন অন্তর্হিত তখন বিলাপ ব্যতীত আর কোন পন্থা নেই।

কমলাকান্তের জোবানবন্দী

কথাসার ও সমালোচনা: "কমলাকান্তের জোবানবন্দী" কমলাকান্ত প্রসঙ্গে বঙ্কিমের সর্বশেষ রচনা। এর অভিনবত্ব আমাদের সহজেই মুগ্ধ করে। প্রসন্ন গোয়ালিনী তার গোরু চুরি মামলায় কমলাকান্তকে সাক্ষী মানে। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে উকিলের জেরার উত্তর দিতে গিয়ে কমলাকান্ত কিন্তু উকিলবাবুকেই বিব্রত করে তুললেন; উকিল এক কথা বলেন তো কমলাকান্ত বক্রোক্তি করে তার এমন ব্যাখ্যা করেন যে আদালত শুদ্ধ সকলেরই নাকাল হবার যোগাড়। সাক্ষীর কাটরাকে কমলাকান্ত প্রথমে খোঁয়াড় কল্পনা করে মনে মনে হেসেছেন—"বাবা, কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি—যে, আমাকে এর মধ্যে পুরিলে?" তার পর হলফ পড়তে গিয়ে আর এক বিপত্তি—পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে সত্যভাষণের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কেমন করে সম্ভব?—এত বড় মিথ্যা কমলাকান্ত গোড়াতেই কেমন করে বলবেন। দুঃখের বিষয়, হাকিমও কমলাকান্তের যুক্তি বুঝলেন না, আর উকিলবাবু তো চটে উঠলেন। তাঁরা গতানুগতিক মানুষ—(Status Quo) স্থিতাবস্থাকে মেনে নেওয়া ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর নেই—স্বাধীন বুদ্ধির প্রকাশ তাঁদের আচ্ছন্ন। কিন্তু গোলমাল করলেও কমলাকান্তকে ছাড়া চলে না, কারণ তিনিই মূল সাক্ষী, তাই শেষ পর্যন্ত তাঁকে "simple affirmation" দেওয়া হলো। কিন্তু প্রতিজ্ঞার বিষয় না জেনে কমলাকান্ত শপথ গ্রহণ করতে পারেন না, তার চাপরাশী তাঁকে জানিয়ে দিল যে, এ প্রতিজ্ঞা সত্যভাষণের—তখন অবশ্য কমলাকান্ত বিনা প্রতিবাদে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন।

এর পর উকিল কমলাকান্তকে বললেন—"...আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তার যথার্থ উত্তর দাও। বাজে কথা ছাড়িয়া দাও।" শুনেই তো কমলাকান্তের মেজাজ খারাপ

হয়ে গেল। প্রকৃত সত্যভাষণকে এমন করে সীমাবদ্ধ করা চলে না, অথচ আদালতে এই সাজান-গোছান কৃত্রিম সত্যেরই কারবার চলে। কমলাকান্তকে ভীষ্মদেব খোসনবীশ এবং উকিলবাবু যতই উন্মাদ মনে করুন না কেন, তাঁর এই সময়ের প্রচ্ছন্ন শ্লেষের উক্তিগুলি সহজ-সত্যের আলোকে উজ্জ্বল। জবানবন্দী-গ্রহণের গতানুগতিকতাকেও কমলাকান্ত ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি। এত পিতৃপরিচয়, কুলপরিচয়, জাতিবর্ণ জিজ্ঞাসার প্রয়োজনই বা কোথায়? বর্ণহীনের কি সত্যভাষণের অধিকার নেই? এর পর উকিলবাবু আরো বিপদগ্রস্ত হলেন কমলাকান্তের নিবাস, পেশা ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে। কিন্তু সবচেয়ে গণ্ডগোল বাধলো, কমলাকান্ত প্রসন্ন গোয়ালিনীকে চেনেন কিনা এই প্রশ্নে। কমলাকান্ত স্পষ্টই বললেন যে, তিনি প্রসন্নর দুধ, দই চেনেন, কিন্তু প্রসন্নকে চেনেন না—"মেয়েমানুষকে কে কবে চিনতে পেরেছে, দিদি? কথাটি রহস্যচ্ছলে বলা হলেও এর মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন দার্শনিকতা রয়েছে তার ইঙ্গিত বুঝতে পারা নিতান্ত কষ্টসাধ্য নয়। পৃথিবীতে আমরাও আচরণের দ্বারা মানুষকে দেখি, কিন্তু তাতে মানুষের কতটা ধরা পড়ে—এইজন্য কোন মানুষকে সম্পূর্ণ চিনেছি, একথা বলা একান্ত ভুল। এর পর উঠলো গোরুচুরির প্রসঙ্গ। উকিল কমলাকান্তকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করতেই তিনি সাফ্ বলে দিলেন যে, গোরুচুরির বিদ্যা কোন পুরুষেই তাঁদের জ্ঞাত নয়, আর চোরে চুরি করবার সময় কাউকেই বলে কয়ে সাক্ষী রেখে চুরি করে না। উকিলবাবু বেগতিক দেখে প্রসন্নর কথামত চুরির প্রসঙ্গ ছেড়ে কমলাকান্তকে গোরু সনাক্ত করতে বললেন। এর পর কমলাকান্তকে রোখা দায় হলো —কথার পিঠে কথা বলতে বলতে তিনি বিচারক থেকে উকিল পর্যন্ত সকলকেই গোরু বলে ফেললেন—

'কমলাকান্ত জোড়হাত করিয়া বলিল, "কোন্ গোরুটি, ধর্ম্মাবতার?"

হাকিম বলিলেন, "কোন্ গোরুটি কি? একটি বই ত সামনে নাই?"

কমলা। আপনি দেখিতেছেন একটি—আমি দেখিতেছি অনেকগুলি।

গোরু ছাড়া আর কি? যে মানুষগুলো মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে কৃত্রিম কথার কারচুপিকেই সর্বস্ব জ্ঞান করে বিচারের প্রহসনকেই বিচার মনে করছে, তাদের গোরু ছাড়া আর কি বলা যায়? বিশেষ করে শামলা-মাথায় উকিলবাবু তো বৃষকুলতিলক। "Contempt of Court"-এর বিধানে কমলাকান্তের পাঁচ টাকা জরিমানা হলো; অনাদায়ে একমাস কয়েদের নির্দেশ জারি হলো। কমলাকান্ত তাতেই রাজি—একমাসের জায়গায় দু'মাস হ'লে আরো ভালো, কারণ এ তো রাজসরকারের ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ।

কিন্তু গোরু দেখে কমলাকান্ত বললেন যে, গোরু তাঁর। প্রসন্ন তার পালনকর্ত্রী হ'তে পারে, কিন্তু যেহেতু গোরুর দুধ, ঘি, ছানা, মাখন কমলাকান্তই খেয়েছেন, সুতরাং গোরুর আসল অধিকার তাঁতেই বর্তিয়েছে। অভিজ্ঞ পাঠক লক্ষ্য করবেন যে, কথাটি রহস্যচ্ছলে বলা হলেও এর মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদের প্রচ্ছন্ন ইংগিত বর্তমান।

জমির প্রকৃত মালিক কে? অত্যাচারী জমিদার না চাষী? "বিড়াল" প্রবন্ধে এই আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল। মামলা যখন মিটে গেছে তখনও কমলাকান্তকে এই কথাই বলতে শুনি—

"তোর মঙ্গলার বাঁটের দিব্য, তোর দুধের কেঁড়ের দিব্য, তোর ঘোলমউনির দিব্য, তোর ফাঁদি-নথের দিব্য, তুই যদি চোরকে গোরু ছেড়ে না দিস্।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "চক্রবর্ত্তী মহাশয়! চোরকে গরু ছাড়িয়া দিবে কেন?"

কমলাকান্ত বলিল, "Liberty! Individuality! Fraternity! Humanity!" মটরসুঁটি! কমলাকান্ত মহাভারত থেকে উপাখ্যান উদ্ধৃত করে বললেন যে বৎস, গোপস্বামী ও তস্কর—এদের মধ্যে যে ধেনুর দুগ্ধ পান করে, সে যথার্থ অধিকারী। সভ্যতার ধর্ম হলো কেড়ে খাওয়া। এইটি আন্তর্জাতিক বিধি। Right of Conquest যেমন Right of Theftও তদ্রূপ।

"কমলাকান্তের জোবানবন্দী" বঙ্কিম সাহিত্যের একটি আশ্চর্য রত্ন। "কমলাকান্তের দপ্তর"-এর বঙ্কিমচন্দ্র মূলতঃ Humourist—"ইহাদের মধ্যে পূর্বে Humour-এর যে সমস্ত স্বভাবসিদ্ধ গুণ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, তাহা পূর্ণমাত্রায় প্রতিফলিত" ("বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা")। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে Humour-এর সহিত Wit জাতীয় হাস্যরসের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। "Wit হইতেছে বুদ্ধির তরবারি-খেলা, নিঃসম্পর্কিত বস্তু বা চিন্তার মধ্যে বিদ্যুৎ-ঝলকের ন্যায় অতর্কিত সাদৃশ্য আবিষ্কার।" (ঐ)। উপস্থিত ক্ষেত্রে Wit সৃষ্ট হয়েছে প্রধানত "Pun" বা শ্লেষোক্তি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। এই বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসের উজ্জ্বল ব্যবহার কমলাকান্তের বৌদ্ধিক-ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। ভীষ্মদেব খোসনবীশের মত অনেকেই হয়ত কমলাকান্তকে পাগল বলবে—G. K. Chesterton-এর সেই "Queer Traders Club" উপন্যাসের বেসিল গ্রাণ্টকেও সাধারণ লোক পাগল বলে জানতো—দিলদারের উক্তিগুলিও সাধারণ্যে অসংলগ্ন বাক্যবিলাস বলে গণ্য হতে পারে, কিং লিয়রের ফুলের (fool) কথাও তাই, কিন্তু গভীরভাবে দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে, সাধারণ মানুষের গতানুগতিক মননভূমির অনেক ঊর্দ্ধে ছিলেন বলেই এঁদের এই কলঙ্ক।